ভূমিকা

বিজ্ঞানকে এবং বিজ্ঞানের দৌলতে পাওয়া কৃৎকৌশল প্রযুক্তি বিদ্যাকে জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহার করেও আমরা অনেকেই বিজ্ঞান-বিরোধী। বিজ্ঞান বিরোধিতার স্থুল ও সূক্ষ্ম চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চলেছে। কোপারনিকাস, ডারুইন, ফ্রেজার, মার্কস, এঙ্গেলস, ফ্রয়েড, পাভলভের বই লক্ষ লক্ষ বিক্রী হয়েছে। সব দেশেই ম্যাক্রো-ওয়ার্ল্ড, মাইক্রো-ওয়ার্ল্ড, মহাকাশ বিদ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান ও গবেষণা বৃদ্ধির ব্যাপক চেষ্টা চলছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে ধারণা আমাদের ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষ মন্ত্রতন্ত্র ছেড়ে যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যার আরাধনায় রত হয়েছে। তবু কেন মানুষের বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়ছে না ? কেন এখনো সব দেশের সংস্কৃতি ও ধর্মের মধ্যে অতিপ্রাকৃত, অস্বভাবী, অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ? এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে সেই সব ঘটনায় গুরুত্ব আরোপ এবং অলৌকিক ঐশীমহিমা প্রচারে ধর্মীয় সংস্থার ও সাধুসন্তদের পরিকল্পিত প্রচার ও প্রচেষ্টা ? অলৌকিক অবৈজ্ঞানিক রহস্যময়তার প্রতি মানুষের দুর্বলতা না থাকলে প্রচার সংস্থাগুলি সজীব ও সক্রিয় থাকতো না। অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতি এই দুর্বলতা অনেকের মানসিকতার বৈশিষ্ট্য হলেও আমরা একে স্বভাবগত বলতে পারি না। অনেক কিছু প্রাকৃতিক ঘটনার ব্যাখ্যা না জানার জন্যে আদিম যুগের মানুষের ভয়ই যে কাল্পনিক ভূত ও ভগবানে রূপান্তরিত হয়েছে, একথা অনেকে লিখছেন, কাজেই অনেকেই পড়েছেন। কিন্তু পুরনো শর্তাধীনতা (conditioning) থেকে মুক্ত হয়েছেন কজন ? না হবার কারণ বুঝতে না পারলে অলৌকিক ঘটনার জাদু জানলেও মানুষের আদিম সংস্কার দূর হবে না। বৈজ্ঞানিক কি সব ব্যাখ্যা করতে পারে ? বৈজ্ঞানিক কি বন্যা, অনাবৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাস, ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্পকে প্রতিরোধ করতে পারে ? বৈজ্ঞানিক কি মৃতকে জীবন্ত করতে পারে ? ঠিক কি ভাবে ব্রহ্মাণ্ড তৈরি হল, প্রাণের উদ্ভব হল—এর উত্তর কি দিতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান ?

সৎ বিজ্ঞানী মাত্রেই বলবেন,—না জানি না, পারি না। কিন্তু মাত্র কয়েক হাজার বছরের চেষ্টায় আমরা কি প্রকৃতির অনেক রহস্য জানতে পারি নি ? প্রকৃতির অনেক ক্রিয়াকলাপের অনুকরণে বা অনুসরণে প্রকৃতিকে কিছুটা বশীভূত

করে মানবসমাজের কল্যাণে নিয়োগ করি নি ? বিজ্ঞান সৃষ্টির ও মানবধর্মের আদি ও অন্ত সম্পর্কে এখনও অনেকখানি অজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনকে অনেক উন্নত করে নি কি ? মানুষের ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে দিন।

বিজ্ঞান অনেক কিছু করেছে ও আরো কিছু করতে পারে, এ নিয়ে কেউ কোমর বেঁধে তর্কে নামবেন না জানি ; কিন্তু বিজ্ঞানকে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বাধীনতা কোনো দেশের রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত শাসকশ্রেণী পূজিত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা—(বিজ্ঞানীরা ও নামীদামী বিজ্ঞানীরাও এর মধ্যে আছেন) দেবেন না। সেই পুরনো কথাই তুলবেন। বিজ্ঞান বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও সমাজকে দেখতে চায় ও তাদের সম্পর্ক নিরূপণ করতে চায়, এবং সৎ বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত শোষণহীন সমাজ সংগঠিত করতে চায়। বর্তমান অধিকাংশ দেশের শাসকশ্রেণী তাদের স্বার্থরক্ষক সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন চায় না। কাজেই আমরা সব পণ্ডিতদের মুখ ও কলম থেকেই এই একই প্রচার শুনছি গত তিন/চার দশক ধরে : বিজ্ঞান মানুষের জৈবিক সমস্যা হয়তো নিরসন করতে পাবে। কিন্তু আত্মিক ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করে মানুষকে অমানুষ করে তুলছে, যে বিজ্ঞান ও তার পরিপোষক বস্তুবাদী দর্শনচিন্তা—মানুষকে সনাতনী ঐতিহ্য থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, যে বিজ্ঞানের মধ্যে নীতিবোধ সৌন্দর্যবোধ নেই—সেই বিজ্ঞান চাঁদে পাড়ি দিতে পারলেও মূল্যবোধ বাড়াতে পারে না, মনুষ্যত্ব উন্মেষে অক্ষম। তাই ভারতের মত মহান ঐতিহ্যশালী দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহা মহা বিজ্ঞান-বিশারদরা বিজ্ঞানেব প্রযুক্তিবিদ্যা ও প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যার কুশলী মিশ্রণের ফর্মুলা আবিষ্কারেব জন্য আলোচনা ও চর্চায় রত। শুধু ভাত রুটির যোগান দিলে মানুষ গড়া যাবে না। মনুষ্যত্বের উন্মেষে প্রয়োজন 'বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের নির্যাসের সঠিক পরিমাণে সংযোজন। কিন্তু সরকারি বিজ্ঞান-সংস্থার কর্তৃপক্ষ সেকুলার সংবিধান সংশোধন না করে এই নতুন ধরনের মনুষ্যত্ব গঠনকারী সালসা প্রস্তুত করতে পাববেন কি ?

বিজ্ঞান বিরোধিতায় তাই স্থূল চেষ্টা এখন আর আগের মত নজরে পড়ে না। অলৌকিকতার ও রহস্যময়তার ধাঁধার সৃষ্টি করে কিছু বিজ্ঞানী' সাধু সন্তদের বিজ্ঞান বিরোধিতার মদত যোগাচ্ছেন। আজ যোগবলে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন কোনো স্বামীজি বা বাবাজি—এই প্রচার বা এই ধরনের প্রদর্শনী আগের মত বিস্ময় উৎপাদন করে না ; মিডিয়া বা তেপায়া টেবিলের ভাষায় আজকের রকেট-কম্পিউটার যুগের মানুষ আর আগের মত প্রয়াত আত্মার বাক্যালাপ শুনে শিহরিত হয় না। আজ বিজ্ঞানের মর্যাদা পাবার জন্য উৎসুক ও সংকল্পবদ্ধ ঐশীশক্তির ধার করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির মধ্যে আসতে চায় এই শক্তির চর্চা ও প্রদর্শনীকে। ভারতবর্ষ থেকে যোগী আমদানী হলেও, ইউরি গেলারেরা মাঝে মাঝে ম্যাস মিডিয়া মারফৎ নিজেদের জাহির করার চেষ্টা করলেও অলৌকিককে বিজ্ঞানীদের রবার ষ্ট্যাম্পে লৌকিক করে তুলতে চাইছেন কেন ? যদি কোনোদিন ল্যাবরেটরীতে পদার্থকণার বিশেষ কোনো শক্তি আবিষ্কৃত

হয় যা টেলিপ্যাথী বা ক্লেয়ারোভয়েনসের রহস্যভেদে সক্ষম, তাহলে ESPর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে না। আধুনিক বিজ্ঞানের অভিমতে বস্তুকণা ও শক্তির অভিব্যক্তি অজস্রভাবে ঘটতে পারে—সপক্ষে আর একটি তথ্য সংযোজিত হবে। সঙ্গে সঙ্গে এও প্রমাণিত হবে যে এই বস্তুকণা তথাকথিত অলৌকিক শক্তি বিজ্ঞানীর পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনো একটির কাছেই অভিব্যক্ত হয়েছে প্রকৃতিবিজ্ঞানের মেথডলজির মাধ্যমেই।

ঐশীশক্তি, অলৌকিক শক্তি, অতিপ্রাকৃত শক্তি—প্রভৃতি কথাগুলো পরিহার করলেও প্রেতলোকের অস্তিত্ব, জন্মান্তরের রহস্য, পির্কের অলৌকিকত্ব, ব্যক্তিবিশেষের সমাধি-মাধ্যম ভগবদ্দর্শন— ইত্যাদিকে বিজ্ঞানগ্রাহ্য করার চেষ্টা সফল হবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

প্রবীর ঘোষ দীর্ঘকালের পরিশ্রমলব্ধ গবেষণায় ও অসাধারণ মননশীলতায় পৃথিবীর বিভিন্ন রহস্যাবৃত অলৌকিক ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণের কাজে হাত দিয়েছেন। বইটি একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত হবে। এটি প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডে পরাবিদ্যার উপর গুরুত্ব আরো করে বইটির গুরুত্ব বাড়িয়েছেন, বেশি উপভোগ্য করেছেন ; আমাদের ধন্যভাজন হয়েছেন, কারণ ভারতীয় কোনও ভাষায় অথবা ভারত থেকে প্রকাশিত কোনও গ্রন্থে পরাবিদ্যার উপর এতো বিস্তৃত আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই। বিষয়টা অ্যাকাডেমিক হলেও লেখার সহজবোধ্যতা ও সাবলীলতার দরুন সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য হয়েছে।

প্রবীর সাধুসন্তদের ঘটানো অনেক ঘটনাই আমাদের লৌকিক কৌশলে ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। প্রবীর পৃথিবীর সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাধর এবং জ্যোতিষীদের বুজরুকির বিরুদ্ধে এক অসাধারণ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন —বিশ্বের যে কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে বা কোনও জ্যোতিষী অভ্রান্ত গণনার পরিচয় দিলে দেবেন ৫০ হাজার ভারতীয় টাকা। লেখক চান, এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আরও কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বাস্তবে অলৌকিক বলে কিছু নেই, অলৌকিকের অস্তিত্ব আছে শুধু পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থ, বইয়ের পাতায় এবং অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়েদের গল্পে।

ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রবীর ঘোষের নির্ভিক যুক্তিবাদী সংগ্রাম নিশ্চয়ই সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণ করবে। প্রথম খণ্ডের আলোচ্য বিষয়গুলোর উপর বিস্তৃত আলোচনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। পরবর্তী খণ্ডের জন্য তীব্র আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় রইলাম।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডিরেক্টর
পাভলভ ইনস্টিটিউট এণ্ড হসপিটাল
১৩২/১এ, বিধান সরণী,
কলকাতা-৪

যাঁদের সৌজন্যে আলোকচিত্র পেয়েছি

অমিতাভ চৌধুরী

জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়ার

কল্যাণ চক্রবর্তী

সৌগত রায় বর্মন

কমলেন্দু রায়

কল্যাণ বসাক

গোপাল দেবনাথ

এবং

পরিবর্তন

এক

প্রস্তাবনা

এককালে অসহায় মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে ভয় ও শ্রদ্ধা করেছে। জল, ঝড়, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বন্যা, আগুন, পাহাড়-পর্বত, মাটি সমস্ত কিছুরই প্রাণ আছে বলে বিশ্বাস করেছে, বসিয়েছে দেবত্বের আসনে। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি জড় নক্ষত্র ও গ্রহগুলো পূজিত হয়েছে জীবন্ত দেবতা হিসেবে। মানুষের জীবনে সম্পদ হিসেবে প্রবেশ করেছে বৃক্ষ, অরণ্য, গরু, ছাগল, শুয়োর আরও নানা ধরণের গৃহপালিত জন্তু এবং সেই সঙ্গে তারাও দেবতা হিসেবে পুজো পেয়েছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক মানুষের কাছেই এই সব দেবতারা দেবত্ব হারালেও সবার কাছে হারায় নি।

প্রাচীন মানুষ জীবাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকার দরুন অসুখকে কখনও বলেছে পাপের ভোগ, কখনও বা বলেছে অশুভ শক্তির ফল। তন্ত্র-মন্ত্র, মাদুলী, যাগ-যজ্ঞ, জলপড়া, তেলপড়া, ঝাড়ফুঁক, স্বপ্নাদিষ্ট ওষুধ রোগের চিকিৎসা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আজও এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি অনুন্নত দেশে এবং কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। রোগ না সারলে কারণ হিসেবে কাউকে ডাইনী ঘোষণা করে হত্যা করার ইতিহাস ক্ষীণতর হলেও স্তব্ধ হয় নি।

মানুষ গোষ্ঠিবদ্ধ হয়েছে। গোষ্ঠির শক্তিমান ও বুদ্ধিমানকে বরণ করেছে নেতার পদে। শক্তিমান হয়েছে শাসক, বুদ্ধিমান হয়েছে ধর্মীয় নেতা। ধর্মীয় নেতারা বুদ্ধির জোরে শাসকদের উপরও প্রভুত্ব করতে চেয়েছে। নিজেদের ঘোষণা করেছে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত হিসেবে, ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে, নবরূপে ঈশ্বর হিসেবে। বিভিন্ন কৌশল সৃষ্টি করে সেগুলোকেই সাধারণের সামনে হাজির করেছে অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে। নিজেদের এই সব অলৌকিক কীর্তিকথা প্রচারের জন্য কখনও সাহায্য নিয়েছে কিছু সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের কখনও বা কিছু অন্ধ-বিশ্বাসীদের, পরবর্তীকালে সেই সব অলৌকিক কীর্তিকথার কিছু কিছু পল্লবিত হয়ে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।

এই সব ধর্মগুরুরা নিজস্ব ধারণাগুলোকে ঈশ্বরের মত বলে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলও হয়েছে, যদিও পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব অভ্রান্ত ঈশ্বরের মতগুলো একে একে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ধর্মীয় শাসকেরা যে-সব ধর্মগ্রন্থ রচনা করে গেছে, সে-গুলো বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা অভ্রান্ত সত্য হিসেবেই গ্রহণ করেছে। যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই সংখ্যাগুরু মানুষ যুগ যুগ ধরে মেনে চলেছে ধর্মীয় ধারণাগুলোকে। শাসক সম্প্রদায় ও পুরোহিত সম্প্রদায় পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক হয়ে শোষণ করেছে অন্ধ-বিশ্বাসী সাধারণ মানুষদের।

বিশ্বের বহু দেশেই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু মনেই রোপিত হচ্ছে অবাস্তব অলৌকিক ধ্যান-ধারণার বীজ। দেব-দেবী ও সাধক-সাধিকাদের মনগড়া অলৌকিক কাহিনী পড়ে ও শুনে যে বিশ্বাস শিশু মনে অঙ্কুরিত হচ্ছে, তাই পরিণত বয়সে বিস্তার লাভ করছে বৃক্ষরূপে।

খ্রীষ্টজন্মের ৫০০ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাকৃ, সিমেগুের মতো গ্রীক অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতেরা জানিয়েছিলেন, পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ, সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলো ঘুরছে। বিনিময়ে ধর্ম-বিরোধী, ঈশ্বর-বিরোধী, নাস্তিক মতবাদ প্রকাশের অপরাধে এঁদের বরণ করতে হয়েছিল অচিন্তনীয় নির্যাতন, সত্যের উপর অসত্যের নির্যাতন, ধর্মের নির্যাতন।

এই মতকে ২০০০ বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরলেন পোল্যাণ্ডের নিকোলাস কপার্নিকাস। তাঁরই উত্তরসূরী হিসেবে এলেন ইতালীর জিয়োর্দানো ব্রুনো, গ্যালিলিও গ্যালিলেই। প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন বৈজ্ঞানিক সত্যকে—সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ গ্রহগুলো।

সে-যুগের শিক্ষাক্ষেত্রেও ছিল প্রচণ্ড ধর্মীয় প্রভাব। ধর্মীয় বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। সাধারণের মধ্যেও ধর্মান্ধতা ছিল সমুদ্রের মতোই গভীর ও ব্যাপ্ত। বাইবেল বিরোধী মত প্রকাশের জন্য মহামান্য পোপ ক্ষিপ্ত হলেন, ক্ষিপ্ত হলো ধর্মযাজক ও ধর্মান্ধ মানুষগুলো। ব্রুনো বন্দী হলেন। ধর্ম-বিরোধী মত পোষণের অপরাধে ব্রুনোকে আটকে রাখা হয়েছিল এমন এক ঘরে, যাঁর ছাদ ছিল সীসেতে মোড়া। গ্রীষ্মে ঘর হতো চুল্লি, শীতে বরফ। এমনি করে দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর উপর চলেছে ধর্মীয় নির্যাতন।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র ঈশ্বর-প্রেমিরা, তথাকথিত সত্যের পূজারীরা ব্রুনোকে শেষবারের মতো তাঁর মতবাদকে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে বললো। অসীম সাহসী ব্রুনো সেই প্রস্তাব প্রচণ্ড ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন। বাইবেল বিরোধী অসত্য ভাষণের জন্য ব্রুনোকে প্রকাশ্য স্থানে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হলো। অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয় না, সেদিনের দর্শক হিসেবে উপস্থিত মূর্খ জনতা লেলিহান আগুনে এক নাস্তিককে ধ্বংস হতে দেখে যথেষ্ট উল্লসিত হয়েছিল।

গ্যালিলিও গ্যালিলেই'কেও ধর্মান্ধদের বিচারে অধার্মিক ও অসত্য মতবাদ প্রচারের অপরাধে জীবনের শেষ আট বছর বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছে।

কিন্তু এত করেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও ঈশ্বরের পুত্রেরা সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর ঘোরা বন্ধ করতে পারে নি।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় ৪৫০ বছর আগে আনাক্সাগোরাস বলেছিলেন, চন্দ্রের নিজস্ব কোনও আলো নেই। সেই সঙ্গে এ-ও বলেছিলেন, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ। চন্দ্রগ্রহণের কারণও তিনি ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আনাক্সাগোরাসের আবিষ্কারের প্রতিটি সত্যই ছিল সেদিনের ধর্ম-বিশ্বাসীদের চোখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বর বিরোধিতা, ধর্ম বিরোধিতা ও অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়।

এত করেও কিন্তু সেদিনের হাজারও খাঁটি ঈশ্বরের পুত্রেরা সত্যকে নির্বাসনে পাঠাতে পারে নি। তাদের ঈশ্বরের অভ্রান্ত বাণীই আজ শিক্ষিত সমাজে নির্বাসিত।

ষোড়শ শতকে সুইজারল্যাণ্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্র ও ভেষজ বিদ্যার অধ্যাপক ডাক্তার ফিলিপ্রাস অ্যাউরেওলাস প্যারাসেলসাস্ ঘোষণা করলেন—মানুষের অসুস্থতার কারণ কোনও পাপের ফল বা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ জীবাণু। পরজীবী এই জীবাণুদের শেষ করতে পারলেই নিরাময় লাভ করা যাবে।

প্যারাসেলসাস-এর এমন উদ্ভট ও নতুন তত্ত্ব শুনে তাবৎ ধর্মের ধারক-বাহকেরা 'রে-রে' করে উঠলেন। এ কী কথা ! রোগের কারণ হিসেবে ধর্ম আমাদের যুগ যুগ ধরে যা বলে এসেছে, তা সবই ওই একজন উন্মাদ অধ্যাপকের কথায় মিথ্যে হয়ে যাবে ? শতাব্দীর পর শতাব্দী পবিত্র

ধর্মনায়কেরা যা বলে গেছেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লেখা রয়েছে, লক্ষ-কোটি মানুষ যা বিশ্বাস করে আসছে, সবই মিথ্যে ? সত্যি শুধু প্যারাসেলসাসের কথা ?

সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্ম-বিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হলো 'বিচার' নামের এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকরা প্যারাসেলসাসকে ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত সত্যকে অসত্য বলার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিল। প্যারাসেলসাস সেদিন নিজের জীবন বাঁচাতে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সেদিনের ধর্মীয় সত্য আজ বিজ্ঞানের সত্যের কাছে পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে। মিথ্যে হয়ে গেছে ধর্মের ধারণা, ঈশ্বরের বাণী।

হিন্দু ধর্মের ধারণায় ব্রহ্মা তাঁর শরীরের এক একটি অঙ্গ থেকে এক এক শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেছেন। এমনি করেই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল মানব, মানবীর। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীব ব্রহ্মারই সৃষ্টি বলে হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসীরা মনে করেন।

খ্রীষ্টীয় মতে কিন্তু বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ জীবের স্রষ্টা পরম পিতা জিহোবা। পরমাপতা এক জোড়া করে বিভিন্ন প্রাণী সৃষ্টি করে ছেড়ে দিয়েছিলেন পৃথিবীর বুকে। এমনি করেই একদিন জিহোবা সৃষ্টি করেছিলেন এক জোড়া মানুষ—আদম ও ঈভ।

বিভিন্ন প্রাণী বা মানুষের উৎপত্তির কোনও ধর্মীয় ধারণাই আজ আর বিজ্ঞান-শিক্ষিত মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আজ আমরা জানতে পেরেছি, কোনও প্রাণীই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে হঠাৎ করে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয় নি। হাজির হয়েছে কোটি কোটি বছরের দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

পৃথিবীতে প্রাণী সৃষ্টির আদিতে এসেছিল 'প্রোক্যারিওটস' (Prokaryotes)-জীবাণুবিশেষ প্রাণী। সেই প্রাণীই সাড়ে তিনশ কোটি বছরের দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছে বর্তমানের প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী এবং মানুষও তার বাইরে নয়।

প্রাণীদের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস প্রথম তুলে ধরেছিলেন চার্লস ডারউইন। দীর্ঘ বছরগুলোর অক্লান্ত পরিশ্রমে ডারউইন সৃষ্টি করলেন তাঁর সনাতন ধর্ম-বিরোধী সৃষ্টি ও বিবর্তন তত্ত্ব।

বিভিন্ন জীবাশ্মের আবিষ্কার ও তাদের প্রাচীনত্ব নির্ণয় করে বিজ্ঞান ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের হারানো সূত্র বা 'মিসিং লিংক'কে জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ রূপ দিল।

যদিও ডারউইন ছিলেন গত শতকের মানুষ, তবু তাঁকে ধর্মান্ধদের হাতে অত্যাচারিত হতে হয়েছে প্রায় মধ্যযুগীয় প্রথায়।

প্রাচীন অতীতে মানুষ দরিয়ায় নৌযান ভাসাতে শিখল। দিক নির্ণয়ের জন্য অনুভব করলো নক্ষত্র চেনার প্রয়োজনীয়তা। কেবলমাত্র অনুন্নত গণিত শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে সীমিত জ্ঞান নিয়ে মানুষ গ্রহ, নক্ষত্রের বিষয়ে যা জেনেছিল তাতে অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অসম্পূর্ণতা ও ভ্রান্ত ধারণা। আর্যভট্ট, ভাস্কর, হিপার্কস-এর জ্যোতিষচর্চায় গণিত থাকলেও বিজ্ঞান ছিল না, অর্থাৎ সেই সময়কার জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত হতে পারে নি। তখন জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy) ও ফলিত জ্যোতিষ-এর (Astrology) মধ্যে পার্থক্য ছিল না।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হলো দূরবীক্ষণ, উন্নত হলো গণিত শাস্ত্র। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত হলো বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যা, পরিত্যক্ত হলো ফলিত জ্যোতিষ বা জ্যোতিষশাস্ত্ররূপ অ-বিজ্ঞান। উন্নত দেশগুলোর সংখ্যাগুরু মানুষ আজ বুঝতে শিখেছেন, মানুষের সুখ-দুঃখের হেতু আকাশের গ্রহগুলোর মধ্যে নিহিত নেই, রয়েছে আমাদের সৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই।

বিশ্বের খ্যাতিমান ১৮৬ জন যুক্তিবাদী বিজ্ঞানী (এঁদের মধ্যে ১৮ জন নোবেল বিজয়ী) ১৯৭৫-এর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কের 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকায় এক ইস্তাহারে বলেছিলেন, "আমরা অত্যন্ত বিচলিত, কারণ বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম, নামী সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশক পর্যন্ত ঠিকুজি-কোষ্ঠী, রাশিবিচার, ভবিষ্যদ্বাণীর পক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে যুক্তি-বিচারের কোনও স্থান নেই। এতে মানুষের মধ্যে অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণা, অন্ধ-বিশ্বাস বেড়েই যায়। আমরা বিশ্বাস করি, জ্যোতিষীদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সরাসরি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর সময় এসেছে।"

মজার কথা, বিজ্ঞানীরা যখন জ্যোতিষীদের এই অযৌক্তিক চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন, তখন আমাদের দেশের জ্যোতিষীদের কেউ কেউ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভাগ্য গণনার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ফলিত জ্যোতিষের মতন অ-বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে জেনে-বুঝে লোক ঠকিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের মতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সংস্কারাবদ্ধ দেশে পদে পদে যেখানে অনিশ্চয়তা সেখানে বেশির ভাগ সাধারণ মানুষ দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রতিকারের একমাত্র ধ্বজাধারী জ্যোতিষী বা অবতারদের দ্বারস্থ হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভ্রান্ত ধারণাগুলো একে একে পচা-গলা অঙ্গের মতনই খসে খসে পড়েছে, পড়ছে। শিক্ষা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-মনস্ক মানসিকতাও একটু একটু করে গড়ে উঠছে। তবুও এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনুন্নত দেশের তুলনায় কম হলেও উন্নততর দেশেও অবৈজ্ঞানিক, যুক্তিহীন, ভ্রান্ত ধর্মীয় ধারণাগুলো এখনও বর্তমান।

শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারি তাঁর সংগৃহীত তথ্য অনুসারে আমাদের দেশের শতকরা ৯৯ ভাগ পুরুষ ও শতকরা ১০০ ভাগ মহিলা ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসী। ইউরোপে ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান পুরুষের সংখ্যা শতকরা ৫ জন এবং মহিলার সংখ্যা শতকরা ৩৩ জন।

এই পরিসংখ্যান থেকে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, যুক্তিহীন কুসংস্কার ভারতীয় সমাজে কেমনভাবে জগদ্দল পাথরের মতন চেপে বসে রয়েছে। অতি দুঃখের কথা এই যে, প্রতিটি দেশ যখন বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতিকে দ্রুততর করতে চাইছে, তখন আমরা অতীত সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে সনাতন সংস্কারের আবর্তে থাকতে চাইছি।

এ-যুগের অনেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করলেও বা বিজ্ঞানের কোনও বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলেও মনে-প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেন নি, পারেন নি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করতে।

এঁরা প্রায়শই একদিকে যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলোকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন, আর এক দিকে লেখাপড়ায় সুপুত্র হয়ে ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ছাত্র-জীবনে ছেদ টেনেছেন, অথবা বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিভাগে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে কর্মজীবনে আর্থিক সফলতা পেয়েছেন।

আমার পরিচিত এক ডাক্তারকে দেখেছি, একটা স্ট্রোক হওয়ার পর তাঁর হাতে ও গলায় একাধিক মাদুলী শোভা পাচ্ছে।

আমার এক পরিচিত বিজ্ঞান পেশার ব্যক্তিকে চিনি, যাঁর পালিয়ে যাওয়া কিশোরী কন্যাটিকে ফেরৎ পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে মানৎ করেছিলেন।

এক কেমিস্ট্রির অধ্যাপককে জানি, যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁর গুরুদেব মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে

উপেক্ষা করে ধ্যানে শূন্যে ভেসে থাকতে পারেন।

বর্তমানের নামী-দামী অবতারদের জীবনী পড়লে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেরই নাম পাবেন, যাঁরা এই সব অবতারদের অলীক অলৌকিক ক্ষমতার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা এই সব মত প্রকাশ করেছেন কখনও অন্ধ-বিশ্বাসে, কখনও বা অলৌকিক(?) ঘটনাটির পিছনে বাস্তব কারণ বুঝতে না পারার দরুন। অহংবোধের ফলে এই সব শিক্ষিত মানুষ একবারও ভাবতে পারেন না, তাঁদের বোধশক্তির বাইরেও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ থাকতে পারে। বিশ শতকের শেষ মাথা :সেও ভারতবর্ষের শিক্ষিত, বিজ্ঞান-শিক্ষিত, মার্কসবাদে-দীক্ষিত অনেকেই যুক্তিহীন, অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা বহন করে চলেছেন।

সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত অথচ যুক্তিহীন মানসিকতার ফর্দ দিতে গেলে একটা ছোট-খাট বই হয়ে যাবে।

কিছু কিছু বিজ্ঞান-পেশার ব্যক্তি আছেন, যাঁরা তাঁদের আজন্ম লালিত ধর্মীয় ধারণাগুলোকে বিজ্ঞানের কাছে নতজানু হতে দেখে ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে এবং অতীন্দ্রিয়তার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মিথ্যা ও শঠতার আশ্রয় নিতেও পিছপা নন। ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়তাকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করার অক্লান্ত চেষ্টা করে চলেছেন পরামনোবিজ্ঞানী (Para-psychologist) নামের অ-মনোবিজ্ঞানীরা। আজ পর্যন্ত তাঁদের এই চেষ্টা শুধুমাত্র প্রচারের স্তরেই রয়ে গেছে, পরামনোবিদ্যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের মর্যাদা পায় নি। পরামনোবিজ্ঞানীরা প্রকৃতিবিজ্ঞানের (মেথডলজি) অনুসরণ করে বিজ্ঞানের দরবারে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, প্ল্যানচেট, জন্মান্তর বা জাতিস্মর মানুষের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নানা ধরনের কূট কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও সেই কৌশলের একটিও বিজ্ঞানের দরবারে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, গ্রহণযোগ্য হয় নি কোনও যুক্তিবাদী মানুষের কাছে। কারণ, পরামনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রেই ছিল কৌশল গ্রহণের সুযোগ।

ভারতীয় সমাজকে, সাধারণ মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের আলোতে আনার জন্য যখন বুদ্ধিজীবি ও যুক্তিবাদীদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি তখন এক শ্রেণীর কুসংস্কারাচ্ছন্ন বুদ্ধিজীবী মানুষই অতীন্দ্রিয়তাকে, অবতারবাদকে, জন্মান্তরকে, জ্যোতিষশাস্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতির চাকাকে উল্টো দিকে ঘোরাতে চাইছেন।

শিক্ষার ডিগ্রিধারী সংস্কারবদ্ধ মানুষ, অবতারদের কৌশলকে ব্যাখ্যা করতে না পারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া আত্মগর্বী মানুষ, কৌশলে অতীন্দ্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া বিজ্ঞান শাখার মিথ্যাচারী মানুষগুলোই আজকের সমাজে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ গড়ার কাজে সবচেয়ে বড় বাধা।

আমাদের দেশে স্বল্প-শিক্ষিত, ডিগ্রীহীন, সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী, স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক মানসিকতার মানুষ আমি দেখেছি। আবার একই সঙ্গে দেখেছি যুক্তিবাদী, বিজ্ঞান-মনস্ক এবং সংগ্রামী বলে স্ব-বিজ্ঞাপিত কিছু সমাজশীর্ষ মানুষের ঈর্ষার নানা রূপ। ঈর্ষা তাঁদের কখনও নিয়োজিত করছে যুক্তিবাদী মানুষের সংস্কারমুক্তির সংগ্রামের বিরুদ্ধে, কখনও বাধ্য করছে যুক্তিহীনতাকে আশ্রয় করতে।

জানি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত অনিবার্যরূপে যুক্তিবাদী মানসিকতা যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে জয়ী হবেই। বিরোধীরা এই জয়কে বিলম্বিত করতে পারে মাত্র, আজ পর্যন্ত স্তব্ধ করতে পারে নি এবং পারবেও না। ইতিহাস অন্ততঃ এই শিক্ষাই দিয়েছে।

দুই

অলৌকিক বনাম লৌকিক

জাদুকর জাদুর খেলা দেখান মনোরঞ্জনের জন্য। সেই খেলা দেখে বিস্মিত হলেও আমরা বুঝতে পারি এর পিছনে অলৌকিক কিছু নেই। আছে কিছু কৌশল, যা সাধারণ মানুষ চেষ্টা করলে আয়ত্ত করতে পারে। কিন্তু সবল বিশ্বাস ও কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর চতুর লোক যখন স্রেফ কিছু লৌকিক-কৌশলের খেলা দেখিয়ে, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে নিজেদের প্রায় ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে রাখে তখন তা নির্দোষ মনোরঞ্জনের পর্যায়ে থাকে না।

আসুন আমরা প্রত্যেকেই খোলামেলা যুক্তিবাদী মন নিয়ে অলৌকিক বলে কথিত ঘটনাগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখি, এগুলো কতখানি লৌকিক ও কতখানি অলৌকিক। সেই সঙ্গে প্রতিটি পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করবো যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হতে এই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করুন—

কোনো অন্ধ-বিশ্বাসে বশ হওয়া নয়
বহুজনে মেনে নিয়েছেন বলে কোনো ধারণাকে মেনে নেওয়া নয়
যুক্তি দিয়ে বিচার করবো, যাচাই করবো
শুধু তারপরই গ্রহণ করবো বা বাতিল করবো।

এই অলৌকিক ক্ষমতাবানদের প্রসঙ্গে একটা অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না—যেখানে একজন জাদুকর বুজরুকিবাজ মোল্লাদের তথাকথিত ক্ষমতার মায়াজাল থেকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আলজিরিয়ার অধিবাসীদের মুক্ত করেছিলেন।

আলজিরিয়া তখন ফ্রান্সের অধীন। আলজিরিয়রা আরব মুসলমান সম্প্রদায়ের বংশধর। স্বভাবে দুঃসাহসী হলেও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। মোল্লা-সম্প্রদায় ওইসব সরল ও কুসংস্কারগ্রস্ত লোকগুলোকে নানা রকম জাদুর খেলা দেখিয়ে এমন মুগ্ধ করে রেখেছেন যে ও দেশের লোকেরা মনে করতো মোল্লারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং আল্লার মতোই পূজনীয়। মোল্লারা জনসাধারণের উপর ফরাসী সরকারের কর্তৃত্বে সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ, এতে তাদের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া কর্তৃত্বে বাধা পড়ছিল। মোল্লারা একসময় জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে শুরু করল যে, তারা আল্লার কাছ থেকে জানতে পেরেছে ফরাসী সরকারের আলজিরিয়া শাসনের দিন ফুরিয়েছে। মোল্লারা ফরাসী সরকারের বিরুদ্ধে জনতাকে নানাভাবে [illegible] দিতে লাগলো।

মোল্লাদের কথা আলজিরিয়দের কাছে স্বয়ং আল্লার কথা। অতএব, তারা আর ফরাসী সরকারকে পাত্তা দিতে রাজি হলো না। আলজিরিয়ার ফরাসী সরকার প্রমাদ গুনলেন। মোল্লাদের এইসব কথার পিছনে যে কোনও যুক্তি নেই, তা অধিবাসীদের বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ

হয়ে তাঁরা শঙ্কিত হলেন। এই বিপদের কথা জানিয়ে ফ্রান্সে খবর পাঠালেন। ফ্রান্সের ফরাসী সরকার দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সেনা পাঠিয়ে সাময়িকভাবে দমননীতি চালান গেলেও এটা কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন, চতুর মোল্লাদের প্রভাব নষ্ট করা। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে মোল্লাদের কোনো অলৌকিক ক্ষমতা নেই। ওরা এতদিন শুধু মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে লোক ঠকিয়ে এসেছে।

ফরাসী সরকার এই কাজের ভার দিলেন ফ্রান্সের সেরা জাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ'কে। এতদিন শুধু চিত্ত-বিনোদনের জন্যই উদ্যাঁ তাঁর জাদুর খেলা দেখিয়েছেন। এবার দেশের জন্য অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আলজিরিয় মোল্লাদের মুখোমুখি হলেন। দলবল নিয়ে আলজিরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স শহরে হাজির হলেন। সেখানকার সেরা থিয়েটার হল-এ তাঁর জাদু প্রদর্শনের ব্যবস্থা হলো। বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হলেন শহরের বহু গণ্যমান্য আরব মুসলমান ও মোল্লারা। ফরাসী জাদু দেখার ব্যাপারে অবশ্য জনসাধারণের খুব একটা উৎসাহ ছিল না। ওরা বিশ্বাস করতো মোল্লাদের নানা ধরনের অলৌকিক কাণ্ডকারখানার কাছে ফরাসী জাদুকরের জাদু নেহাতই ছেলেখেলা।

কিছু খেলা দেখানর পর উদ্যাঁ light and heavy chest (হাল্কা ও ভারি বাক্স) খেলাটি দেখালেন। একটি ফরাসী সুন্দরী একটা ছোট্ট হাল্কা লোহার বাক্স লোহার পাটাতন পাতা মঞ্চে এনে রাখল। উদ্যাঁ এবার মঞ্চে আহ্বান জানালেন উপস্থিত সেরা শক্তিমান দর্শককে। শহরের সেরা পালোয়ান বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অতএব. তিনি উঠলেন মঞ্চে।

উদ্যাঁ বললেন, "দেখুন তো বাক্সটা তুলতে পারেন কি না?"

পালোয়ান অতি তাচ্ছিল্যে তাঁর বাঁ হাত দিয়ে তুলে আবার নামিয়ে রাখলেন।

উদ্যাঁ এবার পালোয়ানটিকে বললেন, "আমি আমার জাদুর বলে তোমার সব শক্তি কেড়ে নিচ্ছি।"

উদ্যাঁ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সম্মোহন করার বিশেষ ভঙ্গিতে দু'হাত নাড়তে লাগলেন। তারপর এক সময় বললেন, "এবার তোমার কোন শক্তি নেই। তুমি বাক্সটা আর তুলতে পারবে না।"

পালোয়ান তাচ্ছিল্যভরে হাত দিলেন বাক্সের হাতলে, কিন্তু এ কী? উঠছে না তো। তাচ্ছিল্যের হাসি মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে হেঁচকা টান দিলেন, কিন্তু বাক্সটা এক ইঞ্চিও উঠল না।

দর্শকদের চোখে বিস্ময় ও আতঙ্ক। এমন দৈত্যের মত লোকটাকে শিশুর চেয়েও দুর্বল করে দিয়েছেন জাদুকর।

উদ্যাঁ এবার অলৌকিক শক্তির অধিকারী মোল্লা দর্শকদের আহ্বান জানালেন পালোয়ানটির শক্তি ফিরিয়ে দিতে।

দর্শকদের একান্ত অনুরোধে স্টেজে উঠে এলেন শহরের দুই সেরা মোল্লা পীর। অনেক ঝাড়ফুঁক করলেন, কিন্তু তবুও পালোয়ানটি ঐ ছোট্ট লোহার বাক্সটা তোলার শক্তি ফিরে পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত উদ্যাঁই তাকে শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। দর্শকরা অবাক বিস্ময়ে দেখল, এবার পালোয়ান অবহেলে বাঁ হাতেই বাক্সটা তুলে ফেললেন। কৃতজ্ঞতায় উদ্যাঁর পায়ে মাথা ঠেকালেন পালোয়ান।

এরপর একের পর এক শহর ঘুরে উদ্যাঁ তাঁর আশ্চর্য খেলা দেখিয়ে মোল্লাদের প্রভাবের ভিত কাঁপিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন আর এক নতুন খেলা। আলজিরিয়দের বোঝালেন,
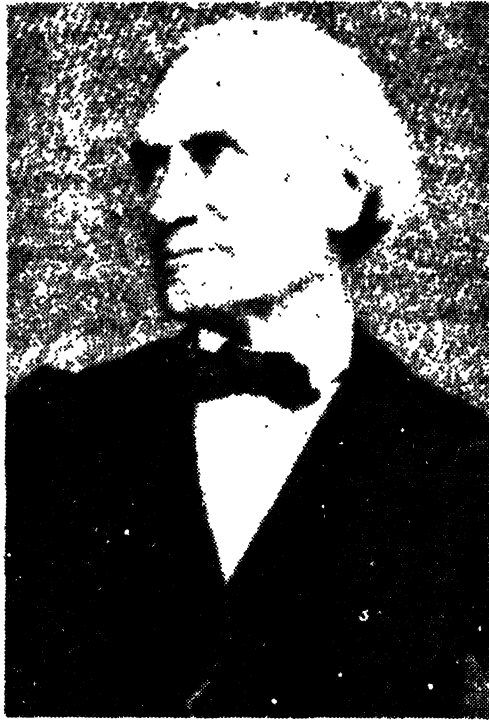
রবেয়ার উদ্যা

এতদিন ধরে তাঁর খেলাগুলো সকলে অলৌকিক বলে মনে করছেন, তার কোনটাই অলৌকিক নয়। সবই লৌকিক কৌশলের সাহায্যে দেখান হয়েছে। উদ্যা এবার মোল্লাদের দেখান নানা ভোজবাজির খেলা দেখিয়ে সেগুলো যে নেহাতই লৌকিক কৌশলে দেখান হয় তা বুঝিয়ে দিলেন।

পালোয়ানের শক্তি হরণের খেলায় উদ্যা বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্য নিয়ে ছিলেন। মঞ্চের আড়ালে উদ্যার সহকারী ইশারা পেলেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ চালু করে দিতেন। বাক্সের তলায় লোহা, মঞ্চের উপরের লোহার পাটাতনের সঙ্গে বৈদ্যুতিক চুম্বকের আকর্ষণে আটকে থাকত। সেই লোহার মঞ্চের উপরই দাঁড়িয়ে বাক্সকে তোলা পৃথিবীর কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, তখন বাক্স তুলতে হলে তাকে চুম্বকের আকর্ষণের চেয়েও বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

মোল্লাতন্ত্রের ও কুসংস্কারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে আলজিরিয়রা উদ্যাকে যে কতখানি ভালোবেসেছিলেন তা উদ্যাকে তাদের দেওয়া অভিনন্দনপত্রের প্রতিটি লাইনে ছড়িয়ে রয়েছে।

আলজিরিয়ায় উদ্যার প্রয়োজন শেষ হলেও পৃথিবীর বহু দেশেই এমন কী আমাদের ভারতবর্ষেও উদ্যার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। কার

আমরা অনেকেই প্রয়োজনমতো যুক্তিকে এড়িয়ে চলতে ভালোবাসি। ভালোবাসি কিছু কিছু কুসংস্কারের কাছে মাথা নোয়াতে। চমক লাগান গল্প বলতে ভালোবাসি। পরের মুখে শোনা ঘটনাকে নিজের চোখে দেখা সত্য-ঘটনা বলে জাহির করার তীব্র লোভের শিকার হই। এই তীব্র লোভ ও চমকে দেওয়ার দুরন্ত ইচ্ছে থেকেই জন্ম নেয় বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী। যা অনেক সময় বহু কথিত হওয়ার ফলে আমরা বিশ্বাসও করে ফেলি।

এই সুযোগে ম্যাজিকের ওপর একটা গুল গল্প শোনাই আপনাদের।

এক বিখ্যাত ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক দেখতে এসে দর্শকরা একটু একটু করে অধৈর্য হয়ে উঠছেন, শো'র সময় কখন পার হয়ে গেছে, অথচ তখনও ম্যাজিসিয়ানের দেখা নেই।

অধৈর্য জনতা যখন ক্ষুব্ধ, সেই সময় মঞ্চের পরদা উঠল। জাদুকর হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজন ক্ষুব্ধ দর্শক জাদুকরের কাছে দেরি করার কৈফিয়ৎ দাবি করতেই জাদুকর অবাক চোখে নিজের ঘড়ি দেখে বললেন, "এক মিনিটও তো দেরি করিনি।"

যাঁদের হাতে ঘড়ি ছিল তাঁরা সকলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলেন। প্রত্যেকের ঘড়িই একটু আগে দেখা সময় থেকে দেড় ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে! এমন এক অসাধারণ খেলা দিয়ে ম্যাজিক শুরু হতে দেখে দর্শকরা প্রচণ্ড হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করলেন জাদুকরকে।

ম্যাজিক নিয়ে এই গণসম্মোহনের গল্পটা বহু প্রচলিত, মূল গল্পের কাঠামো প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক। যে জাদুকরদের নিয়ে এই ধরনের কিংবদন্তি বা আষাঢ়ে গল্প বিভিন্ন সময়ে দারুণভাবে চালু হয়েছিল তাঁদের মধ্যে রয়েছে ভারতীয় জাদুকর গণপতি, রাজা বোস, রয়-দি-মিসটিক এবং জাদু-সম্রাট পি সি সরকার। বিশ্বে যাঁকে নিয়ে এই আষাঢ়ে গল্প শুরু হয়েছিল তিনি এক মার্কিন জাদুকর হাউয়ার্ড থার্সটন।

এই গণসম্মোহনের জাদু এঁরা কোনদিনই দেখাননি। কারণ, দেখান সম্ভব নয়। অথচ, ভাবতে অবাক লাগে, আজও অনেকেই বিশ্বাস করেন এই বিস্ময়কর জাদুর খেলা বিভিন্ন জায়গায় দেখান হয়েছে এবং অনেক প্রত্যক্ষদর্শী এখন আছেন। দোষ এইসব বিশ্বাসকারীদের নয়। দোষ সেইসব আষাঢ়ে গল্পবাজদের, যাঁরা শোনা গল্পকে নিজের চোখে দেখা বলে চালিয়েছেন।

হ্যাঁ, সেই কথাতেই আবার ফিরে আসি। আমাদের দেশে উদ্যার মত কোন একজনের বড় বেশি প্রয়োজন, যিনি কুসংস্কার ও অলৌকিকত্বের মায়াজাল থেকে জনগণকে মুক্ত করবেন। কারণ—অলৌকিক বাবা-মায়েদের ভিড় এবং জ্যোতিষীদের রমরমা আমাদের দেশে বড় বেশি। আর দেশের শাসনভার যাঁদের উপর তাঁরাই এ-সবের পৃষ্ঠপোষক। আমাদের দেশের মন্ত্রীরা নির্বাচনের আগে জয়ের আশায় মন্দিরে, মসজিদে পুজো দেন, অবতারদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। রাজনীতিবিদ থেকে বড়-মেজ আমলারা পর্যন্ত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের আগে দ্বারস্থ হন গুরুদেব বা জ্যোতিষীদের। যে কোনও রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয় ঈশ্বরের পুজো করে। এইসব অন্ধ-সংস্কারের ধারক-বাহক হিসেবে পশ্চিম বাংলার বামফ্রন্ট সরকারের মার্কসবাদী মন্ত্রীরাও পিছিয়ে নেই। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী 'রত্ন সম্রাট' উপাধি তুলে দেন কতিপয় সেন মহাশয়ের হাতে। 'ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ মহাসম্মেলন'-এ বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে মার্কসবাদী মন্ত্রী ডাঃ অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম সোচ্চারে বিজ্ঞাপিত হয়।

তিন

সাধু সন্তদের কিছু অলৌকিক ঘটনা

ব্রহ্মচারী বাবা

ছেলেবেলা থেকেই কোন সাধু-সন্তর খবর পেলেই তাঁর কাছে দৌড়োই, সত্যিই তাঁর কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে কি না জানাব ইচ্ছেয়। সালটা বোধহয় ১৯৫৪। আমার কলেজের বন্ধু বরাহনগরের শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেনের গোরাচাঁদ দত্ত একদিন বললো, ওদের

পারিবারিক গুরুদেব এক ব্রহ্মচারী বাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। ওদের গুরুদেবের নাম আমি আগেই শুনেছি। এও শুনেছি, ওঁর লক্ষ লক্ষ শিষ্য-শিষ্যা। বাংলা তথা ভারতে ওই ব্রহ্মচারী বাবার নাম খুবই পরিচিত।

গোরা আমাকে একদিন বললো, "তুই তো অলৌকিক ক্ষমতার মানুষ খুঁজছিস, আমি কিন্তু নিজের চোখে আমার গুরুদেবকে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে দেখেছি। বরানগরের স্কুলে একবার গুরুদেব জন্মদিন পালনের ব্যবস্থা হয়েছে। অনুষ্ঠান সন্ধেতে। কিন্তু, বিকেল থেকেই হাজার হাজার লোকের ভিড়। বরানগরেও ওঁর প্রচুর শিষ্য-শিষ্যা। আমরা স্থানীয় কিছু তরুণ শিষ্য ভলান্টিয়ার হয়ে অনুষ্ঠান যাতে সুন্দরভাবে হয় তার দেখাশুনা করছি। বিকেলবেলাতেই এক ভদ্রলোক দশ-বারো বছরের ছেলের হাত ধরে এসে হাজির হলেন। উনি আমাকেই জিজ্ঞেস করলেন, বাবা কখন আসবেন ?

"বললাম, সন্ধে নাগাদ।

"ভদ্রলোক বললেন, তিনি এসেছেন বহুদূর থেকে। শুনেছেন বাবার অপার অলৌকিক ক্ষমতা। এও শুনেছেন, বাবার কাছে কেউ দীক্ষা নিতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে দীক্ষার জপ-মন্ত্র দিয়ে দেন। অনেক আশা করে তাঁর দুই বোবা-কালা ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। বাবাকে বলবেন, এদের দুটিকে দীক্ষা দিতে। দেখতে চান, কেমন করে বোবা-কালারা জপ-মন্ত্র শোনে।"

ভদ্রলোক ও তাঁর ছেলে দুটিকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে ওদের আগমনের উদ্দেশ্য ভলান্টিয়ার, চেনা, মুখ-চেনা, অনেকের কাছেই বলেছিল গোরা। খবরটা দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়েছিল। সব ভক্ত প্রচণ্ড ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করতে শুরু করলেন—কী হয় ? কী হয় ? সত্যিই কী বাবার দেওয়া জপ-মন্ত্র ওরা শুনতে পাবে ?

সন্ধের আগেই হাজার-হাজার শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তেরা বারবার ভদ্রলোক ও তাঁর দুই ছেলেকে কৌতূহলের চোখে দেখে গেল।

শেষ পর্যন্ত সেই শুভ মুহূর্তটি এলো। গুরুদেবের চরণে প্রণাম জানিয়ে ভদ্রলোক তাঁর দুই ছেলেকে দীক্ষা দিতে অনুরোধ করলেন। গুরুদেব ছেলেদুটিকে একে একে কাছে টেনে নিয়ে জপ-মন্ত্র দিয়ে বললেন, "শুনতে পেয়েছিস তো ?"

হাজার হাজার ভক্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন এর পর কী হয় দেখার জন্য। ছেলে দুটি পরিষ্কার গলায় বলে উঠলো, "শুনতে পেয়েছি।"

ঘটনার আকস্মিকতায় ভক্তরা হৃদয়াবেগ সংযত করতে পারলেন না। অনেকেরই দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো জলের ধারা। স্কুলের হল-ঘর গুরুদেবের জয়ধ্বনিতে ভরে গেল। ভদ্রলোক লুটিয়ে পড়লেন গুরুদেবের পায়ে।

গোরার কাছে এই ঘটনা শোনার পর একদিন ওর সঙ্গে গেলাম গুরুদেব-ব্রহ্মচারীর দর্শনে। কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় তখন তিনি থাকতেন। একতলার একটা হলের মতো বিরাট ঘরে প্রচুর ভক্ত অপেক্ষা করছিলেন। আমি আর গোরাও এই ঘরেই বসলাম। শুনলাম, গুরুদেব দোতলায় দর্শন দেন। সময় হলে আমাদের সকলকেই ডাকা হবে। ওখানে অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকের সঙ্গে আলাপ করে ফেললাম। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন ভারত-বিখ্যাত শিক্ষাবেত্তা। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি ওঁর কোন অলৌকিক ক্ষমতা নিজে দেখেছেন ?"

উত্তরে উনি যা বললেন, তা খুবই বিস্ময়কর। উনি একবার গুরুদেবের কাছে ক্ষিদে পেয়েছে বলাতে গুরুদেব বললেন, "দাঁড়া, তোর খাবার আনার ব্যবস্থা করছি।" গুরুদেব ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন, একটা আলো হয়ে গেলেন। তারপর আলোর ভিতর থেকে ভেসে এলো সোনার থালায় সাজান নানা রকমের মিষ্টি। কী তার স্বাদ! কী তার গন্ধ! অপূর্ব!"

জিজ্ঞেস করেছিলাম, "এই ঘটনার সময় আপনার সঙ্গে আর কেউ উপস্থিত ছিলেন?"

"না, শুধু আমিই ছিলাম।"

একসময়ে আমাদের ডাক পড়লো। সকলের সঙ্গে উপরে গেলাম। তলার ঘরটার মতোই একটা বড় ঘরে সিল্কের গেরুয়া পরে একটা বাঘছালের উপর বসে আছেন গুরুদেব। চারিদিকে পেলমেট থেকে দীর্ঘ ভারী পরদা ঝলছে। ঘরে মৃদু আলো। দেখলাম ভক্তেরা এক এক করে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করে নীচে চলে যাচ্ছেন। কেউ দিচ্ছেন ফুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি। কেউ এগিয়ে দিচ্ছেন মিষ্টির প্যাকেট। কেউ কেউ শিশি বা বোতলে জল নিয়ে এসেছেন। ওই জলে গুরুদেবের পায়ের বুড়ো আঙুল ডুবিয়ে নিয়ে পবিত্র পাদোদক করে নিচ্ছেন।

ব্রহ্মচারীবাবার এক সেবক যিনি সমস্ত ব্যাপারটা তদারক করছিলেন, তিনি একসময় আমাকে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতে বললেন। আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম না জানিয়ে ব্রহ্মচারীকে বললাম, "শ্রদ্ধার থেকেই প্রণাম আসে। আমার একটা প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা স্বীকার করে নিয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গেই আপনাকে প্রণাম করব।" ব্রহ্মচারীবাবা ইশারায় ঘরের কোণায় দাঁড়াতে বললেন। দাঁড়ালাম। শিষ্যদের প্রণাম শেষ হতে ব্রহ্মচারী আমার দিকে তাকালেন। আমার পাশে ছিল গোরা ও সেবক ভদ্রলোক। ব্রহ্মচারী আমাকে কাছে ডেকে বললেন "তোর প্রশ্নটা কী?" মুখে একটা রহস্যের হাসি।

বললাম, "আমি গতকাল সন্ধে সাতটার সময় কোথায় ছিলাম?"

ব্রহ্মচারী এবার গোরাকে বললেন, "ও বুঝি তোর বন্ধু? তা, তুই নীচে গিয়ে বোস। আমি ওর সঙ্গে একটু কথা বলব।"

গোরা বেরিয়ে যেতেই সেবকটিকে বললেন, "তুই দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যা। কেউ যেন আমার কাছে এখন না আসে।"

সেবকটি চলে যেতে ব্রহ্মচারীবাবা আমার সঙ্গে নানা রকম গল্পসল্প করলেন। আমার বাড়ির খবরাখবর নিলেন। এরই মধ্যে এক সময় সেবকটি দরজা খুলে জানাল, "দুই ভদ্রলোক এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছেন। মহিলাটির গল-ব্লাডারে স্টোন হয়েছে। আজই নার্সিং হোমে অপারেশন করার কথা। আপনার আশীর্বাদ নিতে এসেছেন।"

ব্রহ্মচারী বললেন, "অপেক্ষা করতে বল, দেরি হবে।"

আমরা আবার আমাদের গল্পে ফিরে গেলাম। সময় কাটতে লাগল, এক সময় আবার সেবকটি ঘরে ঢুকে বলল, "গুরুদেব, পেশেন্ট যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যদি অনুমতি করেন তো—"

বিরক্ত গুরুদেব বললেন, "যা নিয়ে আয়।"

একটু পরেই দুই ভদ্রলোকের সাহায্যে সেবকটি এক মহিলাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মহিলাটির মুখের চেহারায় তীব্র যন্ত্রণার ছাপ। মহিলাটিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামের ভঙ্গিতে গুরুদেবের পায়ের কাছে শুইয়ে দেওয়া হল। গুরুদেব সঙ্গের লোকদুটিকে বললেন, "তোরা নীচে গিয়ে বোস।" সেবকটিকে বললেন, "যা কুশীতে করে একটু জল নিয়ে আয়।"

সেবক কুশীতে জল নিয়ে এলেন। তারপর তিনিও গুরুদেবের আদেশে বেরিয়ে গেলেন। ব্রহ্মচারী কুশীটি মহিলাটির পিঠের উপর বসিয়ে তিরিশ সেকেণ্ডের মতো বিড়বিড় করে কী

যেন মন্ত্র পড়লেন ও কুশীর জলে বারকয়েক ফুল ছিঁড়ে পাপড়ি ছুঁড়লেন। তারপর আমাকে বললেন, "দেখ তো, জলটা গরম হয়েছে কি না ?"

কুশীর জলে হাত দিলাম, গরম। বললাম, "গরম হয়েছে।"

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "এবার কুশীটা পিঠ থেকে নামিয়ে ওকে তুলে দাঁড় করা।"

করলাম। গুরুদেব আদেশ দিলেন, "এবার ওকে জোর করে দৌড় করা।"

তাই করলাম, মহিলাটি, "পারব না, পারব না," করে ভেঙে পড়তে পড়তেও আমার জন্য দৌড়তে বাধ্য হলেন। এবং তারপর দৌড়ে গুরুদেবের পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ে বললেন, "বাবা, আমি ভাল হয়ে গেছি।"

গুরুদেব হাসলেন। বললেন, "যা, আর নার্সিং হোমে যেতে হবে না, বাড়ি ফিরে যা।"

মহিলাটি নিজেই হেঁটে চলে গেলেন। ব্রহ্মচারী এবার আমাকে বললেন, "তুই মাঝে মাঝে এখানে এলে এমনি আরও অনেক কিছুই দেখতে পাবি। এবার আমাতে বিশ্বাস জন্মেছে তো তোর ?"

বললাম, "আমি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর পাইনি। তা পেলেই আমার বিশ্বাস জন্মাবে।

গুরুদেব যা দেখালেন সেটা সাজান ব্যাপার হতে পারে।

জাদুকররা যেমন দর্শকদের মধ্যে নিজেদের লোক রেখে সাজান ঘটনা দেখিয়ে দর্শকদের অবাক করে দেন, অনেক গুরুদেবই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলে এই ধরনের নানা রকমের সাজান ঘটনার অবতারণা করেন।

কুশীর জল মন্ত্র পড়ে গরম করার ঘটনাটির পিছনেও ধাপ্পাবাজি থাকা সম্ভব। ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "দেখ তো কুশীর জলটা গরম হয়েছে কি না ?" আমি দেখেছিলাম গরম। এমনও তো হতে পারে, গরম জল এনেই রোগিণীর পিঠে রাখা হয়েছিল।

ব্রহ্মচারীবাবা আমাকে বললেন, "যা, দরজাটা ভেজিয়ে দে। তোর সঙ্গে আর কিছু কথা আছে।"

আদেশ পালন করলাম। ব্রহ্মচারীবাবা নিজেই উঠে গিয়ে দেওয়াল-আলমারি খুলে একটা রাইটিং-প্যাড ও পেনসিল নিয়ে এলেন। প্যাড আর পেনসিলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "আমাকে না দেখিয়ে এতে লেখ, কাল সন্ধের সময় কোথায় ছিলি।"

লিখলাম, মধ্যমগ্রামে ; বিপুলদের বাড়িতে।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, "প্যাডের কাগজটা ছিঁড়ে তোর হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রাখ।"

ধরে রাখলাম, তবে শক্ত করে নয়, আলতো করে। ব্রহ্মচারীবাবা আমার হাত থেকে প্যাডটা নিলেন। তারপর আমাকে চোখ বুজে এক মনে সমুদ্রে সূর্যোদয়ের দৃশ্য ভাবতে বললেন। আমি ভাবতে লাগলাম।

আমার কপালটা কিছুক্ষণ ছুঁয়ে থেকে গুরুদেব বললেন, "দেখতে পাচ্ছি তুই গিয়েছিলি একটা গ্রাম-গ্রাম জায়গায়। জায়গাটা মধ্যমগ্রাম। বাড়িটাও দেখতে পাচ্ছি। ঠাণ্ডা, শান্ত, বড় সুন্দর পরিবেশ।"

বললাম, "সত্যিই সুন্দর। মুলিবাঁশের দেওয়াল, মাটির মেঝে, টালির চাল, অদ্ভুত এক ঠাণ্ডা আর শান্ত পরিবেশ।"

গুরুদেব বললেন, "হ্যাঁ, তাই দেখতে পাচ্ছি। একটা লাউ না কুমড়ো গাছ যেন ওদের বাঁশের দেওয়াল বেয়ে উঠেছে।"

আরো অনেক কিছুই বলে গেলেন উনি। কিন্তু ততক্ষণে গোরার গুরুর দৌড় আমার জানা হয়ে গেছে। কারণ, গতকাল সন্ধে দুটো থেকে আটটা পর্যন্ত ছিলাম কলকাতার বিখ্যাত কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে। জাদুকররা অনেক সময় কার্বন পেস্টেড কাগজের প্যাডে দর্শকদের দিয়ে কোন কিছু লিখিয়ে তলার কাগজে কার্বনের ছাপে কী উঠেছে দেখে বলে দেন কী লেখা হয়েছিল। অনেক সময় সাধারণ প্যাডে হার্ড পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখিয়ে তলার পাতাটায় পেন্সিলের সীসের গুঁড়ো ঘষেও বলে দেওয়া হয়, কী লেখা হয়েছিল। আমি কফি হাউসে থেকেও ইচ্ছে করে লিখেছিলাম মধ্যমগ্রামে ; বিপুলদের বাড়িতে। অলৌকিক ক্ষমতার বদলে কৌশলের আশ্রয় নিতে গেলে গুরুদেব ভুল করতে বাধ্য। আর ভুল করতে বাধ্য হলেনও। আমিও সামান্য একটু চালাকির আশ্রয় নিয়ে বিপুলদের বাড়ির যে ধরনের বর্ণনা দিলাম গুরুদেবও সেই বর্ণনাতেই সায় দিয়ে গেলেন। অথচ বিপুলদের বাড়ি দস্তুরমতো পেল্লাই পাকা বাড়ি। সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত অধ্যাপক দেবজ্যোতি বর্মনের বাড়ির খুব কাছেই ছিল ওদের বাড়ি।

বিখ্যাত মহারাজের শূন্যে ভাসা : আমি তখন দমদম পার্ক-এ থাকি। ভারতবিখ্যাত এক সাধক মহারাজের এক শিষ্য ছিলেন আমার প্রতিবেশী। তাঁর কাছে অনেক দিনই তাঁর গুরুদেবের অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছি। দেশে-বিদেশে সাধক-মহারাজের প্রচুর নাম, প্রচুর ভক্ত। তাই, বিভিন্ন ভক্তদের সন্তুষ্ট করতে কোন জায়গাতেই একনাগাড়ে বেশি দিন থাকতে পারেন না। আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোককে ধরলাম, এইবার মহারাজ কলকাতায় এলে তাঁকে দর্শনের ব্যবস্থা করে দেবেন। সেই সঙ্গে দয়া করে এমন ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়।

আমার প্রতিবেশী ওই বিখ্যাত মহারাজের অতি বিশ্বস্ত ও প্রভাবশালী শিষ্য। তিনি এও জানতেন, অনেক সাধু-সন্তের কাছেই আমি গিয়েছি-টিয়েছি। তাই, ভক্তজন অনুমান করে আমাকে ভরসা দিলেন মহারাজ কোলকাতায় এলেই একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

একদিন বহু প্রতীক্ষিত সেই সুযোগ পেলাম। প্রতিবেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে গেলাম সেই বিখ্যাত মহারাজ দর্শনে। গুরুদেব তাঁর কিছু নিকটতম শিষ্যদের নিয়ে উঠেছিলেন দক্ষিণ কোলকাতারই এক প্রাসাদে। ওখানে পৌঁছে প্রতিবেশী বললেন, আজ আমাকে গুরুদেবের অলৌকিক ধ্যান দর্শন করাবেন। এই দৃশ্য সব শিষ্যরাও দেখার সুযোগ পান না। সেই দিক থেকে আমি মহাভাগ্যবান। ধ্যানের সময় মহারাজের শরীর মেঝে থেকে হাত খানেক উঁচুতে শূন্যে ভেসে থাকে।

নির্দিষ্ট সময়ে ধ্যান-কক্ষের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। কক্ষের দরজা তখনও বন্ধ। ভিতর থেকে ধূপের সুন্দর গন্ধ ভেসে আসছে।

এক সময় প্রতীক্ষার অবসান হলো, একজন শিষ্য কক্ষের ভারী দরজাটা একটু একটু করে খুলে দিলেন। আমাদের বারান্দার আলো নিভে গেল। ভিতরটা জ্যোৎস্নার মতো নরম আলোয় ভেসে যাচ্ছে। শান্তদর্শন গুরুদেব নিমীলিত চোখে পদ্মাসনে স্থির। তিনি বসে আছেন শূন্যে, মাটি থেকে প্রায় দেড় ফুট উঁচুতে। তাঁর পিছনে গাঢ় রঙের ভারী ভেলভেটের পর্দা।

বেরিয়ে এলাম চুপচাপ। অলৌকিক কিছুই দেখতে পেলাম না। ভারত বিখ্যাত মহারাজ যা দেখালেন, ম্যাজিকের পরিভাষায় তাকে বলে 'ব্ল্যাক আর্ট'। গুরুদেবের পিছনের এই গাঢ় রঙের পরদাটাই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল—

সাধক মহারাজের এই ধ্যানে শূন্যে ভেসে থাকার পিছনে কোন অলৌকিকত্ব নেই। এটা স্রেফ ব্ল্যাক-আর্টের খেলা। এই ব্ল্যাক-আর্ট-এর সাহায্যেই জাদুকরেরা কোন রমণীকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন, হাতিকে করেন অদৃশ্য, আবার শূন্য থেকে আমদানি করেন জিপগাড়ি।

ব্ল্যাক আর্টের আবিষ্কারক ম্যাক্স আউজিঙ্গার (Max Auzinger) নামের এক জার্মান ভদ্রলোক। তাঁর ব্ল্যাক-আর্ট পদ্ধতি আবিষ্কারের কাহিনী দারুণ মজার।

ম্যাক্স ছিলেন রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পরিচালিত একটা নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। একটা দৃশ্য তখন অভিনীত হচ্ছে। পিতা তাঁর অবাধ্য কন্যাকে একটা প্রায় অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছেন। অন্ধকার ঘরটার ভয়াবহতা ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক ম্যাক্স মঞ্চের তিন দিকের দেওয়াল কালো মখমলের পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে উপরের গবাক্ষ দিয়ে নেমে এলো এক টেলিফোন-কালো নিগ্রো ক্রীতদাস। নায়িকার এমন নাটকীয় মুক্তিক্ষণে

চ্যাং লিং সু ছদ্মনামের আড়ালে উইলিয়াম এলসওয়ার্থ রবিনসন

দর্শকদের উত্তেজনায় ও হাততালিতে ফেটে পড়ার কথা। কিন্তু কই? দর্শকদের মধ্যে ঘটনার কোন প্রতিফলন তো নেই? ব্যাপারটা বুঝতে ম্যাক্স দ্রুত মঞ্চ থেকে নেমে এলেন দর্শকদের কাছে। এবার মঞ্চের দিকে তাকাতেই কারণটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। স্বল্পালোকিত মঞ্চে কালো নিগ্রো ক্রীতদাস কালো মখমলের পর্দার সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে, ওকে দেখাই যাচ্ছে না। সঙ্গে-সঙ্গে ম্যাক্স-এর মাথায় এলো ব্ল্যাক-আর্টের মূল তত্ত্ব। গাঢ় রঙের পর্দা টাঙিয়ে সেই ধরনের গাঢ় রঙের যে কোনো কিছু সামনে রাখলে তা দেখা যায় না। এই একই নিয়মে গাঢ় রঙের পর্দার সামনে একই গাঢ় রঙের একটা দেড়ফুট উঁচু আসনে বসে থাকা গুরুদেবকেও ভক্ত শিষ্যরা শূন্যে ভাসমান বলে মনে করেন।

প্রায় একই সঙ্গে ব্ল্যাক-আর্টের খেলা দর্শকদের সামনে হাজির করেন মার্কিন জাদুকব উইলিয়াম এলস্‌ওয়ার্থ রবিনসন (William Ellsworth Robinson), যিনি চীনা ছদ্মবেশে চ্যাং লিং সূ নামেই জাদুর জগতে পরিচিত এবং বরেণ্য হয়েছিলেন।

ব্ল্যাক আর্ট ছাড়া সাধিকার শূন্যে ভাসা

শারদীয় পরিবর্তন ১৩৯১-তে একটি প্রবন্ধে শূন্যে ভেসে থাকা এই মহারাজের কাহিনীটির উল্লেখ করায় কোলকাতার জনৈকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু উষ্মার সঙ্গে পরিবর্তনে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত-বিখ্যাত এক সাধিকাকে তিনি নিজের চোখে ব্ল্যাক-আর্টের সাহায্য ছাড়াই শূন্যে ভেসে থাকতে দেখেছেন। সাধিকা ধ্যানে যখন শূন্যে ভেসে ছিলেন, তখন তাঁর পিছনে ছিল নেহাতই সাদামাটা চুনকাম করা দেওয়াল। শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করেছিলেন—এইক্ষেত্রে অলৌকিক তত্ত্বের বিরোধী প্রবীর ঘোষ কি উত্তর দেবেন?

উত্তর আমি দিয়েছিলাম। এবং নিয়মমাফিক পত্র-লেখিকার চিঠি সমেত আমার উত্তর পরিবর্তন পত্রিকায় জমা দিয়েছিলাম। পত্র-লেখিকার চিঠি এবং আমার উত্তর, কোনটাই প্রকাশিত হয়নি, তাই শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠিকানা ও তাঁর লেখা চিঠিটি পুরোপুরি তুলে দিতে পারলাম না।

প্রসঙ্গত জানাই, পরিবর্তনে ওই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। অভিনন্দন জানিয়ে অনেক চিঠি যেমন পেয়েছি, তেমনি অনেক চিঠি পেয়েছি যাতে পত্র-লেখক বা পত্র-লেখিকারা বিভিন্ন বইতে বা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অথবা নিজের চোখে দেখা নানা ধরনের অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করে আমাকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। চ্যালেঞ্জ জানান প্রতিটি অলৌকিক ঘটনারই ব্যাখ্যা করে লিখিত উত্তর ও চিঠি-পত্রগুলো পরিবর্তনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু যে কোন কারণে চ্যালেঞ্জ জানান ওই চিঠিগুলো ও তার উত্তর প্রকাশিত হয়নি। যাই হোক, এই বইটিতে বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা করার সময় ওইসব অলৌকিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করব এবং ব্যাখ্যা রাখব। যে-সব পত্র-লেখক ও পত্র-লেখিকা আমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বা নেহাতই জানার আগ্রহ নিয়ে বিভিন্ন অলৌকিক (?) ঘটনার ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন এবং পাননি, তাঁরা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলেন আমি ঘটনাগুলো ব্যাখ্যা করতে অক্ষম বলেই চিঠিগুলো প্রকাশিত হয়নি। আজ সেইসব পত্র-প্রেরকদের কাছে অনুরোধ, আপনার জানার সেই আগ্রহ আজও থাকলে এই বইটি পড়ুন, তারপর আমার ব্যাখ্যাকে যুক্তিগ্রাহ্য মনে হলে স্বীকার করুন যে, ঘটনাগুলোর পিছনে কোনো অলৌকিকত্ব ছিল না।

আমরা আবার ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় ফিরে যাই। তিনি দেখেছিলেন এক শূন্যে ভাসমান সাধিকার পিছনে ছিল সাদামাটা চুনকাম করা দেওয়াল।

ব্ল্যাক আর্টের সাহায্যে শূন্যে ভেসে রয়েছে পিনাকী ঘোষ

যে পদ্ধতিতে ব্ল্যাক-আর্টের সাহায্য ছাড়া সাদা দেওয়াল পিছনে নিয়ে সাধিকা শূন্যে ভেসে ছিলেন, সেই একই পদ্ধতিতে অনেক জাদুকর সাদা স্ক্রিনের সামনেও অনেক কিছু ভাসিয়ে রাখেন।

পদ্ধতিটা আর কিছুই নয়, স্ক্রিনের পিছন থেকে একটা ডাণ্ডা বেরিয়ে এসে শূন্যে ভাসাতে চাওয়া জিনিসটিকে স্টেজের প্লাটফর্ম থেকে তুলে রাখে। ওই একই পদ্ধতি সাদা দেওয়াল থেকে বেরিয়ে আসা শক্ত ও সরু একটা লোহার পাতের মাথায় ছোট্ট একটা বসার মতো জায়গা তৈরি করে নিয়ে অনেক সাধক-সাধিকাই ধ্যানে শূন্যে ভাসার 'অলৌকিক লীলা' দেখান। ধ্যানে বসা শরীরের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় লোহার পাত। ফলে দর্শকরা মনে করেন সাধক-সাধিকা শূন্যে ভেসে রয়েছেন। ছোটদের জনপ্রিয়তম পত্রিকা আনন্দমেলার ২৬ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সংখ্যায় 'নিরালম্ববাবা ও আনন্দবাবু' নামে এই ধরনের ব্ল্যাক-আর্ট ছাড়া শূন্যে ভেসে থাকার ঘটনাকে নির্ভর করে একটি গল্প লিখি।

সাদা দেওয়ালে ভেসে থাকার ব্যাপারটা ছবি এঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছি।
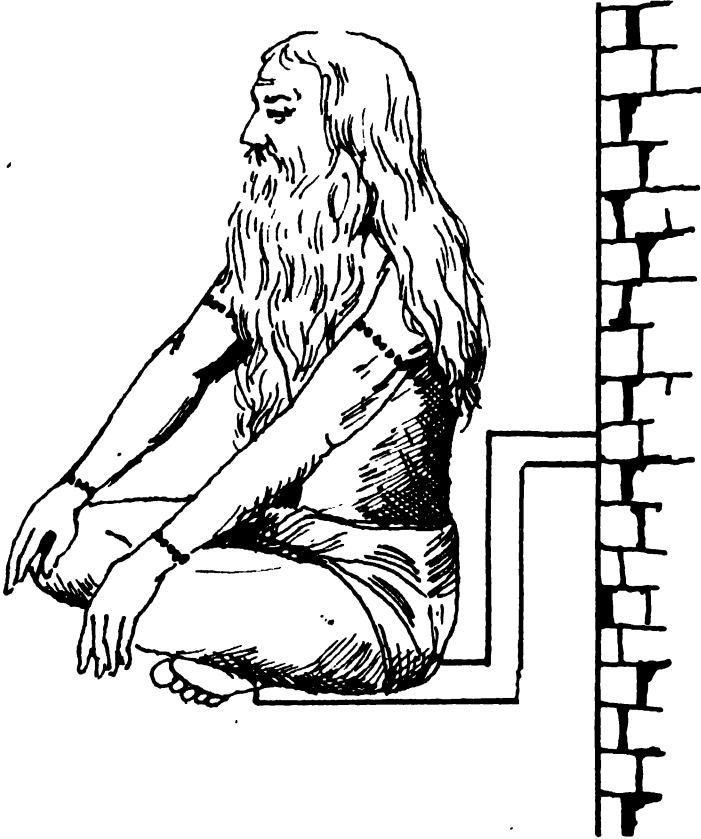
লাঠিতে হাতকে বিশ্রাম দিয়ে শূন্যে ভাসা

চন্দননগর বা ওর ধারে-কাছের কোন জায়গা থেকে কৌশিক মুখোপাধ্যায় নামে একজন পরিবর্তনের লেখাটির প্রেক্ষিতে একটি চিঠি দিয়েছিলেন (চিঠিটি উত্তর সমেত পববর্তন পত্রিকা দপ্তরে জমা দিয়ে দেওয়ায় আমি পত্র-লেখকের সঠিক ঠিকানা জানাতে পারছি না। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি দুঃখিত)। যতদূব মনে পড়ছে, তিনি লিখেছিলেন, বেশ কিছু বছর আগে (সালটা আমার ঠিক মনে নেই।) বারানসীতে এক সন্ন্যাসীকে সামান্য একটা লাঠির উপর হাতকে বিশ্রাম দিয়ে তাঁর শরীরকে শূন্যে তুলে রাখতে দেখেছিলেন। কৌশিকবাবু কিছুটা ঝাঁজ মিশিয়ে লিখেছিলেন, প্রবীববাবুর আন্তরিক সত্যনিষ্ঠা থাকলে যেন কিছুটা কষ্ট করে ওই স্থানে গিয়ে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, তা হলেই আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে পারবেন।

কৌশিকবাবু সত্যিই যে এই ধবনের ঘটনা ঘটতে দেখেছেন সেই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তাই অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন নেই।

কাঠের লাঠিতে হাতকে বিশ্রাম দেবার জন্য এলিয়ে রেখে সাধুবাবার শূন্যে ভেসে থাকা
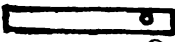
লাঠিতে ভর দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলা দেখাচ্ছেন জাদুকর পি· সি· সরকার জুনিয়ার
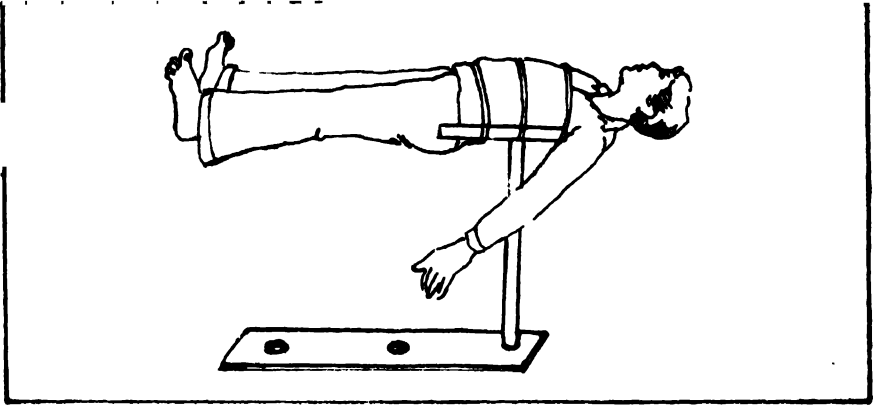
কৌশিকবাবু ঠিকই দেখেছেন। কিন্তু ঘটনাটার পিছনে যে লৌকিক বা বিজ্ঞানসম্মত কারণ রয়েছে, সেই কারণটি জানা না থাকায় তিনি অলৌকিক বলেই ঘটনাটাকে মেনে নিয়েছেন।

পাঠক-পাঠিকাদের প্রায় সকলেই বোধহয় ম্যাজিক দেখেছেন। আর দেখেছেন সেই জাদুর খেলা, যেখানে জাদুকর একটি মেয়েকে সম্মোহিত করে (আসল ব্যাপারটা অবশ্য পুরোপুরি অভিনয়) তিনটে সরু লোহার বর্শার উপর শুইয়ে দেন ; তারপর, বর্শা দুটো সরিয়ে নেওয়ার পর মেয়েটি একটি মাত্র বর্শার উপর ঘাড় পেতে বাকি দেহ শূন্যে ভাসিয়ে শুয়ে থাকে। অথবা দেখেছেন, জুনিয়র পি· সি· সরকারের সেই ম্যাজিক, যাতে তিনি একটি খোঁড়া মেয়ের বগলে একটা কাঠের ডাণ্ডা গুঁজে দিয়ে তাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন।

সাধুবাবাজিরাও সেই একই নিয়ম একটি কাঠের দণ্ডের সাহায্য নিয়ে নিজের শরীরকে শূন্যে তুলে রাখেন।

জাদুকর যে মেয়েটিকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে চান, তার পোশাকের তলায় থাকে একটা ৫ থেকে ৭ ইঞ্চি চওড়া ফুট দেড়েকের মতো লম্বা শক্ত ধাতুর পাত। পাতটি প্রয়োজন অনুসারে লম্বা বা এই ধরনের একটু বাঁকান হতে পারে। চামড়ার বা ক্যানভাসের তিন-চারটে বেল্ট দিয়ে ধাতুর পাতটি শরীরের সঙ্গে বাঁধা থাকে। পাতটিতে প্রয়োজন মতো এক বা একাধিক ফুটো থাকে। যে ডাণ্ডার উপর নির্ভর করে মেয়েটি শূন্যে ঝুলে থাকে সেই ডাণ্ডার মাথাটা হবে একটু বিশেষ মাপের। দেখতে হবে ডাণ্ডার মাথাটা যেন মেয়েটির পোশাক সমেত ওই ধাতুর পাতের ফুটোয় শক্ত ও আঁটোসাঁটোভাবে ঢোকে। মেয়েটির যা করণীয়, তা হলো সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় ও সরু পাতের উপর ব্যালেন্স রেখে শোওয়া।

ডাণ্ডার উপর হাত রেখে সাধুরা যে-সব পদ্ধতিতে·নিজেদের দেহকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন, তার কয়েকটা ছবি এখানে দিলাম। শূন্যে ভেসে থাকা বিষয়ে আগেই বিস্তৃত আলোচনা করে নেওয়ায় ছবিগুলো দেখলে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন সাধুদের ভেসে থাকার কৌশলগুলি।

আলেকজাণ্ডার হাইমবুর্গার (Alexander Heimburghar) নামে এক বিখ্যাত জাদুকর আমেরিকায় ১৮৪৫-৪৬ সাল নাগাদ একটা অদ্ভুত খেলা দেখিয়ে আলোড়নের ঝড় তুলেছিলেন। খেলাটা ছিল জাদুকরের এক সঙ্গী, একটা খাড়া ডাণ্ডার মাথায় শুধুমাত্র একটা

হাতের কনুই ঠেকিয়ে শূন্যে ভেসে থাকত।

আলেকজাণ্ডারের লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি এই খেলা দেখানো শুরু করেন ভারত থেকে প্রকাশিত একটি বার্ষিকী পত্রিকায় এক ফকিরের অলৌকিক খেলার বর্ণনা পড়বার পর। ফকিরটি একটি বাঁশের লাঠি মাটিতে খাড়া রেখে লাঠির উপর হাত ঠেকিয়ে তার এক সঙ্গীকে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখত।

অসাধারণ জাদুকর হ্যারি হুডিনি এক জাদু আলোচনায় বলেন, তিনি এই লাঠিতে ভর দিয়ে শূন্যে ভেসে থাকার খেলাটির কথা প্রথম জানতে পারেন টমাস ফ্রস্ট (Thomas Frost) নামের এক ইংরেজ লেখকের লেখা বই পড়ে। লেখক ১৮৩২ সালে মাদ্রাজের এক ব্রাহ্মণকে শূন্যে বসে থাকতে দ্যাখেন। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে, একটা তক্তাজাতীয় কাঠের টুকরোতে চারটে পায়া লাগানো ছিল। তক্তায় ছিল একটা ফুটো। ফুটোটা ছিল এই মাপের, যাতে, একটা লাঠি ঢোকালে লাঠিটা শক্ত হয়ে তক্তার সঙ্গে আটকে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। খাড়া দাঁড়িয়ে থাকা লাঠির সঙ্গে লাগানো থাকত আর একটা ছোট ডাণ্ডা। এটা থাকত মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে। ছোট ডাণ্ডাটায় হাতের ভর রেখে শূন্যে ভেসে থাকতেন ব্রাহ্মণ।

১৮৪৮ সাল নাগাদ আধুনিক জাদুর জনক রবেয়ার উদ্যাঁও তাঁর দু'বছরের ছেলে ইউজেনকে এই পদ্ধতিতে শূন্যে ভাসিয়ে রেখে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে প্রচণ্ড বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন। একটা খাড়া লাঠিতে কনুইটুকুর ভর দিয়ে শূন্যে ভেসে থাকত ইউজেন।

প্রায় একই সময়ে লণ্ডনে এইভাবে শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলাটি দেখিয়েছিলেন আর দু'জন জাদুকর। এঁরা হলেন কমপার্স হারম্যান ও হেনরি অগুারসন।

শূন্যে ভাসিয়ে রাখার খেলাকে আর এক ধাপ উন্নত করলেন জাদুকর জন নেভিল ম্যাসকেলিন (John Nevil Maskelyne)। ১৮৬৭ সালে তিনি লণ্ডনের এক জাদু-প্রদর্শনীতে তাঁর স্ত্রীকে সম্মোহিত করে (অভিনয়) একটা টেবিলের উপর শুইয়ে দেন। তারপর, দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখলেন, শ্রীমতী ম্যাসকেলিনের দেহটা ধীরে-ধীরে শূন্যে উঠে গেল। এই খেলাকে জাদুর ভাষায় বলা হয় 'আগা' (A. G. A.)। A. G. A.'র পুরো কথাটা হল Anti Gravity Animation।

এই খেলাটিকেই আরও নাটকীয় আরও সুন্দর ক'রে দেখালেন হ্যারি কেলার (Harry Kellar)। স্থান আমেরিকা। খেলাটির নাম দিলেন 'Levitation of Princess Karnac'।

শূন্যে ভেসে থাকার খেলাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন বেলজিয়ামের প্রখ্যাত জাদুকব সার্ভেস লে-রয় (Servais Le Roy)। আমি যতদূর জানি, এটাই শূন্যে ভাসিয়ে বাখার সর্বশেষ উন্নততম পদ্ধতি। লে-রয় তাঁর দলের একটি মেয়েকে সম্মোহন করে (পুরোটাই অভিনয়) একটি উঁচু বেদীতে শুইয়ে দিতেন। মেয়েটিকে ঢেকে দেওয়া হত একটি রেশমি কাপড় দিয়ে। এক সময় মেয়েটির কাপড়ে ঢাকা শরীরটা ধীরে-ধীরে শূন্যে উঠতে থাকত। তারপর, হঠাৎ দেখা যেত জাদুকরের হাতের টানে চাদরটা জাদুকরের হাতে চলে এসেছে। কিন্তু মেয়েটি কোথায় ? বেমালুম অদৃশ্য। বর্তমানে পি· সি· সরকার জুনিয়রও এই খেলাটি খুব আকর্ষণীয়ভাবে দেখিয়ে থাকেন।

লে-রয়ের এই খেলা যদি অসৎ কোন ব্যক্তি লোক-ঠকানোর জন্য দেখায়, তবে অনেকেই তাকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতে পারেন। সাধারণের ধারণা হতে পারে সাধকের নিজেকে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়াই শূন্যে ভাসিয়ে রাখা এবং হঠাৎ হাওয়ায় মিশে যাওয়ার পিছনে রয়েছে সেই অলৌকিক খেলা, যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। অথচ, আর সব জাদুর খেলার মতোই গোটা খেলাটার মধ্যে রয়েছে অতি সাধারণ কিছু কৌশল।

জাদুকর তাঁর সহকারী মেয়েটিকে সম্মোহন করার অভিনয় করেন। মেয়েটিও সম্মোহিত হওয়ার অভিনয় করে। সম্মোহিত হওয়া মেয়েটিকে সহকারীদের সাহায্যে একটা টেবিল বা বেঞ্চের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। দু'জন সহকারী রেশমের কাপড় দিয়ে যখন মেয়েটির শরীর ঢেকে দেয়, তখন সামান্য সময়ের জন্য কাপড়টা এমনভাবে মেলে ধরে যাতে শুয়ে থাকা মেয়েটির দেহ কিছুক্ষণের জন্য দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এই অবসরে মেয়েটি পিছনের পর্দার আড়ালে সরে যায় এবং পাতলা রবারের হওয়া ঢোকান একটি নকল মেয়েকে টেবিল বা বেঞ্চের উপর তুলে দেয়। সহকারী দু'জন ওই বেলুনের তৈরি মেয়েটিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। বেলুন-মেয়েটির গলায় ও পায়ে থাকে খুব সরু স্টিলের তার। তারের মাথা দুটি ছুঁচের মতো উপরের দিকে উঠে থাকে। ফলে, ঢেকে দেওয়া কাপড় ভেদ করে তার দুটি উপরে উঠে আসে। ঢেকে দেওয়ার পর দুটি তারের মুখ একসঙ্গে মুড়িয়ে জোড়া দিয়ে দেওয়া হয়। জাদুকর সরু তারটি ধরে বিভিন্ন কায়দায় মেয়েটিকে এবার শূন্যে ভাসিয়ে রাখেন। কখনও জাদুকরের

ইশারায় মেয়েটি উঁচুতে উঠে যায়, কখনও নীচে নেমে আসে। মঞ্চে গাঢ় নীল বা বেগুনি আলো ফেলা হয়। ফলে, তিন-চার ফুট দূরের দর্শকদের পক্ষেও তারের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব হয় না।

এরপর আসা যাক দেহটা অদৃশ্য করা প্রসঙ্গে। জাদুকরের একটা হাতের বুড়ো আঙুলে পরানো থাকে একটা সরু রিং। রিং-এর মাথায় থাকে একটা পিন। অদৃশ্য করার সময় জাদুকর বেলুনে পিন ফুটিয়ে দেন। বেলুন যায় ফেটে। সঙ্গে-সঙ্গে বেলুন-মেয়েও হয়ে যায় অদৃশ্য। আর বেলুন ফাটার আওয়াজ ঢাকতে জাদুকরের বাজনদারেরাই যথেষ্ট।

বেদে-বেদেনীদের তুক-তাক-মন্তরে শূন্যে ভাসা

অনেকেই বোধহয় দেখেছেন রাস্তার পাশে, বাজার-হাটে, মাঠে-ময়দানে, খোলা জায়গায় এক ধরনের বেদে-সম্প্রদায়ের লোকেরা সত্য সাঁই-এর ছোট একটা বাঁধান ছবি, দু-একটা হাড়, মড়ার খুলি ও ছোট্ট একটা টিনের বাক্সে কিছু তাবিজ সাজিয়ে সত্য-সাঁই-এর অপার কৃপায় নানা ধরনের অলৌকিক খেলা দেখায়। আমি অবশ্য অনেককে মা-কালী বা ওই ধরনের কোন মুখ, ছাগলের পা, বিড়াল জাতীয় প্রাণীদের নখ এবং তাবিজ সাজিয়েও নানা ধরনের খেলা দেখাতে দেখেছি।

এই বেদে-সম্প্রদায় অবশ্য সব সময়ই লোক ঠকানোর জন্য ওদের বিভিন্ন খেলাকেই অলৌকিক আখ্যা দিয়ে থাকে। যুক্তি দিয়ে খেলাগুলোর ব্যাখ্যা না পেলে দর্শকরা অনেক সময় ওদের কথায় বিশ্বাস করে ফেলেন এবং চটপট নগদ দামে অলৌকিক মাদুলিও কিনে ফেলেন। অনেকে না কিনলেও এইটুকু অন্তত বিশ্বাস করে ফেলেন, ওরা তন্ত্র-মন্ত্রে ও তুক-তাকে সিদ্ধ মানুষ।

আমাকে অনেকেই অনেক সময় প্রশ্ন করেছেন, ব্ল্যাক-আর্ট, ঘরের দেওয়ালের সাহায্য বা কোন ডাণ্ডার সাহায্য ছাড়াই অনেক বেদে-সম্প্রদায়ের লোকেরা খোলা জায়গায় মানুষকে শূন্যে

ভাসিয়ে রাখে। এটা কী করে সম্ভব ? একটি বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকও আমাকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। অনেকেই এটাকে ওদের অলৌকিক ক্ষমতা বলেই বিশ্বাস করেন। এই বিশ্বাসীদের মধ্যে রয়েছেন প্রচুর শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীরাও।

আমি বলি, অবশ্যই নয়। এটাও একটা লৌকিক খেলা আরও অনেক অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনার মতোই এর পিছনেও রয়েছে অতি সাধারণ কৌশল। অথচ, খেলাটি দেখে সাধারণ দর্শক কেন, অনেক বিশেষজ্ঞ জাদুকরকেও আশ্চর্য হতে দেখেছি। ঠিক কী ভাবে খেলাটা দর্শকদের কাছে হাজির করা হয় তার একটু বর্ণনা দিলে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সত্য-সাঁই বা অন্য কোনো ঈশ্বরের কৃপায় অলৌকিক ক্ষমতাধর বেদে তার এক সহকারীকে মাটির উপর শুইয়ে বিশাল এক চাদর দিয়ে তাকে ঢেকে দেয়। চাদরে থাকে একটা ফুটো, যা দিয়ে মাথাটা শুধু বেরিয়ে থাকে। তারপর ডমরু ও বাঁশি বাজিয়ে বেদেটি সহকারীটির চারপাশে ঘুরতে থাকে। একসময় মড়ার হাড় বা খুলি নিয়ে নানা মন্ত্রপাঠ করতে থাকে। বেদেটির আহ্বানে ওর আরও দু'জন সহকারী বা দু'জন দর্শক(এরাও বেদেটিরই লোক) এগিয়ে এসে শুয়ে থাকা দেহটির মাথা ও পায়ের দিকে চাদরটা ধরে একটু নেড়ে দেয়। কী আশ্চর্য ! সহকারীর চাদরে ঢাকা দেহ একটু একটু করে শূন্যে উঠতে থাকে এবং এক সময় দেহটা শূন্যে দেড়-ফুটের মতো উঁচুতে ভাসতে থাকে।
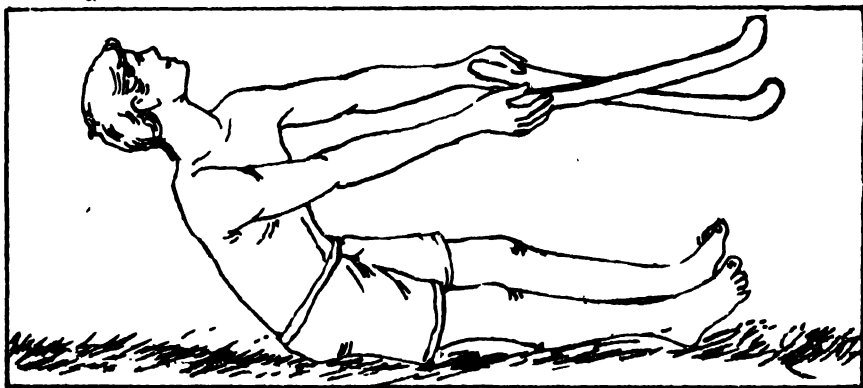
পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিটিতে দেখিয়েছি বেদেটির সহকারীর শরীর শূন্যে ভেসে রয়েছে, এবং ওর, শরীর ঢেকে দেওয়া চাদরটা মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে রয়েছে।

মাটি পর্যন্ত লুটিয়ে থাকা চাদরের তলায় রয়েছে ভেসে থাকার আসল রহস্য। চাদরের তলায় সহকারী হকিস্টিক ও ওই ধরনের কোন লাঠির সাহায্য নিয়ে যা করে তা ছবিটি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

এই ধরনের খেলা বসে এবং দাঁড়িয়ে দুভাবেই দেখানো সম্ভব। দাঁড়িয়ে দেখালে উচ্চতা বাড়বে।

মন্ত্রে যজ্ঞের আগুন জ্বলে

এবার যে ঘটনাটার কথা বলছি সেটা ঘটেছিল স্কুল জীবনে। সালটা সম্ভবত ১৯৫৭। বাবা রেলওয়েতে চাকরি করতেন, সেই সুবাদে আমরা তখন খড়্গপুরের বাসিন্দা। পড়ি কৃষ্ণলাল

শিক্ষানিকেতনে। একদিন হঠাৎ খবর পেলাম, পাঁচবেড়িয়া অঞ্চলের এক বাড়িতে খুব ভূতের উপদ্রব হচ্ছে। তার দিনকয়েক পরেই খবর পেলাম, বাড়ির মালিক ভূত তাড়াতে কোথা থেকে যেন এক বিখ্যাত তান্ত্রিককে নিয়ে এসেছেন। তারপরেই যে খবরটা পেলাম, সেটা ভূতের চেয়েও অদ্ভুত। তান্ত্রিক প্রতিদিনই যজ্ঞ করছেন এবং যজ্ঞের আগুন জ্বালছেন মন্তর দিয়ে, দেশলাই দিয়ে নয়।

এমন এক অসাধারণ ঘটনা নিজের চোখে দেখতে পরদিনই স্কুল ছুটির পর দৌড়লাম। গিয়ে দেখি শয়ে শয়ে লোকের প্রচণ্ড ভিড়। ভিড় ঠেলে যখন ভিতরে ঢোকার সুযোগ পেলাম, তখন দেখি যজ্ঞ চলছে। যজ্ঞের তান্ত্রিককে সেদিন অবাক চোখে দেখেছিলাম। তাকে কেমন দেখতে ছিল তা মনে নেই। তবে, এইটুকু মনে আছে, সেদিন তান্ত্রিক ছিল আমার চোখে 'হিরো'।

পরের দিন পেটের ব্যথা বা ওইজাতীয় একটা কোন অজুহাতে স্কুলে গেলাম না। দুপুরে মা'কে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে যাওয়ার অনুমতি পেলাম। সেদিন যজ্ঞ শুরুর আগেই পৌঁছেছিলাম। ইট দিয়ে একটা বড়-সড় যজ্ঞের জায়গা করা হয়েছিল, তাতে সাজানো ছিল অনেক কাঠ। পাশে স্তূপ করা ছিল প্রচুর কাঠ, পাটকাঠি, এক ধামা বেলপাতা ও একটা ঘিয়ের টিন। একসময় তান্ত্রিক এসে বসলেন। তার সামনে ছিল একটা কানা-উঁচু তামার বাটি। তান্ত্রিক আসনে বসে 'মা, মা' বলে বার-কয়েক হুঙ্কার ছাড়লেন। তারপর বাটিটার উপর ডান হাতের আঙুলগুলো নিয়ে আরতি করার ভঙ্গিমায় নাড়তে লাগলেন।

একসময় অবাক হয়ে দেখলাম, শূন্য তামার বাটিতে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। বিস্মিত ভক্তেরা তান্ত্রিকের জয়ধ্বনি করে উঠল। জয়ধ্বনির মধ্যেই তান্ত্রিকবাবাজি ওই আগুন থেকে পাটকাঠি জ্বেলে যজ্ঞে আগুন জ্বাললেন।

সেই দিনের সেই বিস্ময় আজ আর আমার মধ্যে নেই। সেদিনের হিরো আজ আমার চোখে নেহাতই এক প্রবঞ্চক মাত্র। আজ আমিও ওই তান্ত্রিকের মতোই শূন্য-পাত্রে আগুন সৃষ্টি করতে পারি। এই আগুন সৃষ্টির জন্য আমাকে কোন ঠাকুর-দেবতা বা অলৌকিক শক্তির সাহায্য নিতে হয় না। যার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, সে হল বিজ্ঞান। আর, এ-ও জানি, আমারই মতো ওই তান্ত্রিকও সেদিন বিজ্ঞানেরই সাহায্য নিয়ে আগুন সৃষ্টি করেছিলেন। সেদিন তান্ত্রিকের বাটিতে ছিল কিছুটা পুলভ্যানাইজড পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট। আর, তান্ত্রিকের ডান হাতের আংটির খাঁজে লুকনো ছিল গ্লিসারিন ভর্তি ড্রপার। হাত নাড়তে নাড়তে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন বাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। পুলভ্যানাইজড্ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট গ্লিসারিনের সংস্পর্শে এসে তাকে অক্সিডাইজড করে ফেলেছিল। এই অক্সিডেশনের ফিজিক্যাল পরিবর্তন হিসেবে ওই রাসায়নিকের উত্তাপ বেড়ে গিয়ে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর-দেবতা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের নানা অলৌকিক ঘটনার কথা অনবরত পড়ে ও শুনে আমাদের মনের মধ্যে একটা যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি হচ্ছে। এই মানসিকতার সুযোগ নিয়ে একদল প্রতারক অলৌকিক ক্ষমতার নামে লৌকিক-জাদু দেখিয়ে ধর্মের নামে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা জঘন্য অপরাধী। এই সব অপরাধীরা আমাদের অশিক্ষা ও অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে শাস্তি এড়িয়ে চলে। কারণ, সরকার ধর্মান্ধ লোকেদের কথা ভেবে অনেক ক্ষেত্রে এই সব অপরাধীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে সাহস পান না।

খবরের কাগজগুলোতে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী নানা ব্যক্তি সম্পর্কে অনেক গপ্পো-কথা আমি পড়েছি, অনেকের মুখে অনেক সাধুবাবার অলৌকিক ক্ষমতার গপ্পো আমি শুনেছি, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এইসব লোকদের ক্ষমতা সম্পর্কে যখনই অনুসন্ধান করেছি, তখনই দেখেছি অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা এদের কারোরই নেই। ভাববাদীরা অবশ্য বলবেন, আমি যাদের নিয়ে লিখছি তাদের বাইরেও আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী এসেছিলেন আমাদের এই বিশ্বে, বিশেষত সাধু-সন্তদের দেশ ভারতবর্ষে। অতীতের ওই সব সাধু-সন্ন্যাসীদের নিয়ে গড়ে ওঠা কাহিনী বা কল্পকাহিনীর ব্যাখ্যা তথ্যের অভাবেই বর্তমানে অনুসন্ধান করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান অলৌকিক বা আপ্রাকৃতিক কোন ঘটনা বা রটনাতে বিশ্বাস করে না। অলৌকিক কোনো কিছু ঘটেছিল বা ঘটানো সম্ভব এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব সাধু-সন্ন্যাসীদের বা তার ভক্তদের। যদিও কোন ক্ষেত্রেই তারা এই ধরনের কোন প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়নি।

সত্য সাঁইবাবা

সত্য সাঁইবাবা বর্তমান ভারতের সবচেয়ে প্রচারিত অলৌকিক ক্ষমতাবান (?) ব্যক্তি। আর সব অবতারদের মতো সাঁইবাবারও ভক্তদের মধ্যে রয়েছে সমাজের কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই অবতারদের পক্ষে অতি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। সাধারণ মানুষ ভাবে এত বড়-বড় নামী-দামী লোকেরা যখন অমুকের শিষ্য, তখন অমুক সাধকের নিশ্চয়ই অনেক ক্ষমতা

সাঁই বাবা

অলৌকিক ঘড়ি-রহস্য

সাঁইবাবার এমনি এক বিশিষ্ট ভক্ত ডঃ এস· ভগবন্থম্, এম· এসসি· ডি· এসসি· পিএইচ· ডি। ইনি ভারত সরকারের প্রাক্তন বিজ্ঞান উপদেষ্টা। ভগবন্থম জানালেন, তিনি অলৌকিকে বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু, সাঁইবাবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর আগেকার ধারণাই পাল্টে গেছে। নিজের চোখে সাঁইবাবার যে-সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দেখেছেন, তাতে অলৌকিকে বিশ্বাস না করে উপায় ছিল না। সাঁইবাবার একটি অলৌকিক কাজের বিবরণ তিনি যেভাবে দিয়েছেন, তা হল, জাপানের বিশ্ব-খ্যাত ঘড়ি তৈরির যে সংস্থা রয়েছে, তারই এক বড় কর্মকর্তা বছর কয়েক আগে ভারতে এসে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা সম্ভ্রম জাগানোর মতো। কর্তাব্যক্তিটি সিকো ঘড়ির উন্নততর মডেল তৈরি করে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অফিসে নিজের ব্যক্তিগত আলমারিতে রেখে আসেন। ভারতে এসে তিনি নিছক কৌতূহল মেটাতে সাঁইবাবার আশ্রমে তাঁকে দর্শন করতে আসেন। ভক্তদের মধ্যে ওই জাপানি ভদ্রলোকটিকে দেখতে পেয়ে সত্য সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটি পার্সেল তৈরি করে তাঁকে দেন। পার্সেলটি খুলে ভদ্রলোক হতবাক হয়ে যান। পার্সেলটির ভিতরে ছিল জাপানে রেখে আসা ঘড়ির মডেলটি। ঘড়ির সঙ্গে বাঁধা রেশমের ফিতে, সঙ্গে মডেলটির নতুন নাম লেখা লেবেলটিও রয়েছে। এই ঘটনা দেখে জাপানি ভদ্রলোকের সাঁইবাবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ গেল মিলিয়ে, সাঁইবাবার পায়ে পড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এই ঘটনার পর থেকে তিনি সাঁইবাবার একজন একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে ওঠেন। জাপানে ফিরে তিনি আলমারি খুলে দেখেন ঘড়িটি নেই। তাঁর ব্যক্তিগত-সচিব যা বললেন, তা আরও বিস্ময়কর। সচিব বললেন, ঝাঁকড়া চুলের দেবকান্তি একটি লোক একদিন হেঁটে অফিসে ঢুকলেন, তারপর আলমারি খুলে ঘড়িটি নিয়ে চলে গেলেন।

অলৌকিকে অবিশ্বাসী ডঃ কোভুর ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার জন্য ডঃ ভগবন্থমকে চিঠি লিখে জাপানী ভক্তটির নাম ও ঠিকানা জানতে চান। একাধিকবার চিঠি লিখেও ডঃ কোভুর কোন উত্তর পাননি। শেষ পর্যন্ত ডঃ কোভুর শ্রীলঙ্কার জাপানী দূতাবাস থেকে সিকো ঘড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার ঠিকানা সংগ্রহ করে ওই কোম্পানির প্রেসিডেন্টকে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ করে ৩০ অক্টোবর ১৯৫০-এ একটি চিঠি লেখেন। সিকো ঘড়ির প্রস্তুতকারক সংস্থা কে· হাট্টোরি অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রেসিডেন্ট শোজি হাট্টোরি এর উত্তরে যা জানান তা তুলে দিলাম।

ডঃ এ· টি· কোভুর
পামানকাডা লেন
কলম্বো—৬, শ্রীলঙ্কা

প্রিয় ডঃ কোভুর,

আপনার ৩০ অক্টোবরের চিঠিটির জন্য ধন্যবাদ। অলৌকিক ক্ষমতার দাবি বিষয়ে আপনার গবেষণার আগ্রহের আমি প্রশংসা করি। আপনি চিঠিতে মিস্টার সাঁইবাবার বিষয়ে জানতে চেয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে আমি বেশি কিছু জানাতে পারছি না। আমার বা আমাদের

কোন কর্মীর সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের পরিচয় ঘটেনি। আমি নিশ্চিত, যে ঘটনার কথা আপনি বলেছেন, তার কোন ভিত্তি নেই। তাই ওই ঘটনাকে ভিত্তি করে আপনি যেসব প্রশ্ন রেখেছেন, তার উত্তরে 'না' বলা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

আপনার একান্ত
কে, হাট্টোরি অ্যাণ্ড কোং লি
স্বাক্ষর শোজি হাট্টোরি
প্রেসিডেন্ট

চিঠির উত্তর পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না, সিকোর বড়-মেজো কোন কর্তার সঙ্গেই সাঁইবাবার এই ধরনের কোনো মুলাকাৎ হয়নি।

উত্তরটি পাওয়ার পর ডঃ কোভুর আবার ডঃ ভগবন্থমকে চিঠি লিখে শোজি হাট্টোরির কাছ থেকে পাওয়া উত্তরটির কথা জানান। ডঃ কোভুর আরও জানতে চান ডঃ ভগবন্থম যে জাপানি ভক্তের কথা বলেছেন, তিনি কি অন্য কোন ব্যক্তি ? তাঁর নাম, ঠিকানা ও সিকো'তে কী পদে কাজ করেন জানান। এবারও ডঃ ভগবন্থম আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকেন। ডঃ ভগবন্থমের নীরবতা এবং ডঃ কোভুরের সত্যকে জানার প্রচেষ্টা এটাই প্রমাণ করে যে সিকো ঘড়ির অলৌকিক ঘটনা নেহাতই মিথ্যে প্রচার মাত্র।

অবতার বা অলৌকিক ক্ষমতার (?) অধিকারীদের পক্ষে জনপ্রিয় বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকাগুলো যেভাবে প্রচার চালায়, অবতারদের বিপক্ষে কেউ যুক্তির অবতারণা করলেও সেভাবে কিন্তু প্রচার চালান হয় না। তার কারণগুলো হল (১) এখনও পাঠক-পাঠিকাদের বড় অংশই আবেগপ্রবণ, যুক্তিহীন, অ-বিজ্ঞানমনস্ক এবং কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এই ধরনের পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের পক্ষে এবং আবেগকে সুড়সুড়ি দেওয়ার পক্ষে অবতারদের কাহিনী যথেষ্ট কার্যকর। (২) জনপ্রিয় অবতারদের কাহিনী ছাপা হলে সেই অবতারদের শিষ্য-শিষ্যা ও ভক্তদের বড় অংশ পত্রিকাটির 'রেগুলার' পাঠক-পাঠিকা না হলেও সংখ্যাটি কিনবেন বা পড়বেন। (৩) অবতারদের কাছ থেকে পত্র-পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন বাবদ অথবা অন্যভাবে কিছু সুযোগ সুবিধে পেয়ে থাকে। (৪) পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অনেক সময় নিজেরাই যুক্তিহীনতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং অবতারবাদে বিশ্বাসী ও অবতারবাদের পৃষ্ঠপোষক।

সাঁইবাবার ছবিতে জ্যোতি

অবতারবাদে বিশ্বাসী ও অবতারবাদের এমনই এক পৃষ্ঠপোষক 'ব্লিৎস' পত্রিকার সম্পাদক মিস্টার করঞ্জিয়া। ২২·৩·৮১-এর 'সানডে' পত্রিকার সংখ্যায় শ্রীকরঞ্জিয়া এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, "সম্প্রতি যোগের মাধ্যমে আমি এর ভিতরে প্রবেশ করেছি। যোগ শুরু করার পর অনেক রহস্যময় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এই যে আমরা দু'জনে এখানে বসে রয়েছি, আর আমাদের চারপাশে রয়েছে অনন্ত মহাজাগতিক শক্তি, অথচ আমরা জানি না কীভাবে একে কাজে লাগাব। এই সবই আমাকে ভারতীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। সাঁইবাবার ভিতর এই মহাজাগতিক শক্তির কিছু বহিঃপ্রকাশ দেখতে পেয়েছি।"

শ্রীকরঞ্জিয়া সাঁইবাবার একটি ক্যামেরা ফোটো দেখান। ফোটোটিতে সাঁইবাবার চারপাশে একটা উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা দেখা যায়। শ্রীকরঞ্জিয়া দাবি করেন, এই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা হল

সাঁইবাবার শরীর থেকে নির্গত জ্যোতি। আসলে ছবিটি Infra-red -photography। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে যে কোনো জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদের ছবি থেকেই জ্যোতি বেরুতে দেখা যাবে, তা সে গাধাই হোক বা সাঁইবাবাই হোন।

সাঁইবাবার বিভূতি

সাঁইবাবার নামের সঙ্গে 'বিভূতি'র ব্যাপারটা এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, সাঁইবাবা বললেই তাঁর অলৌকিক বিভূতির কথাই আগে মনে পড়ে। সাঁইবাবা অলৌকিক প্রভাবে তাঁর শূন্য হাতে সুগন্ধি পবিত্র ছাই বা বিভূতি সৃষ্টি করে ভক্তদের বিতরণ করেন। বছরের পর বছর মন্ত্রমুগ্ধের মতো ভক্তেরা দেখে আসছেন সাঁইবাবার বিভূতি সৃষ্টির অলৌকিক লীলা।

১৯৫৪'র ১ মার্চ, ২ এপ্রিল, ২ মে ও ১ জুন সাঁইবাবাকে চারটে চিঠি দিই। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি চিঠিরও উত্তর পাইনি। আমার ইংরেজিতে লেখা প্রথম চিঠিটির বাংলা অনুবাদ এখানে দিলাম।

ভগবান শ্রী সত্যসাঁইবাবা
প্রশান্তিনিলায়ম
পুট্টাপার্টি
জেলা—অনন্তপুর
অন্ধ্রপ্রদেশ

প্রিয় সত্যসাঁইবাবা,

ভক্ত ও শিষ্য সংখ্যার বিচারে আপনিই সম্ভবত ভারতের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয়তম ধর্মগুরু। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আপনার অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতার সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছি এবং আপনার কিছু ভক্তের কাছে আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছি। আপনার অলৌকিক খ্যাতি প্রধানত 'বিভূতি' সৃষ্টির জন্য। পড়েছি এবং শুনেছি যে, আপনি অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যে হাত নেড়ে 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করেন এবং কৃপা করে কিছু-কিছু ভাগ্যবান ভক্তদের তা দেন।

আমি অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী। অলৌকিক কোন ঘটনা বা অলৌকিক ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির বিষয় শুনলে আমি আমার যথাসাধ্য অনুসন্ধান করে প্রকৃত সত্যকে জানার চেষ্টা করি। দীর্ঘ দিন ধরে বহু অনুসন্ধান চালিয়েও আজ পর্যন্ত একটিও অলৌকিক ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা ঘটনার সন্ধান পাইনি। আমার এই ধরনের সত্যকে জানার প্রয়াসকে প্রতিটি সৎ মানুষের মতোই আশা করি আপনিও স্বাগত জানাবেন,সেই সঙ্গে এ-ও আশা করি যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়ে অনুসন্ধানে আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আপনার পোশাক ও শরীর পরীক্ষা করার পর আপনি আমাকে শূন্যে হাত নেড়ে, 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করে দেখালে আমি অবশ্যই মেনে নেব যে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং অলৌকিক বলে বাস্তবিকই কোনো কিছুর অস্তিত্ব আছে।

আপনি যদি আমার চিঠির উত্তর না দেন, অথবা যদি আপনার বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তবে অবশ্যই ধরে নেব যে আপনার সম্বন্ধে প্রচলিত প্রতিটি

অলৌকিক কাহিনীই মিথ্যে এবং আপনি 'পবিত্র ছাই' বা 'বিভূতি' সৃষ্টি করেন কৌশলের দ্বারা, অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা নয়।

শুভেচ্ছান্তে,

প্রবীর ঘোষ

সাঁইবাবাকে লেখা পরের চিঠিগুলোর বয়ান একই ছিল, তবে, সেগুলোতে আগে যে যে তারিখে চিঠি দিয়েছিলাম এবং উত্তর পাইনি, সেই তারিখগুলোর উল্লেখ ছিল।

শূন্যে হাত নেড়ে ছাই বের করাটা ঠিকমতো পরিবেশে তেমনভাবে দেখাতে পারলে যুক্তিহীনদের কাছে অলৌকিক ক্ষমতা-প্রসূত বলে মনে হতে পারে।

১৬· ৪· ৫৮ তারিখের 'সানডে' সাপ্তাহিকে জাদুকর পি· সি· সরকার জুনিয়র জানান তিনি সাঁইবাবার সামনে শূন্যে হাত ঘুরিয়ে একটা রসগোল্লা নিয়ে আসেন। সাঁইবাবা এই ধরনের ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন।

শূন্যে হাত ঘুরিয়ে রসগোল্লা নিয়ে আসা, এটা জাদুর ভাষায় 'পামিং'। পামিং হল কিছু কৌশল, যেগুলোর সাহায্যে ছোটখাটো কোনো জিনিসকে হাতের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়। আমার ধারণা সাঁইবাবা তাঁর 'পবিত্র ছাই' পাম করে লুকিয়ে রাখেন না, কারণ প্রচুর ছাই 'পাম' করে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সাঁইবাবা যে পদ্ধতিতে ভক্তদের 'পবিত্র ছাই' বিতরণ করেন বলে আমার ধারণা আমি সেই একই পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নজনের সামনে ছাই-সৃষ্টি করেছি। প্রতিটি অত্যাশ্চর্য জাদুর মতোই এই খেলাটিরও কৌশল অতি সাধারণ।
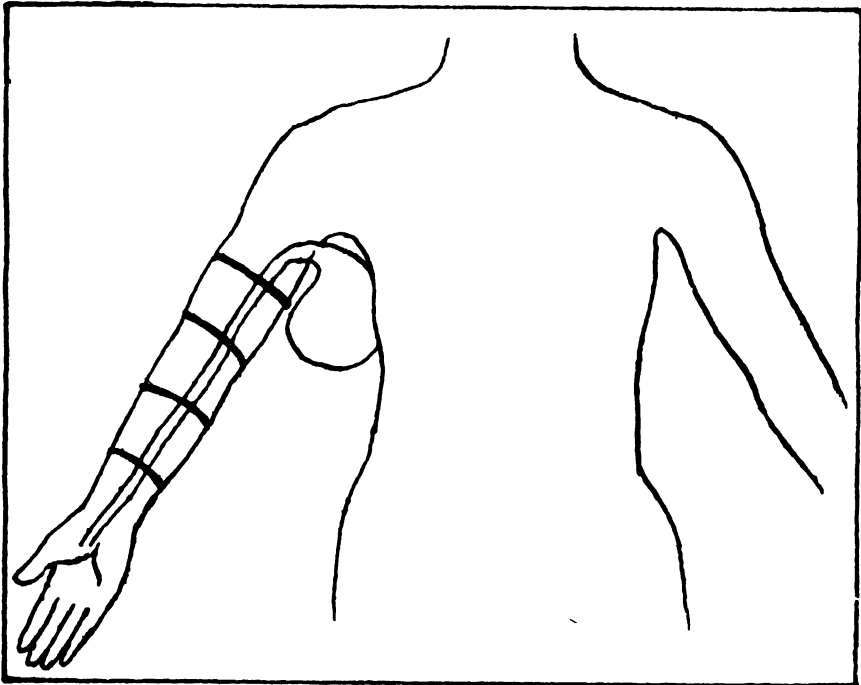
যে অবতার শূন্যে ডান হাত নেড়ে পবিত্র ছাই বের করতে চান তাঁর ডান বগলে বাঁধা থাকে রবারের বা নরম প্লাসটিক জাতীয় জিনিসের ছোটখাটো ব্লাডার। ব্লাডারে ভর্তি করা থাকে সুগন্ধি ছাই। ব্লাডারের মুখ থেকে একটা সরু নল হাত বেয়ে সোজা নেমে আসে হাতের কব্জির কাছ বরাবর। পোশাকের তলায় ঢাকা পড়ে যায় ব্লাডার ও নল। এবার ছাই সৃষ্টি করার সময় ডান হাত দিয়ে বগলের তলায় বাঁধা ব্লাডারটায় প্রয়োজনীয় চাপ দিলেই নল বেয়ে হাতের মুঠোয় চলে আসবে পবিত্র ছাই। বাঁ হাত দিয়েও ছাই বের করতে চান ? বাঁ বগলেও একটা ছাই-ভর্তি ব্লাডার ঝুলিয়ে নিন। দেখলেন তো, অবতার হওয়া কত সোজা !

বুঝবার সুবিধের জন্য পূর্ব পৃষ্ঠার ছবি দেখুন।

সত্য সাঁইবাবা সম্বন্ধে এও শুনেছি যে, অনেকের বাড়িতে রাখা সাঁইবাবার ছবি থেকে নাকি পবিত্র ছাই বা বিভূতি ঝরে পড়ে। বছর কয়েক আগে কোলকাতায় জোর গুজব ছড়িয়ে ছিল যে, অনেকের বাড়ির সাঁইবাবার ছবি থেকেই নাকি বিভূতি ঝরে পড়ছে। প্রতিটি মিথ্যে গুজবের মতোই এই ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব হয়নি, ব্যক্তিগতভাবে আমি যাঁদের মুখেই এইসব গুজব শুনেছি তাঁদেরই চেপে ধরেছি। আমার জেরার উত্তরে প্রায় সকলেই জানিয়েছেন যে, তাঁরা নিজের চোখে বিভূতি ঝরে পড়তে দেখেননি। যে দু-একজন প্রত্যক্ষদর্শী পেয়েছি, তাঁদের অনেকেই জাদুসম্রাট পি. সি. সরকারের গণসম্মোহনের প্রত্যক্ষদর্শীদের মতোই মিথ্যাশ্রয়ী, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। যাঁরা সত্যিই বাস্তবে ছবি থেকে বিভূতি পড়তে দেখেছেন, তাঁরা শতকরা হিসেবে সংখ্যায় খুবই কম। তাঁরা দেখেছেন ভক্তদের বাড়ির ছবি থেকে বিভূতি পড়তে বা ছবির তলায় বিভূতি জমা হয়ে থাকতে। এই বিভূতি বা ছাই সৃষ্টি হয়েছে দু রকম ভাবে। (১) কোনো সাঁইবাবার ভক্ত অন্য সাঁই ভক্তদের চোখে নিজেকে বড় করে তোলার মানসিকতায় সাঁইবাবার ছবির নীচে নিজেই সুগন্ধি ছাই ছড়িয়ে রাখে। (২) সাঁইবাবার ছবির কাঁচে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল মাখিয়ে ঘষে দেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ল্যাকটিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল বাতাসের সংস্পর্শে এলে গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে ছাইয়ের মতো ঝরে পড়তে থাকে।

বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে সাঁইবাবার ওপর অনুসন্ধানের জন্য ১২ জনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। নাম দেওয়া হয় Saibaba Exposure Committee। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সময়কার উপাচার্য ডঃ নরসিমাইয়া ছিলেন এই কমিটির উদ্যোক্তা। সাঁইবাবার সহযোগিতার অভাবে কমিটি শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালাতে ব্যর্থ হন।

শূন্য থেকে হীরের আংটি

মেয়েদের একটি বাংলা সাময়িক পত্রিকার ১৯৫১ সালের জুলাই মাসের সংখ্যায় লেখা হয়েছিল সাঁইবাবা শূন্য থেকে একটা হীরের আংটি সৃষ্টি করে নাকি পণ্ডিত রবিশংকরকে দিয়েছিলেন। শূন্য থেকে হীরে সৃষ্টির ঘটনা একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। পণ্ডিত রবিশংকরকে যে কোনো জাদুকরই শূন্য থেকে হীরের আংটি এনে দিতে পারেন। আর এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে দেখালেই কী ওই জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হবে ? শূন্য থেকে সৃষ্টির ক্ষমতা যদি থাকে তবে খোলামেলা পরিবেশে একটা স্কুটার কী একটা মোটর বা বিমান সৃষ্টি করে উনি দেখান না। ব্ল্যাক-আর্টের দ্বারা জাদুকরেরা শূন্য থেকে হাতি বা জীপ-কার সৃষ্টি করেন। জাদুকরদের এই সৃষ্টির মধ্যে থাকে কৌশল। সাধু-বাবাজিদের সৃষ্টির মধ্যে এই ধরনের কোনো কৌশল থাকলে চলবে না। কোনও

বাবাজী যদি শূন্য থেকে এই ধরনের বড়সড়-মাপের কোনো কিছু সত্যিই সৃষ্টি করতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই প্রমাণিত হবে অলৌকিক বলে কিছু আছে, এবং তাবৎ বিশ্বের যুক্তিবাদীরাও আর এইসব নিয়ে কচ্‌কচানির মধ্যে না গিয়ে অলৌকিক বলে কিছুর বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে নেবে।.

কৃষ্ণ অবতার কিট্টি

সত্তরের দশকের গোড়ায় কর্নাটকের পাণ্ডবপুরে কৃষ্ণের অবতার হিসেবে উপস্থিত হয় বালক কিট্টি। বালকটির মা-বাবা ছাড়া সাঁইবাবাও ঘোষণা করেন যে, ও ভগবান সাঁই ও ভগবান কৃষ্ণের অবতার সাঁইকৃষ্ণ। ভক্তের ভিড়েরও অভাব হল না। শোনা গেল সাঁই-ভজনের সময় সাইকৃষ্ণ শূন্য থেকে পবিত্র সুগন্ধি ছাই তৈরি করে বিলি করে ভক্তদের মধ্যে। শূন্য থেকে কখনও কখনও সাঁইবাবার ছোট্ট ছবিও তৈরি করে ভক্তদের মধ্যে বিলি করে। ভক্তদের মধ্যে ডাক্তার বা ডক্টরেটেরও অভাব হল না। বাঙ্গালোরের ডঃ জি· ভেঙ্কটরাও আবির্ভূত হলেন এই ধরনের এক ভক্ত প্রচারকারী হিসেবে।

সাঁইকৃষ্ণের ঈশ্বর-ব্যবসা যখন জমজমাট, সেই সময় ১৯৫৬ সালের ১৫ জুলাই বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য পরমাণু বিজ্ঞানী ডঃ এইচ· নরসিমাইয়ার নেতৃত্বে এক অনুসন্ধানকারী দল হঠাৎই হাজির হন সাঁইকৃষ্ণের বাড়িতে। এই দলে ছিলেন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, জাদুকর, আইনব্যবসায়ী প্রমুখ।

দিনটি ছিল সাঁইকৃষ্ণের ভজনার বিশেষ দিন। এই দিনটিতে ভক্তদের সাঁইকৃষ্ণ পবিত্র বিভূতি বিলি করেন। যুক্তিবাদী এই দল ভক্তদের সামনেই সাঁইকৃষ্ণের পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখা সুগন্ধি ছাই বের করে দেন। সাঁইকৃষ্ণের এই বুজরুকি ধরা পড়ে যাওয়ায় ওর জম-জমাট ঈশ্বর-ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়।

যে সব সাধকরা একই সময়ে একাধিক স্থানে হাজির ছিলেন

ভারতের অতীত ও বর্তমানের গাদা-গাদা অবতারদের সম্বন্ধে শোনা যায় যে তাঁরা নাকি একই সঙ্গে একাধিক স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শুধু রামঠাকুর বা শ্যামাপদ লাহিড়ীই নন এযুগের অনেকের সম্বন্ধেই এই ধরনের কথা শুনেছি। আদ্যাপিঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের শ্যালক পরেশ চক্রবর্তীর তান্ত্রিক হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি আছে। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, একবার তাঁর এক ভক্তের জীবনের অন্তিম লগ্নে উপস্থিত থাকার জন্য ট্যাক্সিতে যাচ্ছিলেন। ট্যাক্সিতে সঙ্গী ছিলেন অসুস্থ ভক্তেরই আত্মীয়। কলকাতার বিখ্যাত যানজটে তাঁর ট্যাক্সি যায় আটকে। পরেশ চক্রবর্তী এই সময় আর একটি দেহ ধারণ করে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে তাঁর কাছে হাজির হয়ে দেখা দেন। পরে ট্যাক্সি যখন ভক্তের বাড়িতে পৌঁছায় তখন সব শেষ। পরেশ চক্রবর্তীকে সেই মুহূর্তে আবার ট্যাক্সি থেকে ঘরে ঢুকতে দেখে ভক্তের বাড়ির সকলেই অবাক হয়ে যান। আর বিস্মিত হন, যখন জানতে পারেন যে, যেই সময় তাঁরা রোগীর শিয়রে পরেশ চক্রবর্তীকে দেখেছেন সেই সময় বাস্তবিকপক্ষে তিনি ছিলেন ট্যাক্সিতে।

আমার ভায়রা পুলিন রায়চৌধুরী ছিলেন পেশায় শিক্ষক। তার বড়দা তান্ত্রিক বলে পরিচিত।

তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি একবার বিশেষ কাজে ট্রেনে যেতে যেতে তাঁর মনে পড়ে আজ তাঁর বাড়িতে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাইরে থেকে আসবেন। তিনি বাস্তবে ট্রেনে ভ্রমণ করতে থাকেন এবং তারই সঙ্গে আর একটি দেহ ধারণ করে বন্ধুকে সঙ্গ দেন। এই দু'জনকেই আমি একই কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, "আপনি আমার সামনেই দু'জন হয়ে দেখান।"

দু'জনের কেউই তা দেখাননি। কারণ, তা কোনোদিনই তাঁদের পক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। শুধু তাঁদের পক্ষেই বা বলি কেন, কারও পক্ষেই কোনদিনই দেখানো সম্ভব নয়। যে-সব ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দু'জায়গায় হাজির হয়েছে বলে শোনা গেছে সে-সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শী অবশ্যই ভিন্ন-ভিন্ন লোক। এমনি অবস্থায় একজন লোকটিকে দেখেছেন, আর একজন লোক মিথ্যে কথা বলেছেন। অথবা, একজন আসল লোকটিকে দেখেছেন আর একজন অন্য কাউকে সেই লোক বলে মনে করেছেন বা নকল লোককে দেখেছেন। একই লোকের দু'জায়গায় হাজির হওয়া নিয়ে বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন জাদুকর আলেকজাণ্ডার হারম্যান-এর একটি সত্যি-গল্প শোনাই।

হারম্যান দি-গ্রেট ছিলেন খেয়ালি প্রকৃতির লোক। তিনি যখন যে শহরে জাদুর খেলা দেখিয়েছেন তখন সেই শহরের লোকেরা অনুভব করেছে তাঁর দুটো অস্তিত্ব। কখনও শহরের থিয়েটার হলে যেই সময় জাদুর খেলা দেখিয়ে কয়েকশো লোককে অবাক করে দিয়েছেন, সেই একই সময়ে শহরের বাজারে কয়েক'শ লোক তাঁকে বাজার করতে দেখেছেন। আবার কখনও একই সঙ্গে তাঁকে দেখা যাচ্ছে হলে জাদুর খেলা দেখাতে এবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘোড়ার দৌড় দেখতে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকশো বা কয়েক হাজার লোক। এ-সব ক্ষেত্রে শেখান-পড়ান মিছে কথার সুযোগ নেই। অতএব সে-কালের বহু লোকই বিশ্বাস করতেন হারম্যানের অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

হারম্যানের কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না। ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও উপযুক্ত সহকারী উইলিয়ম রবিনসন্। পরবর্তীকালে এই রবিনসনই চাং লিং সু ছদ্মনামে জাদুর জগতে এসে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাদুকর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর দুই জাদুকর হ্যারম্যান ও রবিনসনের শরীরের কাঠামোর সাদৃশ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁরা স্টেজের বাইরেও আর-এক খেলায় মেতে ছিলেন। রবিনসন নিখুঁত ছদ্মবেশে হারম্যান সেজে যখন খেলা দেখাতেন তখন হারম্যান হাটে-মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। ফলে, অলৌকিক জাদুকর হিসেবে প্রচার ও পয়সা লুটেছিলেন হারম্যান ও তাঁর দল।

একই মানুষের দু'জায়গায় উপস্থিতি সম্বন্ধে যেমন স্বেচ্ছাকৃতভাবে ভুল বোঝান সম্ভব, তেমনি আবার অনেক সময় প্রত্যক্ষদর্শীর দেখার ভুলেও এই ধরনের গুজবের সৃষ্টি হয়। কেউ সেই গুজবকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করলে অলৌকিক-ক্ষমতার অধিকারী রূপে পরিচিত হতে অসুবিধে কোথায়?

আপনি কোনো লোককে আপনার পরিচিত লোক বলে কখনও ভুল করেছেন কী? আমার চেহারার সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে এমন ব্যক্তি বৃহত্তর কোলকাতাতেই থাকেন। আমার কলেজ জীবন থেকেই শুনে আসছি, আমাকে নাকি অমুক দিন দমদম স্টেশনে দেখা গেছে, যদিও সেদিন আমি সেখানে যাইনি। এই ধরনের ভুলের শিকার হয়েছি গত পঁচিশ বছরে বোধহয় বার তিরিশেক। দিলীপ সেন মধ্য-বয়স্ক ভদ্রলোক, থাকেন দমদমের চেতনা সিনেমা হলের পাশে। কর্মস্থল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এককালে আনন্দবাজারে সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দিলীপবাবুর ভাইয়ের বউ ও দিলীপবাবুর স্ত্রী একদিন আমার স্ত্রীকে বললেন, "প্রবীরবাবুকে কাল বিকেলে আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে রিকশা করে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম। সিনেমায় যাচ্ছিলেন নাকি?"

সেদিন সেই সময় আমি ও আমার স্ত্রী বাড়িতেই ছিলাম।

আমার এক ভায়রা সুশোভন রায়চৌধুরী একদিন আমাদের বাড়ির কাছেই আমার স্ত্রীকে বলল, "প্রবীর অত হন্তদন্ত হয়ে কোথায় দৌড়ল ?"

আমার স্ত্রী সীমা বললো, "ও তো বাড়িতেই রয়েছে।"

সুশোভন যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বললো, "আমি এক্ষুনি দেখেছি ওকে ট্যাক্সি ধরতে।"

সীমাও বললো, "আমিও এক্ষুনি বাড়ি থেকে আসছি।"

দু'জনেই এসে হাজির হলো আমি আছি কিনা দেখতে। আমি অবশ্য বাড়িতেই ছিলাম।

এই ধরনের আরও অনেক ঘটনাই আমার জীবনে ঘটেছে। শুধু আমার জীবনেই বা বলি কেন ? আমাদের এক সহকর্মী বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য একদিন অফিসে এসে আমাকে বললেন, "তোমার বউকে দেখলাম মিনিবাসে। এক মিনিবাসেই এলাম।"

আমি জানালাম, "সীমা এখন জামশেদপুরে। অন্য কাউকে দেখেছেন।"

বিশ্বনাথদা বেশ কয়েকবার সীমাকে দেখেছেন, অতএব ভুল হওয়া উচিত নয়। বিশ্বনাথদা বললেন, "বিশ্বাস করো, যাকে দেখেছি সে অবিকল সীমার মত দেখতে।"

এই ধরনের ভুল আরও অনেকের জীবনেই হয়েছে, হয়ত আপনার জীবনেও। যে-সব সাধুদের একাধিক জায়গায় একই সময়ে দেখা গেছে, সেগুলো যে এই ধরনের ভুল অথবা মিথ্যে প্রচার বা কৌশলমাত্র তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আমার সামনে কোনো অলৌকিক ক্ষমতাধর যদি নিজেকে দু'জন হিসেবে উপস্থিত করতে পারেন তবে আমার যুক্তিবাদী সব ধারণাই একান্ত মিথ্যে বলে স্বীকার করে নেব।

এটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের যে, লেখাপড়া জানা লোকেদের বেশির ভাগই অনেক অলৌকিক গাল-গল্পকেই যাচাই না করে অথবা যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই নির্বোধের মত বিশ্বাস করে ফেলেন।

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার তান্ত্রিক ও সন্ন্যাসীরা

আচার্য শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ ভারতী এবং পাগলাবাবা (বারাণসী) দু'জনেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে পরিচিত। দু'জনেরই ভক্ত-সংখ্যা যথেষ্ট। দু'জনেরই নাম একসঙ্গে উল্লেখ করার কারণ দু'জনের অলৌকিক ক্ষমতা একই ধরনের। আমি শুনেছিলাম এঁরা যে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবেই দিয়ে থাকেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই উত্তরগুলো নাকি ঠিক হয়।

আমি ৮৫'র মার্চে গৌরাঙ্গ ভারতীর কাছে গিয়েছিলাম। আমি কিঞ্চিৎ লিখিটিখি শুনে তিনি আমাকে কথা বলার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট খাইয়েছিলেন। কথায় কথায় গৌরাঙ্গ ভারতী বললেন, তিনি বর্তমানে বেশ কয়েক বছর ধরে অদ্ভুত এক ধরনের অসুখে ভুগছেন। অসুখটা হল হেঁচকি, এক নাগাড়ে হেঁচকি উঠতেই থাকে। এ-ও জানালেন কলকাতার তাবড় ডাক্তারদের সাহায্য নিয়েও আরোগ্যলাভ করতে পারেননি।

আমি কিন্তু গৌরাঙ্গ ভারতীর ভক্তদের কাছে শুনেছি, তিনি বিভিন্ন ভক্তদের দুরারোগ্য রোগ ভাল করে দিয়েছেন। আমি স্বভাবতই গৌরাঙ্গ ভারতীকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনার উপর লেখা একটা বইতে পড়লাম আপনি শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীমাতার বরপুত্র, বাক্-সিদ্ধ, অতীন্দ্রিয় ঐশী-শক্তির অধিকারী। আপনি নিজে যে কোন দুরারোগ্য রোগ যখন মায়ের কৃপায় সারাতে সক্ষম তখন নিজের রোগ কেন সারাচ্ছেন না ?"

"পরমপুরুষ রামকৃষ্ণদেব কী নিজের ক্যানসার সারাতে পারতেন না ? কিন্তু, তিনি মায়ের

আচার্য গৌরাঙ্গ ভারতী

দেওয়া রোগ-ভোগকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন," গৌরাঙ্গ ভারতী উত্তর দিয়েছিলেন।

আমি প্রশ্ন রেখেছিলাম, "মায়ের দেওয়া রোগকে যদি মেনেই নিতে চান, তবে কেন রোগ সারাবার জন্য আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছেন ?"

না ; সঠিক উত্তর ওঁর কাছ থেকে আমি পাইনি। যা পেয়েছিলাম তাতে অবশ্য অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তিনি দিয়েছিলেন আমার প্রশ্নের সঠিক লিখিত উত্তর। আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল, "আমি কী বিবাহিত ?"

একটা ছোট রাইটিং-প্যাডে উত্তরটা লিখে গৌরাঙ্গ ভারতী তাঁর হাতের কলমটা নামিয়ে রেখে আমাকে বললেন, "আপনি কী বিয়ে করেছেন ?" বললাম, "হ্যাঁ, করেছি।"

প্যাডটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন গৌরাঙ্গ ভারতী। লেখাটা জ্বল-জ্বল করছে 'বিবাহিত'।

আমি দ্বিতীয় প্রশ্ন রাখলাম, "আমাব প্রথম সন্তান ছেলে না মেয়ে ?"

এবারও উত্তর লিখে কলম নামিয়ে রেখে উনি আমাকেই পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "আপনার প্রথম সন্তান কী ?"

বললাম, "ছেলে।"

"দেখুন তো কী লিখেছি ?" প্যাডটা আবার মেলে ধরলেন আমার সামনে। স্পষ্ট লেখা রয়েছে 'ছেলে'।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও ছিল ঠিক। আমার অবাক হওয়া চোখমুখ দেখে গৌরাঙ্গ ভারতী আমাকে দুম্ করে 'আপনি' থেকে 'তুই' সম্বোধন করলেন। বললেন, "কী, অবাক হচ্ছিস ? এমনি অবাক আরও অনেকেই হয়েছে। বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ভারত বিখ্যাত ডাক্তার আই· এস· রায়, ডাঃ সুনীল সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বিশ্বজয়ী সেতার-শিল্পী পণ্ডিত রবিশঙ্কর, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শঙ্করপ্রসাদ মিত্র, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ সেন, পশ্চিমবাংলা বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজয়কুমার ব্যানার্জি, সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, গজেন্দ্রকুমার মিত্র কতজনের আর নাম বলব। তুই বইটা পড়লে আরও অনেকের নাম দেখতে পাবি।" একটা পাতলা বই এগিয়ে দিলেন আমার দিকে।

বললাম, "হ্যাঁ, বইয়ে অবশ্য এঁদের নাম দেখলাম।"

"আর কিছু প্রশ্ন করবি ?"

বললাম, "বলুন তো, আমার বাবা-মা দু'জনেই বেঁচে ?"

"তোর ভবিষ্যৎ জানতে না চেয়ে তুই শুধুই দেখছি আমাকে পরীক্ষা করছিস। ভালো, এমনি বাজিয়ে নেওয়াই ভালো। রামকৃষ্ণের অনেক ভক্ত থাকা সত্ত্বেও বিবেকানন্দ কিন্তু ভক্তদের বিশ্বাসে আস্থা না রেখে নিজে রামকৃষ্ণের খাঁটিত্ব পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। আর তাইতেই তো শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দই হয়ে উঠেছিলেন রামকৃষ্ণের এক নম্বর ভক্ত। কোন্ কোন্ বিখ্যাত লোকেরা আমার ভক্ত তা দেখে-শুনেই যে তোর মাথা গুলিয়ে যায়নি এটা খুব ভালো লক্ষণ। তুই যে খুব বড় হবি এটা তারই পূর্বাভাস।" গৌরাঙ্গ ভারতী প্যাডে আমার প্রশ্নের উত্তর লিখে কলম সরিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বাবা-মা দু'জনেই বেঁচে ?"

বললাম, "দু'জনেই মারা গেছেন !"

গৌরাঙ্গ ভারতী প্যাডটা ধরলেন আমার সামনে। আমি যা বলেছি তাই লেখা রয়েছে। এবার আবার আমার অবাক হবার পালা। কারণ উত্তরটা আমি এবার মিথ্যে করেই দিয়েছিলাম। বাস্তবে তখন আমার মা-বাবা দু'জনেই জীবিত। বুঝলাম আমি যা উত্তর দেব তাই প্যাডে লেখা দেখতে পাব। সেই রাতে বাড়ি ফিরেই আমি আমার ছেলে পিনাকী ও স্ত্রী সীমাকে বললাম, "তোমরা আমাকে এমন কিছু প্রশ্ন করো যার উত্তর তোমরা জান। আমি লিখিতভাবে সঠিক উত্তর বলে দেবো।" শেষ পর্যন্ত সঠিক উত্তর বলেও দিলাম। পরের দিন আমাদের বাড়ির কাজের বউটিকে, অফিসের কয়েকজন সহকর্মীকে, আকাশবাণীর ডঃ অমিত চক্রবর্তীকে এই একই ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে চমকে দিলাম। তারপর অবশ্য বিখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার হেডকোয়ার্টার সুবিমল দাশগুপ্তকেও এক সামান্য কৌশলেই অবাক করে দিয়েছিলাম। মনে আছে, সুবিমল বাবু ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেম্বারে বসেই বলেছিলেন, "বলুন তো আমরা ক'ভাইবোন ? আপনি যদি বলতে পারেন তো বুঝবো আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।"

ধীরেনদারই একটা প্যাডে উত্তর লিখছিলাম আর দেখছিলাম কী অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে

আমাকে লক্ষ্য করছিলেন এককালের কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের সর্বময়কর্তা ও বর্তমানের ডি· সি· হেড-কোয়ার্টার সুবিমলবাবু।

আমার লেখা শেষ হতেই কলমটা সরিয়ে রেখে বলেছিলাম, "উত্তর লেখা হয়ে গেছে। এবার আপনি বলুন তো, আপনারা ক'ভাইবোন ?"

"আমি কেন বলব ; আপনিই বলুন," সুবিমলবাবু বলেছিলেন।

"উত্তর তো লেখা হয়েই গেছে। আর পরিবর্তন করার কোনও সুযোগ নেই। এবার শুধু দেখার পালা, সঠিক উত্তর দিতে পেরেছি কিনা।"

সুবিমলবাবু আমার যুক্তি মেনে নিয়ে উত্তর দিলেন, "ছয়।"

প্যাডটা মেলে ধরলাম, তাতেও লেখা রয়েছে—ছয়।

সুবিমল দাশগুপ্ত অবাক চোখে তাকিয়ে থেকে অবাক কণ্ঠে বললেন, "আশ্চর্য তো ! আমরা ক'জন ভাইবোন তা আপনার পক্ষে জানা অসম্ভব। সত্যি, আজ অদ্ভুত এক অলৌকিক-ক্ষমতা দেখলাম !"

সুবিমলবাবুকে বললাম, "আপনি যেটাকে অলৌকিক বলে ভাবলেন সেটা আদৌ কিন্তু কোন অলৌকিক ঘটনা নয় ! এর পিছনে রয়েছে নেহাতই কৌশল।"

"অসম্ভব। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। আপনি প্রমাণ করতে পারবেন, এটা কৌশল ?" সুবিমলবাবু চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন আমাকে।

কৌশলটা আরো অনেকের মতোই সুবিমলবাবুকেও শিখিয়ে দিলাম। প্যাডে সম্ভাব্য প্রতিটি উত্তরই লিখে রাখি। তারপর প্রশ্নকর্তার কাছ থেকেই উত্তর শুনে নিয়ে কাগজটা কায়দা মতো ভাঁজ করে, এবং ডান বা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের সাহায্যে উত্তর ছাড়া বাকি লেখাগুলো ঢেকে দিই।' ফলে সকলে শুধু উত্তরটাই দেখেন।

গৌরাঙ্গ ভারতীর মতোই পাগলাবাবা বারাণসীর ভক্তদের মধ্যেও রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ও বিখ্যাত বহু ব্যক্তি।

আরো অনেক অলৌকিক ক্ষমতাধরও(?) নিশ্চয় আছেন, যাঁরা লিখে উত্তর দিয়েই কাত করে দিচ্ছেন বহু জ্ঞানী-গুণীজনকে। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই সুবিমল দাশগুপ্তের মতোই ঘটনার পিছনে নিজস্ব কোন যুক্তি খাড়া করতে না পেরে ধরে নেন, ঘটনাটা অলৌকিক।

সাধারণত আমরা যখন কোনো অলৌকিক(?) ঘটনা দেখি তখন সেই ঘটনার পিছনে কোনো যুক্তি নিজেরা খাড়া করতে না পারলেই ধরে নিই ঘটনাটা নিশ্চয়ই অলৌকিক। কখনই ভাবি না যে, এই ঘটনার পিছনে অবশ্যই আমার অজানা কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এর কারণ অহং বোধ। আমি কী আর ভুল দেখেছি !

কামদেবপুরের ফকিরবাবা ও আগরতলার ফুলবাবা

২৪ পরগণার কামদেবপুরের 'ফকির বাবা'র অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে এক সময় যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছিলাম, সেটা ছিল ১৯৫৫-র এপ্রিল। শুনলাম ফকিরবাবা বিভিন্ন লোকের সম্বন্ধে ভবিষদ্বাণী করেন অদ্ভুত উপায়ে। সেই সঙ্গে যে কোন রোগ থেকে মুক্তির জন্য ওষুধ দেন। ভবিষ্যদ্বাণী করার ব্যাপারটাতেই রয়েছে একটা অলৌকিকত্বের ছোঁয়া। ফকিরবাবা একটা বন্ধ ঘরে বসে থাকেন। যাঁর বিষয়ে বলেন, তিনি থাকেন পাশের ঘরে। ফকিরবাবা লোকটিকে না দেখেই অতীত ভবিষৎ সবকিছুই বলে দিতে পারেন। এই অলৌকিক ক্ষমতা তিনি নাকি পেয়েছেন তাঁর স্বপ্নে পাওয়া পরলোকগত গুরুদেব গোরাচাঁদ পীরের কাছ থেকে। গোরাচাঁদ

দেহ রেখেছেন ৭০০ বছর আগে। গোরাচাঁদ পীরের সমাধির উপর বসেই তিনি উত্তর দেন। ৬৫'র এপ্রিলের এক সকালে আমরা পাঁচ বন্ধু গিয়েছিলাম পীরকে দর্শন করতে। আমার দুই বন্ধু তখন চাকরি করে। এক বন্ধু চাটার্ড পড়ছে, এক বন্ধু তার বাবার কনস্ট্রাকশনের বিজনেস দেখছে, আমি বেকার, আয় বলতে শুধু টিউশনি।

"পীরের ঘরের আশেপাশে মেলার মতো ভিড়। দোকানপাট, লোকজন, হৈ-হৈ, রৈ-রৈ কাণ্ড। আমরাও পীরের দর্শনলাভের জন্য অর্থের বিনিময়ে নাম লেখালাম। তারপর দীর্ঘ সময় ধরে প্রতীক্ষা। দীর্ঘ সময়টা কাটালাম নানা দোকানে, গাছতলায় আর বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কথা বলে।

আমার ডাক পড়তে পীরের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম, "আমি কী শিগ্‌গির কোন চাকরি-বাকরি পাব, বাবা?"

উত্তর দিয়েছিলেন, "না, চাকরি তোর হবে না। কাঁচা আনাজের যে ব্যবসা এখন করছিস, তাই আর বেশ কিছু বছর করতে হবে।"

৬৫'র মে'তেই, অর্থাৎ ঠিক পরের মাসেই আমি ব্যাঙ্কে কাজ পাই ও কাজে যোগ দিই।

কাঁচা আনাজের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিরকালই ক্রেতা হিসেবে। তবে, পীরবাবার এই ধরনের ভুল করার কারণ, আমাদের পাঁচ বন্ধুর পোশাক, কথাবার্তা, আলোচনা সবই ছিল মুদির দোকান ও কাঁচা আনাজের ব্যবসায়ীর মতো। পীরের খবর সংগ্রহকারীরা তাই আমাদের সঙ্গে আলাপ করে আমাদের নামের সঙ্গে যে পরিচয় পীরসাহেবকে দিয়েছে, উনিও তাই বলেছেন। আমাদের পাঁচ বন্ধুর সম্বন্ধে প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন ভুল।

২৮ ফেব্রুয়ারি আগরতলায় 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' এর উপর একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল। সেখানে গিয়েই সবচেয়ে অলৌকিক ক্ষমতাবান বলে পরিচিত 'ভোলানন্দ পুরী' ওরফে ফুলবাবার সঙ্গে দেখা করি, বয়স ৫৬। তিনিও 'ফকির বাবার মত একই খেলা দেখান।

অবতারদের রোগ নিরাময় ও নিজ দেহে রোগ গ্রহণ

বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত সাধু-সন্ন্যাসী বা জীবন্ত ভগবানের সম্বন্ধে শুনেছি, তাঁরা অনেক দুরারোগ্য রোগ সারাতে পারেন। এমনকী যে সব ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি, এইসব সাধুজনেরা তাও আরোগ্য করতে সক্ষম। এই সব অবতারেরা যখন কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, তখন শোনা যায় ভক্তের কঠিন রোগ গ্রহণ করার জন্যেই নাকি, অবতারের এই অবস্থা।

গৌরাঙ্গ ভারতী একটা অদ্ভুত রোগে দীর্ঘ দিন ধরে অসুস্থ। হেঁচকি রোগ। যখন-তখন অনবরত হেঁচকি ওঠে। তিনি নিজেই আমাকে বলেছেন, অনেক বড়-বড় ডাক্তার দিয়ে নাকি চিকিৎসা করিয়েছেন। কিন্তু কোনো ফল পাননি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি তো ভক্তদের যে কোন রোগই সারিয়ে দেন বলে শুনেছি, তবে কেন নিজে ভুগছেন?"

"রামকৃষ্ণ কী নিজের অসুখ সারাতে পারতেন না? তিনি কেন সারালেন না, কারণ একটাই। মা যখন রোগ-ভোগ দিয়েছেন তখন নিশ্চযই ভোগ করব। অন্যের হয়ে মায়ের কাছে বলার জন্য ওকালতনামা নিয়েছি। নিজের কিছু চাওয়ার জন্য নয়," বলেছিলেন গৌরাঙ্গ ভারতী।

এই ধরনের সুন্দর পাশকাটানো জবাব যেমন অনেকে দেন তেমনি সাঁইবাবা বা অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের মত অনেকের সম্বন্ধেই ভক্তরা দাবী করেন—এঁদের অসুস্থতার কারণ ভক্তের রোগ গ্রহণ। সাঁইবাবার একবার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশন করা হয়। ভক্তরা অনেকেই বিশ্বাস করেন, এক ভক্তের রোগগ্রস্থ অ্যাপেণ্ডিক্সের সঙ্গে নিজের সুস্থ অ্যাপেণ্ডিক্সের অদল-বদল করে

অনুকূল ঠাকুর

নিয়ে ছিলেন সাঁইবাবা। হায় অন্ধ বিশ্বাস

তাঁরা ভেবে নিলেন অলৌকিক ক্ষমতায় বিনা অস্ত্রোপচারেই অ্যাপেণ্ডিক্স বদল হয়ে গেল। যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে এতো বড় একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে পারলেন, তিনি অ্যাপেণ্ডিক্সের সামান্য প্রদাহটুকু বন্ধ কবতে পারলেন না, এটাই আমাকে আরও বেশি আশ্চর্য করেছে। স্বভাবতই যে কোন যুক্তিবাদী এটাই কী সত্যি বলে ধরে নেবে না যে, গোটা বটনাটাই মিথ্যে ?

যিনি অন্যের রোগ সারাতে পারেন তিনি কেন নিজের রোগ সারাতে পারেন না ? ভক্তদের মনের এই প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসনের জন্যই বাবাজিদের এই সব রোগ গ্রহণের মতো গালগল্পের আশ্রয় নিতে হয়।

এর পরেও অবশ্য কেউ কেউ বলতে পারেন, অমুক সাধুর দেওয়া ওষুধে তাঁর অসুখ সেরেছে। আমি বলি, নিশ্চয়ই সারতে পারে। সাধু বলে কী তাঁর চিকিৎসা করার মত জ্ঞান

থাকতে নেই ? সাধুর দেওয়া ওষুধে এবং চিকিৎসকের ওষুধে অসুখ সেরে যাওয়া বা কিছুটা কমে যাওয়া একই ব্যাপার। এর মধ্যে অলৌকিকত্ব কই।

বিশ্বাসে অসুখ সারে

অনেক সময় ওষুধ ছাড়াই এই সব অবতারেরা অনেক রোগ কমিয়ে দেন বা নিরাময় করেন। যে সব ক্ষেত্রে ওষুধ ছাড়াই রোগ কমে বা নিরাময় হয়, সেই সব ক্ষেত্রেও রোগ কমার কারণ অলৌকিকত্ব নয়। কারণ হল, বিশ্বাস। এই অবসরে একটি ঘটনা বলি। আমার স্ত্রী ৮৫'র সেপ্টেম্বরে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে দমদমের 'শান্তি সদন' নার্সিংহোমে ভর্তি করি। সেই সময় শান্তি সদনের অন্যতম কর্ণধার অতীন রায়ের সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। তিনি অতি সম্প্রতি আসা এক রোগিণীর কেস হিস্ট্রি শোনালেন। মাঝে-মাঝেই রোগিণীর পেট ও তার আশেপাশে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। আশ্চর্য ব্যাপার হলো প্রতি বারই ব্যথাটা স্থান পরিবর্তন করে। এদিকে আর এক সমস্যা হলো, ব্যথার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রোগিণীকে একটা ক্যাপসুল দিয়ে বলা হলো, এটা খান, সেরে যাবেন। ক্যাপসুলটি খাওয়ার পর রোগিণীর ব্যথার কিছুটা উপশম হল। অথচ ক্যাপসুলটি স্রেফ ভিটামিনের। ঘণ্টা বারো পরে ব্যথা কিন্তু আবার ফিরে এলো। আবার ভিটামিন দেওয়া হলো। সাময়িক উপশম হলো। কিন্তু, এমনি করে কতবার চালান যায়। ডাক্তার শেষ পর্যন্ত রোগিণীকে বললেন, "আপনাকে একটা খুব স্ট্রং ইনজেক্‌শন দিচ্ছি। এটা বহু কষ্টে যোগাড় করেছি। এবার দেখবেন, এই ইনজেক্‌শন নেওয়ার পর আপনার ব্যথা একদম সেরে যাবে।"

ডাক্তার ইনজেক্‌শন দিলেন এবং রোগিণীর ব্যথাও পুরোপুরি সেরে গেল। ইন্‌জেকশনটা ছিল নেহাতই ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার।

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আমাদের বিশ্বাসবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। একান্ত বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে এযুগের বহু চিকিৎসকই অনেক রোগীকেই সারিয়ে তুলছেন। যে সব রোগের ক্ষেত্রে এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর, সেগুলো হল, শরীরের বিভিন্ন স্থানের ব্যথা, হাড়ে ব্যথা, বুকে বা মাথায় ব্যথা, বুক ধড়ফড়, পেটের আলসার, ব্লাডপ্রেসার, কাসি, ক্লান্তি ও অবসাদ ইত্যাদি রোগের ক্ষেত্রে ডাক্তার রোগীর বিশ্বাসবোধকে কাজে লাগিয়ে ঔষধিমূল্যহীন ক্যাপসুল, ইন্‌জেকশন বা ট্যাবলেট প্রয়োগ করে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল ফল পান। এই ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বলা হয় 'প্লাসিবো' (Placebo) চিকিৎসা পদ্ধতি। Placebo কথার অর্থ 'I will please'। বাংলায় অনুবাদ করলে বলতে পারি 'আমি খুশি করব'। ভাবানুবাদ করে বলতে পারি, 'আমি আরোগ্য করব'।

কয়েক বছর আগের ঘটনা, তখন আমি দমদম পার্কে থাকতাম। আমার এক প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথায় কথায় শুনলাম ওর ক্লাস ফোরে পড়া ছেলে এখনও বিছানায় পেচ্ছাপ করে। আমি ছেলেটির সঙ্গে কথা বললাম। "জানালাম, কাল সকালে বাজারে যাওয়ার সময় একটা দারুণ ভাল হোমিওপ্যাথ ওষুধ দিয়ে যাব। খেলে যে কোন বিছানায় পেচ্ছাপ করা রোগ একেবারে সেরে যায়। তোমায় আর লজ্জা পেতে হবে না। একেবারে ঠিক হয়ে যাবে।"

পরের দিন কয়েক পুরিয়া সুগার অফ মিল্ক দিয়ে এলাম বন্ধু-পুত্রের হাতে। পরের সপ্তাহে খবর পেলাম ছেলেটির রাতে বিছানা ভেজান রোগ সেরে গেছে। অথচ সুগার অফ মিল্কে কোনই ওষুধ ছিল না।

আমার এক সহকর্মী-বন্ধু এবং আমার এক পরিচিত প্রকাশক রাতে ঘুম আনতে প্রতি দিনই ঘুমের ওষুধ খায়। দু'জনকেই একবার ঘুমের জোরাল ওধুধ বলে ভিটামিন ক্যাপসুল খাইয়ে দেখেছি দু'জনেরই সেই রাতে খুব ভাল ঘুম হয়েছে।

অনেক পুরনো বা Chronic রোগের প্রকোপ বিভিন্ন সময় কমে-বাড়ে। আবার হাঁপানী, অম্বলের মত কিছু পুরনো রোগ কোনো ওষুধ ছাড়াই কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেরে যায়। সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে কৃপা প্রার্থনা করার পর যদি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মেই রোগের প্রকোপ কিছু কমে বা সেরে যায় তবে ওই সাধুবাবার অলৌকিক মাহাত্ম্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধুবাবা ১০০টি রোগীর মধ্যে ১টি সারাতে পারলেও ওই সাফল্যের কথাই শুধু প্রচারিত হয়। বিফলতার হিসেব অন্ধ-ভক্তেরা কোন দিনই তুলে ধরেন না।

সাধু-সন্ন্যাসীদের বা অবতারদের বেশির ভাগই জেনেশুনে মানুষ ঠকিয়ে নিজেদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বাড়াতে চাইলেও এই সব অবতারদের সকলকেই ঠগ ও ধান্দাবাজ বলতে পারি না। এঁদের অনেকেই ঈশ্বর সম্বন্ধে জন্মগত নানা ধরনের ভ্রান্তধারণার শিকার হন। ঈশ্বরে অন্ধ বিশ্বাস ও সব সময় ঈশ্বর দর্শনলাভের আকূতির ফলে এবং দড়িকে সাপ ভাবার মতই অনেক কিছুতেই ঈশ্বর দেখেন।

সরল বিশ্বাসে এঁরা তখন নিজেদের ঈশ্বরের দূত বা অবতার বলে ভাবতে শুরু করেন। ভক্তদের সেই সব উপদেশই দেন বা সেই সব কাজই করান, নিজের ধারণায় মানুষের পক্ষে যা শুভ। তাই এঁদের অনেককে আমরা যুগে যুগে দেখেছি সমাজসংস্কারক হিসেবেও।

আমি এই রকম এক তান্ত্রিককে জানি (সম্প্রতি দেহ রেখেছেন) যিনি 'সিদ্ধপুরুষ' বা 'অলৌকিক ক্ষমতাবান' না হলেও একজন মহৎপ্রাণ। তাঁর বহু শিষ্য-শিষ্যাদের দিয়ে নানা রকমের জনসেবামূলক কাজ করিয়েছেন। নির্ভেজাল উপদেশে মানুষকে দিয়ে কাজ করানো অসম্ভব বলে তিনি কিছু লৌকিক খেলাকেই অলৌকিক বলে দেখাতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এগুলো নেহাতই ফাঁকির খেলা বলে জানিয়ে দিলে তাঁর ভাল কাজগুলোকেও ভক্তরা ফাঁকি বা ধান্দাবাজি বলে ধরে নেবে। তাই তিনি এই ছলনাটুকুর আশ্রয় নিতেন এবং ভক্তদের নিয়োজিত করতেন মানুষের সেবায়।

আবার এই যুগেই বেশ কিছু অবতারদের দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা নানা রকম সেবামূলক কর্মসূচীর মুখোশ এঁটে চূড়ান্তভাবে মানুষ ঠকিয়ে অর্থ রোজগারের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্ম-ব্যবসায়ে আজ তাঁরা একদিকে যেমন বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছেন, তেমনি ভক্ত রাজনৈতিক নেতাদের ও উঁচু সমাজের লোকদের কাজে লাগিয়ে হয়ে উঠেছেন সংবিধান বহির্ভূত ক্ষমতার অধিকারী।

যোগের দ্বারা বৃষ্টি আনলেন শিববাল যোগী

৮৫'র মে-জুনে আর-এক ভারতীয় যোগী পত্র-পত্রিকায় যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছেন। শিববাল যোগী। শিববাল যোগীর দাবী, তিনি যোগের দ্বারা প্রকৃতিকে (বৃষ্টিপাত, বন্যা, ভূমিকম্প ইত্যাদি ঘটনা) নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তারই সবচেয়ে বড় প্রমাণ তিনি রাখলেন ৩০
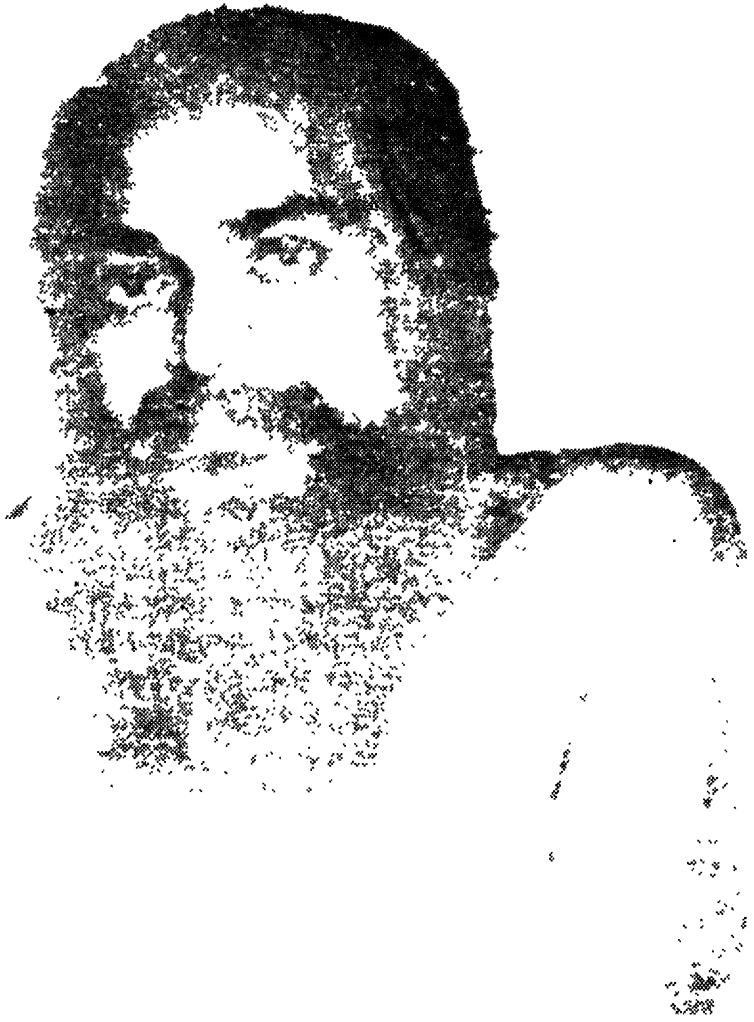
শিববাল যোগী

মে বাঙ্গালোরে (?)। যোগের দ্বারা বৃষ্টি নামালেন। ঘটনাটার দিকে এবার একটু ফিরে তাকানো যাক।

বাঙ্গালোর শহরে জল সরবরাহ করা হয় শহরের কাছাকাছি থিপাগাণ্ডানাহালি জলাশয় থেকে। বৃষ্টিপাতের অভাবে জলাশয়ের জল খুবই কমে গিয়েছিল। বাঙ্গালোর ওয়াটার সাপ্লাই অ্যাণ্ড সিউয়্যারজ বোর্ড (Bangalore Water Supply and Sewerage Board) কর্তৃপক্ষের মতে বৃষ্টি না হলে সঞ্চিত জলে আর মাত্র ১৫ দিনের মত জল সরবরাহ সম্ভব। শেষ পর্যন্ত মুশকিল আসানের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ শিববাল যোগীকে অলৌকিক ক্ষমতাবলে বৃষ্টি আনার জন্য লিখিতভবে আমন্ত্রণ জানান।

২৮ মে বাঙ্গালোরের এক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রথম খবরটি প্রকাশিত হয়। অতএব ৩০মে জলাশয়ের কাছে অনুষ্ঠিত শিববাল যোগীর বৃষ্টি আনার ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উৎসুক দর্শকের ও ভক্তদের অভাব হয়নি। অনুষ্ঠানে শিববাল যোগী এলেন শুভ্র ধুতি পরে বিদেশী গাড়িতে সওয়ার হয়ে। যোগী ধ্যানে বসলেন, সঙ্গে-সঙ্গে শুরু হল ভক্ত শিষ্যদের ভজন গান ও নাচ। কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্ত শিষ্য জ্বলন্ত কর্পূর জিভে ফেলে গিলে ফেললেন। বিশিষ্ট ভক্তদের এই অলৌকিক কাজকর্ম দেখে দর্শকরা তুমুল জয়ধ্বনি দিলেন। ঘণ্টা তিনেক ধ্যানের পর দুপুর ২ টা ৪০ মিনিটে যোগীর ধ্যান ভাঙল। এরপর যোগী ভক্তদের প্রণাম নিলেন, বিনিময়ে দিলেন বিভূতি। যে-সব বিশিষ্ট ভক্তেরা পরম বিশ্বাসে ভক্তিভরে যোগীর পদধূলি নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্ধ্রের প্রাক্তন মন্ত্রী ও লোকসভার সদস্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীকানথাম্মা, আকাশবাণীর স্টেশন ডিরেক্টর প্রমুখ অনেকেই।

শিববাল যোগী ঘোষণা করেছিলেন, 'এক মাসের মধ্যে জলাশয়টি ভর্তি হয়ে যাবে।' খবরে আরও প্রকাশ, সে-দিনই বৃষ্টি হয়েছিল। বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৫ মিলিমিটার।

পরবর্তীকালে অনেক পত্র-পত্রিকাতেই সংবাদটি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে।

এবার একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমি সেই সঙ্গে আরও কয়েকটা খবর আপনাদের পরিবেশন করছি।

২৮ মে বাঙ্গালোরের যে দৈনিক সংবাদপত্রটিতে শিববাল যোগী দু'দিন অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা বৃষ্টি নামাবেন বলে খবর সরবরাহ করেছিল, সেই পত্রিকাটির 'আবহাওয়া বার্তায়' বলা হয়েছিল, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কয়েক দিনের মধ্যেই কর্ণাটকে এসে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আবহাওয়া বার্তাতেই আরও বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কোচিনে বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। দীর্ঘ তাপদাহের পর ২৭ তারিখে বাঙ্গালোরে কিছু বৃষ্টি হয়েছে, যদিও এই বৃষ্টি ঠিক বর্ষার আগমন বার্তা নয়। অর্থাৎ এই বৃষ্টি মৌসুমী বায়ুর ফলে হয়নি

বাঙ্গালোর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে যে-সময়ে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাত অবশ্যম্ভাবী, সেই সময়টিতে বৃষ্টি নামাকে কী করে শিববাল যোগীর অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া সম্ভব?

জিভে জ্বলন্ত কর্পূর সামান্য সময়ের জন্য রাখা কোনো অলৌকিক কাজ নয়। আমি নিজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জিভে জ্বলন্ত কর্পূর রেখে দেখিয়েছি। কর্পূরের আগুনের শিখা দাউ দাউ করে জ্বলে বলে সাধারণ মানুষের চোখে ঘটনাটা রহস্যময় ও অলৌকিক বলে মনে হয়। কর্পূর একটি Volatile বা উদ্বায়ী বস্তু। অতিমাত্রায় জ্বলনশীল। ফলে অতি দ্রুত জ্বলে শেষ হয়ে যায়, আগুনের তাপ জিভে ততটা অনুভূত হয় না। জিভ ভাল করে লালা দিয়ে ভিজিয়ে নিলে কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্বলন্ত কর্পূরের তাপ আদৌ অসহ্য নয়। এই খেলা দেখাতে যে বিষয়ে খুবই সচেতন থাকা প্রয়োজন তা হল, কর্পূরের আগুন যেন গলায় না প্রবেশ করে। প্রবেশ করলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। খেলাটা কঠিন হতে পারে, কিন্তু অসম্ভব বা অলৌকিক নয়।

চন্দননগরে সাধুর মৃতকে প্রাণ-দান

১৯৫৩'র ২৫ মে যুগান্তর দৈনিক পত্রিকায় এক সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতাবলে মৃতকে বাঁচানোর বিবরণ প্রকাশিত হল। বিবরণে বলা হয়েছিল, চন্দননগরে রাস্তার ধারের একটা বেলগাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এক সন্ন্যাসী। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক পুরুষের মৃতদেহ

সঙ্গে চলেছিলেন মৃতের স্ত্রী। বেলগাছের কাছে এসে রমণীটি ধনুক থেকে বেরিয়ে আসা তীরের মতোই আছড়ে পড়েন সন্ন্যাসীর পায়ে. সন্ন্যাসীকে রমণী অনুরোধ করেন, "আমার স্বামীকে বাঁচান। ওঁর জ্ঞাতি শত্রুরা ওঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে। ওঁকে না হলে আমি বাঁচব না।" কান্নায় ভেঙে পড়েন রমণী।

সন্ন্যাসী বলেন, "বাঁচানোর আমি কে ? ঈশ্বরের কৃপা থাকলে আর তোমার সতীত্বের জোর থাকলে বাঁচবে। আমার দেওয়া এই বিভূতি শরীরে ও মুখে ছড়িয়ে দাও।"

পরম বিশ্বাসে সাধুর আদেশ পালন করাতে মৃত উঠে দাঁড়ায়।

বিবরণের মোটামুটি এই মোদ্দা কথা শুনে আমি স্বভাবতই সন্ন্যাসীর দর্শনলাভের তীব্র বাসনায় চন্দননগরের স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথা বলে এই সন্ন্যাসীর বিষয়ে জানতে চাই। যতদূর সম্ভব অনুসন্ধান চালিয়েও এই ধরনের কোনও সন্ন্যাসী বা প্রাণ ফিরে পাওয়া মৃত ও তার পরিবারের কারও সন্ধান পাইনি। এমন একটা চমকপ্রদ অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র একজন সাংবাদিক ছাড়া স্থানীয় কেউই জানতে পারলেন না, এটাই আমার কাছে আরও বেশি চমকপ্রদ ঘটনা বলে মনে হয়েছে। পত্রিকায় এই সংবাদ পরিবেশনে আরও কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি। ঘটনাটি ঘটার তারিখের কোনো উল্লেখ ছিল না। ছিল না মৃতের নাম ঠিকানা। বিংশ শতাব্দীর এমন একটা বিস্ময়কর ঘটনাকে এমন ত্রুটিপূর্ণভাবে, হেলাফেলার সঙ্গে পরিবেশন করা হল কেন ? কেন খবরের সঙ্গে নবজীবন পাওয়া লোকটির, তাঁর স্ত্রীর ও সন্ন্যাসীর ছবি এবং ঘটনায় সংশ্লিষ্ট যত জনের সম্ভব ইণ্টারভিউ ছাপা হল না ? মৃতের জীবনদানের ঘটনা কী এই শতাব্দীর অন্যতম সেরা খবর নয় ? একমাত্র পত্রিকা হিসেবে এমন 'স্কুপ নিউজ' পেয়েও যুগান্তরের এমন গা ছাড়া ভাবই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক করে। আমি এই বিষয়ে আরও বিশদভাবে আলোকপাতের জন্য যুগান্তর চিঠিপত্র বিভাগে একটি চিঠি দিই। এই চিঠি লেখার পিছনে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, ঘটনার সত্যতা যাচাই করার সুযোগ লাভ। আমার সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

ছাপার অক্ষরকে সাধারণ মানুষ বড় বেশি গুরুত্ব দেয়, বিশ্বাস করে, বিশেষ করে সেটা যদি আবার সংবাদপত্র হয়। তাই সংবাদ পত্রগুলোরও এই বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত সবচেয়ে বেশি। মিথ্যে সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকেই আরও বেশি উস্‌কে দেওয়া অবশ্যই একটি জঘন্য অপরাধ।

আগুনে হাঁটার অলৌকিক ঘটনা

খুদাবক্স এমনই এক ভারতীয় ফকির যিনি বিলেতের মাটিতে এক অলৌকিক ঘটনায় সেখানে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩৫ সালের ৯ ও ১৭ সেপ্টেম্বর লণ্ডনে। ৮ টন কাঠ ও ১০ গ্যালন প্যারাফিন দিয়ে আগুন জ্বালান হয়। পায়ে ফোস্কা না ফেলে সেই জ্বলন্ত কাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেন খুদাবক্স। ইংরেজরা স্তম্ভিত হল ভারতীয় ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে। পূর্ব ঘোষিত এই আগুনে-হাঁটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজ্ঞানীরা খোদাবক্সের পা

পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে, পায়ে কোনো কিছুর প্রলেপ লাগানো নেই। পা ছিল শুকনো। পায়ের চেটোর তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক। হাঁটা শেষ করার ১০ সেকেণ্ড পরও তাঁর চেটোর তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক। খুদাবক্সের পায়ের একটা নখে ১/২ বর্গ ইঞ্চি মাপের একটা লিউকোপ্লাস্টার লাগানো ছিল। আগুনে হাঁটার পর সেটাও ছিল প্রায় অক্ষত। ১২ ফুট লম্বা ৬ ফুট চওড়া এবং ৮ ইঞ্চি গভীর অগ্নিকুণ্ডটা পার হতে খুদাবক্সের সময় লেগেছিল মোট ৫ সেকেণ্ড। চারটি মাত্র পদক্ষেপে তিনি অগ্নিকুণ্ড পার হয়েছিলেন। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বার করলেন, প্রতি পদক্ষেপে আগুনের সঙ্গে পায়ের সংযোগ হয়েছিল মাত্র ১ সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ সময়ের জন্য। ফলে পা কোন সময়ই ভালমতো জ্বলন্ত আগুনের স্পর্শে আসতে পারেনি। আর, তাইতেই পায়ের আঙুলের প্লাস্টার ছিল প্রায় অক্ষত।

আমাদের মা-ঠাকুমাদের অনেককেই দেখেছি জ্বলন্ত উনুন থেকে কোনো জ্বলন্ত কাঁচা-কয়লা'-কে চট করে দু' আঙুলে ধরে উনুন থেকে নামাতে। এত দ্রুত তাঁরা কাজটা করেন যে কয়লার তাপ ওই সামান্য সময়ের মধ্যে ভালমতো হাতের সংস্পর্শে আসতে পারে না। গ্রামেও অনেককে দেখেছি, খালি হাতে জ্বলন্ত কাঠকয়লা তুলে হুঁকোর কলকেতে বসিয়ে কলকের তামাকে আগুন ধরায়। ওরা হাতের তেলোয় জ্বলন্ত কাঠকয়লা বেশিক্ষণ রাখে না বলে ফোস্‌কা পড়ে না।

বিহারের রাঁচি জেলায় গ্রীষ্মকালে আদিবাসীদের এক উৎসব পালিত হয়। নাম, মণ্ডাপরব। এই উপলক্ষে আগুনে হাঁটা অনুষ্ঠিত হয়। ওরা এই আগুনে হাঁটাকে বলে 'ফুলকুদ্‌না', অর্থাৎ ফুলের উপর লাফানো। আট-দশ হাত লম্বা দু'হাত চওড়া ও আধ হাত গভীর কাঠকয়লার আগুন জ্বালানো হয়। পুরোহিত ওই অগ্নিকুণ্ডে মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে দেন। আদিবাসীদের বিশ্বাস এই মন্ত্রপাঠের সঙ্গে-সঙ্গে দেবী পার্বতী আগুনের উপর ফুলের মতো সুন্দর আঁচল বিছিয়ে দেন। এইবার কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখে ওই আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে পায়ে ফোস্‌কা পড়বে না। আদিবাসী ভক্তেরা পুকুরে স্নান করে ভিজে শরীরে নেচে-নেচে আগুনের উপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে গোটা তিনেক পদক্ষেপে হেঁটে যায়। আশ্চর্যের বিষয় (?) তাদের পায়ে ফোস্‌কা পড়ে না। এই অলৌকিক ঘটনা দেখতে বিশাল ভিড় হয়। আদিবাসীরা বিশ্বাস করে এই অলৌকিক ঘটনার পিছনে রয়েছে পুরোহিতের অলৌকিক ক্ষমতা ও ভক্তদের ঈশ্বর-বিশ্বাস।

বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ প্রয়াত শ্রীনির্মলকুমার বসু কয়েকজন সহযোগী নিয়ে ঘটনাটা দেখতে হাজির হন। শ্রীবসু লক্ষ্য করেন অগ্নিকুণ্ড পার হতে ভক্তদের মোট সময় লাগছে ৮ সেকেণ্ডের মতো। পা'দুটি এক সেকেণ্ডেরও অনেক কম সময়ের জন্য আগুনের স্পর্শ পাচ্ছে। না করাও পায়েই ফোস্‌কা পড়ছে না।

শ্রীবসুর এক সহযোগী দ্রুত আগুনের উপর দিয়ে হাঁটার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, পারেননি। পায়ে ফোস্‌কা পড়েছিল। শ্রীবসুর আর এক সহযোগী ভক্তদের মতো স্নান করে ভেজা শরীরে ভেজা পায়ে জ্বলন্ত আগুনের উপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে যান। তাঁর পায়ে কোনো রকম ফোস্‌কা পড়েনি। তার দুটি কারণ হল (১) ভেজা পায়ে কিছু নরম মাটির প্রলেপ পড়েছিল। (২) দ্রুত পদক্ষেপের দরুণ মুহূর্তের জন্য পা আগুনের স্পর্শ পেয়েছিল।

'দি নেশন' পত্রিকার ১৯৫২ সালের ১৬ এপ্রিলের প্রকাশিত একটি সংবাদে দেখা যায়, শ্রীলঙ্কার থার্সটান কলেজে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে সিংহল র‍্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশানের সদস্য ডঃ কার্লো ফোনসেকো তথাকথিত অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়াই পায়ে ফোস্‌কা না ফেলে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যান।

'৮৫-তে দিল্লির প্রেস ক্লাবে আগুনে হেঁটে দেখাচ্ছেন জনৈক যুক্তিবাদী

উজ্জয়িনী জেলার তাজপুর গ্রামেও প্রতি বছর অলৌকিক আগুনে-হাঁটা অনুষ্ঠিত হয়। তাজপুরের এই আগুনে হাঁটা ধর্মানুষ্ঠানে যারা হাঁটে তারা নাকি ভৈরবের উপাসক। হাঁটতে গিয়ে কারও পা পুড়লে ধরে নেওয়া হয়, অপবিত্র মনের দরুণই এমনটা হয়েছে।

বুলগেরিয়ার এক সমুদ্র-বন্দর বার্গাস (Burgus)। বার্গাসের ৩০ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রাম পানিতচারো (Panitcharewo)। এই গ্রামের নেস্টিনারি (Nestinari) নামে একটি সম্প্রদায় প্রতি বছর ৩ জুন বাইজানটাইন সম্রাট কনস্টানটাইন ও সাম্রাজ্ঞী হেলেনাকে স্মরণ করে এক আগুনে-হাঁটা উৎসব পালন করে। জনসমাগমও হয় প্রচুর।

জাপান, মালয়, ফিজি, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যাণ্ড ও স্পেনেও আগুনে-হাঁটা বা অগ্নি-উৎসবের প্রচলন রয়েছে।

আগুনে-হাঁটা একটি কঠিন কৌশল মাত্র। এই কৌশলের জন্য প্রয়োজন ক্ষিপ্রতা ও তাপ-সহন শক্তি। Pavlov theory-তে বিশ্বাসী

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন অন্ধ-ভক্তি ও বিশ্বাস ভক্তদের মস্তিষ্কের সেই সব স্নায়ুকে নিষ্ক্রিয় রাখে যা পায়ের তাপের খবর পৌঁছে দেয়।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অবশ্য তাপনিরোধক হিসেবে ঘৃতকুমারী পাতার রসের উল্লেখ আছে। এই রস হাতে মেখে জ্বলন্ত কয়লা ধরলেও পোড়ে না।

ফটকিরির (alum) ঘন দ্রবণে কিছুক্ষণ পা ডুবিয়ে রেখে তারপর দ্রবণটা পায়ে শুকিয়ে নিয়ে বা হাল্কাভাবে কাপড় দিয়ে মুছে নিয়ে আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তাপের পরিমাণ কম অনুভূত হয়।

গত শতকের প্রথমে ইতালির নেপল্‌স্ শহরে লায়োনেট্টি (Lionctti) নামে এক অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন (?) ব্যক্তি অদ্ভুত কয়েকটা আগুনের খেলা দেখিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছিলেন। লায়োনেট্টি একটা তপ্ত-লাল লোহার শিক নিয়ে তাঁর পায়ের তলায় ও উরুতে বোলাতেন। উত্তাপে তরল সীসায় আঙুল ডুবিয়ে কয়েকটা ফোঁটা গরম তুলে জিভে ফেলতেন অথচ আশ্চর্য এই উত্তাপ তাঁর শরীরে কোনোই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত না।

প্রখ্যাত রসায়নবিদ সেমেন্টিনি (Semintini : 1777—1847) ছিলেন নেপল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি লায়োনেট্টির অলৌকিক লীলাখেলাগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করেন। তিনি এও লক্ষ্য করেন যে, যখনই লায়োনেট্টি তার পায়ে বা হাতে গরম লোহার শিক বোলাচ্ছে, তখনই সামান্য কিছু ধোঁয়া উঠছে। গরম সীসা জিভে ফেলার সময় তিনি লক্ষ্য করেন জিভের রঙ স্বাভাবিক নয়, কিছুর প্রলেপ সম্ভবত লাগানো রয়েছে।

তিনি বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ফটকিরির কার্যকারিতা আবিষ্কার করেন। হাতে ও জিভে ফটকিরির দ্রবণের সঙ্গে তিনি চিনির গুঁড়োও লাগালেন। এরপর তিনি হাতে-পায়ে গরম লোহা বোলালেন। তরল সীসা আঙুলে তুলে ফোঁটা-ফোঁটা জিভে ফেলেও দেখালেন, আর এটি দেখালেন নেপল্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়েরই বক্তৃতাকক্ষে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে। তিনি প্রমাণ করে দিলেন এই সব ঘটনার পিছনে কোনো অলৌকিক ক্ষমতা কাজ করছে না। কাজ করছে বিজ্ঞানের নিয়ম।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রিচার্ডসন নামে এক ইংরেজ অলৌকিক ক্ষমতাবানের কিছু কাজকর্মের হদিস পাওয়া যায়। তিনি নাকি জ্বলন্ত কয়লা জিভে রেখে কাঁচা মাংস ভাজতেন। একটি কৌশল করলে এই ধরনের মাংস ভাজা অসম্ভব নয়। লম্বা ফালির এক টুকরো মাংস দিয়ে জ্বলন্ত কয়লাটিকে মুড়ে দেওয়া হলে মাংসটা ভাজা-ভাজা হলেও জিভ ভাজাভাজা হবে না। জিভের লালার সাহায্যে ভাজা মাংসের গরমকে সহনীয় করে নেওয়া হবে। হ্যাঁ, কোনো অলৌকিক শক্তি ছাড়াই এই খেলাগুলো দেখানো সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে ডঃ কোভুরের একটা চ্যালেঞ্জের ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। তার আগে বোধহয় কোভুর সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী পুরুষ ডঃ আব্রাহাম থোম্মা কোভুরের জন্ম ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ এপ্রিল কেরালার তিরুভিল্লায়। ছিলেন গোঁড়া খ্রীস্টান পরিবারের সন্তান। পরিণত বয়সে তিনি খ্রীস্টান ধর্ম ত্যাগ করে একজন যুক্তিবাদী হয়ে ওঠেন। বাইবেলকে সর্বদর্শী ঈশ্বরের বাণী বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

কোভুরের স্কুল জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনার উল্লেখ করছি। যীশুখ্রীস্টের উপর ধর্মের ক্লাস হচ্ছিল। শিক্ষক বলছিলেন যীশুর এক অলৌকিক ক্ষমতার গল্প—যাচিয়াস নামে এক যীশুভক্ত

যীশুর দর্শন লাভের জন্য এক ডুমুর গাছে বসে ছিল। গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় যীশু থমকে দাঁড়ালেন এবং যাচিয়াসকে নামতে বললেন। যাচিয়াস নেমে এসে প্রণাম করতে তাকে আশীর্বাদ করলেন যীশু।

গল্পটা এতদূর বলে শিক্ষক এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলো তো, যীশু কী করে জানতে পারলেন যাচিয়াস গাছের উপরে ছিল?"

ছাত্রটি কোভুরের কাছ থেকে উত্তর জেনে জানালো, "যাচিয়াস যীশুর মাথায় একটা ডুমুর ছুঁড়ে মেরেছিলেন, তাই।"

যীশুর অলৌকিক ক্ষমতাকে এমনভাবে লৌকিক পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসায় শিক্ষক সেদিন ছাত্রটিকে ও কোভুরকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

একবার অসুস্থ কোভুরকে দিদি ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, যীশুর নাম নিয়ে ওষুধটা খেয়ে নিতে। কোভুর উত্তর দিয়েছিলেন, "যীশু আর ওষুধ একসঙ্গে দু'জনেরই সাহায্য নিলে বোঝা যাবে না, কার জন্যে ভালো হলাম। তার চেয়ে, আগে ওষুধ খাওয়া যাক। তাতে কাজ না হলে যীশুর নাম নিয়ে দেখা যাবে।"

কোভুরের উচ্চশিক্ষা কোলকাতায়, কেরালার কলেজে অধ্যাপনা গ্রহণ করে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীলঙ্কার জাফনা সেন্ট্রাল কলেজের অধ্যক্ষের আমন্ত্রণে অধ্যাপক হিসেবে কাজে যোগ দেন। কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের গবেষণামূলক কাজের জন্যে আমেরিকায় মিনোসাটো ইনষ্টিটিউট অফ ফিলসফি তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করে।

শ্রীলঙ্কায় কোভুর তাঁর বাড়ির ভিতের কাজ শুরু করেছিলেন পাঁজির সবচেয়ে অশুভ সময়ে। পরিণতিতে খারাপ কিছুই ঘটেনি। ডঃ কোভুর প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ রেখেছিলেন, কেউ অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ দিলে ১·০০·০০০ শ্রীলঙ্কার টাকা পুরস্কার দেবেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে ১০০০ টাকা জমা দিতে হবে। হেরে গেলে ওই ১০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে এই চ্যালেঞ্জ বিজ্ঞপিত হয়। যাঁরা এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই পরাজিত হয়েছিলেন।

১৯৫৮-এর ১৮ সেপ্টেম্বর ৮০ বছর বয়সে ডঃ কোভুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৫৬-এ তাঁর প্রথম বই Begone Godmen? Encounter with Spiritual Frauds প্রকাশিত হয়ে সারা বিশ্বে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। ডঃ কোভুরের মৃত্যুর দু'বছর পর ১৯৮০ তে তাঁর লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় Gods. Demons & Spirits।

আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের আগুনে-হাঁটা প্রসঙ্গে।

ডঃ কোভুর, এক ঘোষণায় জানিয়েছিলেন কেউ ৩০ সেকেণ্ড জ্বলন্ত কয়লার উপর ফোসকা না ফেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে তাকে ১ লক্ষ শ্রীলঙ্কার টাকা পুরস্কার দেবেন। ডঃ কোভুরের এই ঘোষণার উত্তরে ১৯৫১ সালে শ্রীএম মোহান্তি ও শ্রীলাওনেল গ্যামেজ খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে জানালেন যে, তাঁরা পায়ে ফোসকা না ফেলে আগুনের উপর ৩০ সেকেণ্ডে দাঁড়াতে পারবেন।

ডঃ কোভুর তাঁদের জানালেন, চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হলে তাঁদের এক হাজার টাকা করে জামানত হিসেবে জমা দিতে হবে। উত্তরে তাঁরা জানালেন, এত টাকা তাঁদের নেই। ডঃ কোভুর তখন বিনা জামানতেই তাঁদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। কিন্তু, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরা কেউই শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হননি। হাজির না হওয়ার একমাত্র কারণ,

বাস্তবে এমনটি দেখানো কখনই সম্ভব নয়। মোহান্তি বা গ্যামেজের ধারণা ছিল জোরালো ভাবে পাল্টা চ্যালেঞ্জ করলে লক্ষ টাকা হারাবার ভয়ে ডঃ কোভুর পিছিয়ে যাবেন।

পরিবর্তন সাপ্তাহিক পত্রিকার ১৫ অক্টোবর ১৯৮৫ সংখ্যায় ভারতীয় যুক্তিবাদীদের পক্ষ থেকে দিল্লির প্রেস ক্লাবে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের ছবিসহ খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় দেশী ও বিদেশী সাংবাদিকদের সামনে জ্বলন্ত কাঠকয়লার আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে দেখান দুই যুবক, নিপটতানম ও সাজি। নয়াদিল্লীর সংবাদদাতা সুজিত রায়ের ভাষায়, "নির্ভয়ে নিরাপদে বারবার· তিনবার পা ডুবিয়ে হেঁটে গেলেন রক্তের মত লাল জ্বলন্ত কাঠের স্তূপের ওপর দিয়ে। তারপর আবার। এবারে ফটোগ্রাফারদের অনুরোধে। চিৎকার করে উঠলেন, 'নো গড'।

আরো কিছু অলৌকিক ক্ষমতা

কিছু-কিছু অবতার বা সাধুদের সম্বন্ধে কিছু কিছু অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনেছি, কিন্তু চাক্ষুষ দেখার সুযোগ আমার হয়নি। অলৌকিক সেই ক্ষমতাগুলোও তাদের লৌকিক কারণগুলো নিয়ে বরং একটু আলোচনা করা যাক।

(১) (ক) অন্ধের চোখে বাবাজির হাত বুলোনোর ফলে অন্ধ চোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল।

(খ) বাবাজি শূন্য থেকে ছাই সৃষ্টি করে অন্ধের চোখে ঘষে দেওয়ার পর অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়। (নীলকান্তবাবা এই ধরনের দাবি করেন)।

(গ) বাবাজি এক অন্ধকে অন্ধ না বুঝতে পেরে কোন কিছু দেখিয়ে বললেন, "কেমন দেখলি বল ?" অন্ধ সাময়িকভাবে দৃষ্টি ফিরে পায় ও দেখতে পায়। পাগলাবাবা (বারাণসী) এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে দাবী করেন।

শুধু হাত বুলিয়ে, সৃষ্টি করা ছাই ঘষে বা শুধু বাকসিদ্ধ কথার জোরে কেউ যদি দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি ফেরাতে পারেন, তবে তিনি মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছেন না কেন ? কেন তিনি বিশ্ব থেকে অন্ধত্ব দূর করার মহান ব্রতে নিজেকে ব্রতী করছেন না ? কারণ একটিই, বাস্তবে এইভাবে অন্ধত্বের কারণকে দূর করা কখনই সম্ভব নয়। ঘটনাগুলি হয় মিথ্যে প্রচার নতুবা সাজান। অর্থাৎ, সাজান অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার অভিনয় করেছে মাত্র।

(২) কোনও কোনও সাধু বা অবতার দুঃখ পেলে দেখা যায় তাঁর ঘরের দেবতার মূর্তির চোখ দিয়েও জল পড়ে।

দেব-মূর্তি বা দেবতার ছবির মত জড় পদার্থ থেকে জল বেরোন অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা। এমন ঘটনা ঘটার সময় মূর্তি বা ছবিটিকে পরীক্ষা করলেই আসল রহস্য প্রকাশ পাবে।

(৩) অবতারবাবা মোটরে যাচ্ছিলেন। পথে পেট্রল ফুরিয়ে গেল। রাস্তা নির্জন। কাছের পেট্রল পাম্পও বহু কিলোমিটার দূরে। বাবার অলৌকিক কৃপায় পেট্রল ছাড়াই গাড়ি চলল।

এমন অবাস্তব ঘটনা প্রমাণ ছাড়া এক অন্ধ ভক্তের কথায় বিশ্বাস করা যায় না। বাস্তব ক্ষেত্রে বিনা শক্তি বা তেলে শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা মোটর ইঞ্জিন চালান অসম্ভব। এই ধরনের কোনও ঘটনা কেউ ঘটিয়ে দেখালে আমি নিশ্চয়ই স্বীকার করে নেব অলৌকিক বলে অবশ্যই কিছু আছে, এবং আমার সঞ্চিত অর্থ সহ আমি নিজেকেও তাঁরই সেবায় নিয়োগ করব।

পেট্রল ও ডিজেল আকালের দিনে এই ধরনের ক্ষমতাকে তাঁরা দেশের কাজে লাগান এটিই আমার একান্ত অনুরোধ।

অবতাররা তাঁদের প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের। তিনি যদি বিজ্ঞান জগতের কেউ হন, তবে তো কথাই নেই। কোনও কৌশলের সাহায্যে এই শ্রেণীর লোকদের কাছ থেকে নিজের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে সার্টিফিকেট আদায় করতে পারলেই কেল্লা ফতে। বিখ্যাত ভক্তদের দেখিয়ে সাধারণ লোকদের আকৃষ্ট করা অতি সহজ।

বিজ্ঞান নিয়ে পড়লেই,বা বৈজ্ঞানিক হলেই মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক বা যুক্তিবাদী হন না। ব্যক্তিগতভাবে এমন অনেককে চিনি যাঁরা একই সঙ্গে বিজ্ঞানের সেবা করে চলেছেন এবং অলৌকিকত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

এঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যেই অলৌকিকবাবারা স্রেফ বুজরুকিকে মূলধন করেও সমাজের বুকে ক্যান্সারের মত জাঁকিয়ে বসেছে।

এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, এমন কতকগুলো প্রাকৃতিক বিষয় আছে যার কারণ আমরা কোন দিনই জানতে পারব না। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন, আজ যে প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর কারণ জানি না, একদিন নিশ্চয়ই তার কারণ আবিষ্কৃত হবে।

এই আলোচনায় আমি কিছু অবতার বা সাধু-সন্তদের অলৌকিক ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলেও বেশ কিছু ভাববাদী চিন্তার ব্যক্তি এবং অনেক ঘটনার উল্লেখ করে হয়তো বলবেন, "এগুলোর ব্যাখ্যা করুন তো ?" এই সব ভাববাদীদের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে জানাই যে, কোনও অবতারদের ঘটানো অলৌকিক ঘটনার অলৌকিক কারণ ব্যাখ্যা করতে অথবা ওই ধরনের অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে আমি সক্ষম,সেই সঙ্গে এও ঘোষণা করছি, কেউ যদি আমাকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে পারেন, তবে, আমি তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে বাধ্য থাকব। আমার এই বিষয়ে শেষ পাতায় পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অবতার বা সাধুদের যে-সব অলৌকিক ক্ষমতাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, প্রায় সব গুরুরাই এই ধরনের খেলাই দেখিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, সব গুরু বা অবতারদের নামের উল্লেখ না থাকলেও তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর লৌকিক কারণ কিন্তু এই আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

চার

সাধক-সম্মোহন-আত্মসম্মোহন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমন অনেক ধর্মপ্রচারক এসেছিলেন বা রয়েছেন যাঁদের অনেকে আত্ম-সম্মোহনের ফলে প্রচণ্ড শীতেও নিজেদের শরীর গরম রাখতে সক্ষম, গুড ফ্রাইডে বা বিশেষ পবিত্র দিনে অনেক সাধক ভক্তের হাত পা থেকে রক্তপাতের ঘটনাও ঘটতে দেখা গেছে। আমাদের দেশের এক 'পরমপুরুষের' পিঠে অন্য একজনের আঘাতের চিহ্ন ফুটে ওঠার ঘটনাও আমাদের অজানা নয়। এই সব ঘটনাগুলোকে যদিও অনেকেই অলৌকিকত্বের মোড়কে চালাতে চান, তবু বাস্তবকে স্বীকার করে নিয়ে আমাকে বলতেই হবে যে, এই ঘটনাগুলোর কোনটার পিছনেই অলৌকিকত্ব নেই। এ-গুলো মানুষেরই শারীরবৃত্তিক বিশেষ প্রক্রিয়া।

এই ঘটনাগুলো কেমন ভাবে ঘটে, তা বুঝতে হলে জানতে হবে সম্মোহন কী। 'সম্মোহন' কথাটা আমাদের প্রত্যেকের কাছেই অতি পরিচিত এবং অতি রহস্যময়। সম্মোহন সম্পর্কে জানার আগ্রহ থাকলেও জানাবার মত লোক বা বইয়ের সংখ্যা এতই স্বল্প যে, ঔৎসুক্য মেটান প্রায় ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না, ফলে একটা গোলমেলে ধোঁয়াটে ধারণা থেকে গেছে সাধারণের মনে। বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাবে সাধারণের ধারণা সম্মোহন একটা মারাত্মক ও প্রায় অলৌকিক ধরনের ব্যাপার-স্যাপার। সম্মোহনের সাহায্যে সম্মোহনকারী সম্মোহিতকে দিয়ে যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে। যেমন, জাদুকরেরা স্রেফ সম্মোহন করে দর্শকদের যা খুশি তাই দেখতে বাধ্য করে। সম্মোহন করতে পারে এমন লোকের কাছে যাওয়া দস্তুরমত বিপজ্জনক। হয়তো সম্মোহন করিয়ে চুরি-চামারি, খুন-খারাপি করিয়ে বসবে, অথবা, সম্মোহন করে মনের অনেক গোপন কথা জেনে নিয়ে ব্ল্যাকমেল করবে। সম্মোহন নিয়ে বাজারে বইও কিন্তু খুব একটা কম নেই। তবে বাজারচলতি বইয়ের শতকরা একটিতেও সম্মোহন নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আছে কিনা সন্দেহ। সম্মোহন বিবর্তনের ইতিহাস ও বস্তুবাদী মনস্তাত্ত্বিকদের চোখে সম্মোহন কী, তাই নিয়ে বরং একটু আলোচনা করা যাক।

সম্মোহনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হিপ্‌নোটিজম্ (Hypnotism)। হিপ্‌নোটিজম্ কথাটি আবার এসেছে হিপ্‌নোসিস্ (Hypnosis) কথা থেকে। হিপনোস্ কথার অর্থ ঘুম। স্বাভাবিক ঘুমের সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও সম্মোহন-ঘুম আর স্বাভাবিক-ঘুম এক নয়, কারণ অ-সাদৃশ্যও কম নয়। তবে এটা বলা যায়, সম্মোহন ঘুমেরই রকমফের এবং জেগে থাকা ঘুমের একটা অন্তবর্তী অবস্থা।

আধ্যাত্মিকতাবাদ ও জাদুবিদ্যার কবল থেকে মনোবিজ্ঞানকে মুক্ত করে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নত করতে প্রচুর বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল। সম্মোহনের ক্ষেত্রে এই বাধা ছিল আরও বহুগুণ বেশি। কারণ, এখানে রয়েছে অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার।

ভারত, চীন ও গ্রীসের প্রাচীন সভ্যতার আদিপর্বে ধর্মীয় ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সম্মোহনের প্রচলন ছিল। আমাদের অথর্ববেদে সম্মোহনের উল্লেখ দেখতে পাই। মহাভারতেও সম্মোহনের

প্রয়োগের উল্লেখ আছে।

প্রাচীনযুগে সম্মোহনের যে মর্যাদা ছিল মধ্যযুগে সেই মর্যাদা হারিয়ে সম্মোহন হয়ে দাঁড়ায় 'ব্ল্যাক-ম্যাজিক' বা ডাকিনীবিদ্যা। কাপালিক বা তান্ত্রিকরা ইচ্ছে করলেই তাদের সম্মোহন শক্তির দ্বারা ক্ষতি করতে পারে, এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার বসে আজও অনেকেই এদের সযত্নে এড়িয়ে চলেন।

আধুনিক যুগের সম্মোহনের সূচনা আঠারশো শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ডক্টর মেসমার অনেক দুরারোগ্য রোগীকে সম্মোহিত করে মস্তিষ্কে ধারণা সঞ্চার করে (Suggestion পাঠিয়ে) সারিয়ে তুললেন। মেসমারের সম্মোহন চিকিৎসার এই অভাবনীয় সাফল্যে ইউরোপে হৈ-হৈ পড়ে গেল। সম্মোহন পরিচিত হল 'মেসমারিজম' নামে।

এরপর উনিশ শতকের মাঝামাঝি স্কটল্যাণ্ডের ডাক্তার জেমস্ ব্রেইড-এর সম্মোহন নিয়ে গবেষণা আবার আলোড়ন তুলল। তিনি সম্মোহনের নাম দিলেন 'হিপনোসিস্' (hypnosis)। ডক্টর জেমস্ ব্রেইড সম্মোহন-ঘুমের ব্যাখ্যা করলেন বটে, কিন্তু, সম্মোহনকারী ও সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে সম্মোহনকালে কী ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে সেই বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। অতএব জানা গেল না, কী ভাবে সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তিকে প্রভাবিত করেন। অর্থাৎ, এটুকু বোঝা গেল যে, সম্মোহনকারী সম্মোহিতকে জেগে থাকা ও ঘুমের একটি অন্তর্বর্তী অবস্থায় নিয়ে এসে সম্মোহিতের মস্তিষ্কে প্রয়োজনীয় বিশেষ একটি ধারনার সঞ্চার করতে থাকেন। এই ধারনা সঞ্চারের কাজটি করা হয়, যেই ধারনাটি সম্মোহিতের মস্তিষ্কে পৌঁছে দিতে হবে, সেই ধারনাটি সম্মোহিতের সামনে বারবার একঘেয়ে ভাবে আউড়ে যাওয়ার মাধ্যমে। এর ফলে সম্মোহনকারী হাসালে সম্মোহিত ব্যক্তি হাসে, সম্মোহনকারী কাঁদালে সম্মোহিত ব্যক্তি কাঁদে। সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের এই যোগাযোগটিকে মনস্তত্ত্বের ভাষায় বলা হয় 'সম্পর্ক' (rapport)।

উনিশ শতকের শেষ দশকে প্যারিসে শার্কো এবং ন্যান্সিতে বার্নহাইম-এর নেতৃত্বে হিপনোসিস্ নিয়ে শুরু হলো নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

হিষ্টিরিয়া ও সম্মোহনের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করে শার্কো মতপ্রকাশ করলেন—সম্মোহন হলো তৈরি করা নকল হিষ্টিরিয়া। সম্মোহিত ব্যক্তিরা সকলেই নিউরোটিক। সম্মোহনকারীর ধারনা সঞ্চারের (Suggestion) ব্যাপারটাকে আদৌ গুরুত্ব দিলেন না তিনি।

বার্নহাইম মত প্রকাশ করলেন, সম্মোহন ধারণা সঞ্চারের ফল। সব মানুষের মস্তিষ্কেই কম-বেশি কোন ধারণা সঞ্চারিত করা যায়, অর্থাৎ, সব মানুষকেই সম্মোহিত করা যায়। অবশ্য সম্মোহনের গভীরতা সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান নয়।

আরও অনেক নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে এলেন মেতেল, জিমসেন, ভেরওর্ন এবং বেকটেরেফ। ভেরওর্ন বললেন, সম্মোহন হলো অতি-জাগ্রত অবস্থা, অর্থাৎ এই অবস্থায় মানুষের মস্তিষ্ক থাকে সবচেয়ে সজাগ। বেকটেরেফ বললেন—সম্মোহন হলো স্বাভাবিক ঘুমেরই রকমফের।

এলেন ফ্রান্সের এক বিখ্যাত মনোবিদ স্যানেট। তিনি যে তত্ত্ব দিলেন সেটা শার্কোর তত্ত্বের উন্নত সংস্করণ মাত্র।

ফ্রয়েড হাজির হলেন তাঁর সাইকো-অ্যানালিটিক থিওরি নিয়ে। ফ্রয়েডের মতে সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের মধ্যে 'সম্পর্ক' বা rapport গড়ে ওঠে পারস্পরিক প্রেম বা ভালোবাসার ফলে। প্রেমে পড়া ও সম্মোহিত হওয়া একই ধরনের ব্যাপার। ফ্রয়েডের তত্ত্বে সম্মোহিত অবস্থার বিবরণ এবং সম্মোহনকারী ও সম্মোহিতের মধ্যে 'সম্পর্ক' সৃষ্টির ব্যাখ্যা মেলে, কিন্তু

ফ্রয়েড

মেলে না সম্মোহিতের স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াকলাপ ও সম্মোহনের কারণ।

এলেন পাভলভ। বললেন, সম্মোহন আংশিক ঘুম, জেগে থাকা ও ঘুমের একটা অন্তর্বর্তী অবস্থা। স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের কর্মবিরতি বা নিস্তেজনা (inhibiation) বিনা বাধায় সারা মস্তিষ্কে ও দেহে ছড়িয়ে পড়ে। সম্মোহন-ঘুম বা হিপনটিক ঘুমে মস্তিষ্কের যে-অংশ সম্মোহনকারীর নির্দেশে ও কণ্ঠস্বরে উদ্দীপ্ত হচ্ছে সেই অংশ জেগে থাকে। মস্তিষ্কের এই জেগে থাকা অংশই সম্মোহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের একমাত্র পথ। সম্মোহনকারীর নির্দেশ ছাড়া সম্মোহিতের পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, সম্মোহিতের স্বাধীন কোন ইচ্ছে থাকে না, বা স্বাধীন ইচ্ছে থাকলেও নিষ্ক্রিয় থাকে।

এতক্ষণ আমি ছোট্ট করে আলোচনা করেছি সম্মোহনের ইতিহাস নিয়ে, কারণ সম্মোহন নিয়ে আলোচনার গভীরে ঢোকার আগে সম্মোহনের ইতিহাস জানবারও প্রয়োজন আছে। সম্মোহনের ইতিহাস বলতে গেলেই শুরু করতে হবে প্রাচীন সভ্যতার আদিপর্ব থেকে, আর শেষ করতে হবে এ-যুগের মনোবিদ্যার দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব পাভলভ ও ফ্রয়েডের পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব আলোচনার মধ্য দিয়ে।

পাভলভ ও ফ্রয়েডকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মনোবিজ্ঞানীরা চালিয়ে যাচ্ছেন ঠাণ্ডা-গরম লড়াই। পাভলভ ও ফ্রয়েড দু'জনেই সমসাময়িক। পাভলভ জন্মেছিলেন ১৮৪৮ সালে। মারা যান ১৯৩৬-এ। ফ্রয়েড জন্মেছিলেন ১৮৫৬ সালে। মৃত্যু ১৯৩৯ সালে। আমৃত্যু এই দুই মনীষীই ছিলেন স্বতন্ত্রে আত্মপ্রত্যয়ী ও সক্রিয়।

মানসিকতার হদিস পেতে পাভলভ মেতেছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞানের পথে উচ্চমস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার গবেষণায়, আর ফ্রয়েড মানসিকতার সন্ধান পেতে চেয়েছিলেন মস্তিষ্ক বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মনের গভীরে। পাভলভ এগিয়ে ছিলেন উচ্চস্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে, ফ্রয়েড এগিয়ে ছিলেন মনোবিজ্ঞানের চিকিৎসক ও রোগী দু'জনেরই মনোসমীক্ষার পথে। পাভলভের আবিষ্কার 'উচ্চতর স্নায়ুবিজ্ঞান' এবং ফ্রয়েডের আবিষ্কার—'অবচেতন মনের বিজ্ঞান'। পাভলভ-তত্ত্বকে ঘিরে রয়েছেন 'Objective' (বস্তুবাদী) দৃষ্টিভঙ্গির মনোবিজ্ঞানীরা, আর ফ্রয়েডের তত্ত্বকে ঘিরে রয়েছেন 'Subjective' (আত্মবাদী) অন্তর্দর্শনে বিশ্বাসী মনোবিজ্ঞানীরা।

এই দুই মহারথীর তত্ত্বে বিরোধিতা রয়েছে ঘুম, স্বপ্ন, শিশুমন, শিশুশিক্ষা, মনোবিকারের কারণ, এর চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিষয়ে।

যাই হোক, আসুন, এবার আমরা ইতিহাস ছেড়ে সম্মোহনের ভিতরে ঢুকি।

কোলের ছোট্ট বাচ্চাদের ঘুম পাড়ানোর কৌশল ও সম্মোহন-ঘুম পাড়ানোর কৌশল কিন্তু অনেকটা একই ধরনের। শিশুদের ঘুম পাড়ানো হয় একটানা একঘেয়ে সুরে গান গেয়ে। সম্মোহন-ঘুমের জন্যেও সম্মোহনকারী প্রায় একই ধরনের পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। সম্মোহনকারী যাকে সম্মোহন করতে চায়, তাকে শুইয়ে দেয় একটা সুন্দর নরম-সরম ছিমছাম বিছানায়। নরম বালিশে মাথা রেখে সারা শরীরটাকে হালকাভাবে ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে থাকেন রোগী। ঘরে জ্বলে খুব কম শক্তির নাইটল্যাম্প।

সম্মোহনকারী ধীরে-ধীরে কিছুটা সুর করে টেনে-টেনে বলতে থাকেন, "আপনি এখন ঘুমিয়ে পড়ুন, ঘুমিয়ে পড়ুন। আপনার ঘুম আসছে। হাত-পা ভারী হয়ে আসছে। সারা দেহ অসাড়, অবশ হয়ে আসছে। হাতের পেশি, পায়ের পেশি, বুকের পেশি, পেটের পেশি অসাড়, অবশ হয়ে আসছে। আপনার ঘুম আসছে, গভীর ঘুম আসছে।

...বাইরের সব শব্দ আপনার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাইরের গাড়ির শব্দ, ট্রামের শব্দ, কোন শব্দই আপনার কানে যাচ্ছে না। আমার কথা ছাড়া অন্য কোন শব্দ আপনি শুনতে পাচ্ছেন না। ...আপনার ঘুম আসছে। ঘুম, ঘুম, গভীর ঘুম।...আপনার হাত-পা ভারী হয়ে গেছে। ঘুম আসছে... সম্মোহনকারী টানা-টানা একঘেয়ে সুরে বলে যেতে থাকে। এই কথাগুলো শুনতে শুনতে সম্মোহনের ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন শুয়ে থাকা ব্যক্তি।

সম্মোহিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সম্মোহনকারীর এই কথা বা নির্দেশগুলোকে বলা হয় "Suggestion", বাংলায় অনুবাদ করে বলতে পারি 'ধারণাসঞ্চার' বা 'চিন্তাসঞ্চার।'

অবশ্য আরো অনেক পদ্ধতির সাহায্যেই সম্মোহন-ঘুম আনা সম্ভব। যে কোনও ইন্দ্রিয়কে মৃদু উদ্দীপনায় উত্তেজিত করলেই ঘুম আসবে।

পাভলভ ও ফ্রয়েড দু'জনেই সম্মোহিত অবস্থাকে এক ধরনের ঘুমন্ত অবস্থা বলেই মত প্রকাশ করেছিলেন। সম্মোহন সম্বন্ধে জানতে গেলে ঘুম সম্বন্ধে দু-একটা কথা জানা খুবই প্রয়োজন, কারণ, ঘুম আর সম্মোহন ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আমরা আমাদের জীবনের প্রায় তিনভাগের একভাগ ঘুমিয়েই কাটাই। মানুষ যখন ঘুমোয়, তখন কিন্তু তার সম্পূর্ণ মস্তিষ্কই কর্মহীন হয়ে পড়ে না। কিছু মস্তিষ্ক কোষ জেগে থাকে বা

পাভলভ

আধা-ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। সামগ্রিকভাবে উচ্চ-মস্তিষ্ক কাজ না করে বিশ্রাম নিলেও কিছু জেগে থাকা কোষের সাহায্যে আমরা ঘুমের মধ্যেও নড়াচড়া করি, পাশ ফিরি, মশা কামড়ালে জায়গাটা চুলকোই, স্বপ্ন দেখি ইত্যাদি অনেক কিছুই করি। এই অবস্থায় কিন্তু সব পেশিও শিথিল হয়ে পড়ে না। ঘুমের মধ্যে মলমূত্রের নির্গমন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ না হারায় সেদিকে মস্তিষ্ক লক্ষ্য রাখে।

ঘুমের গুরুত্ব মানুষের জীবনে অসীম। পনের-কুড়ি দিন না খেয়ে থাকলে শরীর দুর্বল হয় বটে, কিন্তু সাধারণত মানসিক ভারসাম্যের অভাব হয় না। অথচ, পনের-কুড়ি দিন সম্পূর্ণ না ঘুমিয়ে কাটালে প্রায় ক্ষেত্রেই মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটে।

আপনাদেরই পরিচিত এমন দু-একজন হয়ত আছেন যাঁরা মাসের পর মাস অথবা বছরের পর বছর অনিদ্রা রোগে ভুগছেন। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীবিমল মিত্র সুদীর্ঘ বছর অনিদ্রারোগে ভুগেছেন। আপনাদের মনে নিশ্চয়ই এই প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি মারবে, এত দীর্ঘ অনিদ্রার পরেও এঁদের প্রত্যেকেরই মানসিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে কীভাবে?

না, আগে আমি যা বলেছি, সেটা মিথ্যে বলিনি। আবার, আপনারা যা দেখেছেন তাও মিথ্যে নয়। 'অনিদ্রারোগ' মস্তিষ্কের বিশেষ অসুস্থ অবস্থা। এই বিশেষ অবস্থায় মস্তিষ্কের অনেকগুলো কোষ দিনের ১৭/১৮ ঘণ্টা প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। রাতে ৬/৭ ঘণ্টা কোষগুলো গভীর ঘুম দিয়ে বিশ্রাম নেয় এবং সজীব ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। অধিকাংশ অনিদ্রা রোগে গভীর ঘুম হয় না বটে, কিন্তু আধাঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে একটা সময় কাটে। এই সময়টায় মস্তিষ্ককোষ তাদের প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিয়ে নেয়, ফলে মস্তিষ্ককোষের বিশেষ কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয় না। এই ধরনের আধোঘুম অবস্থায় আমরা সুস্থ মানুষরাও অনেক সময় কাটাই। বাসে, ট্রামে, ট্রেনে অথবা ইজিচেয়ারে বিশ্রাম নিতে নিতে অথবা নেহাতই অফিসের চেয়ারে বসে অনেক সময় ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থায় থাকি। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থার নাম 'hypnoid State'। অনিদ্রা রোগ এই 'hypnoid State-এরই দীর্ঘতম অবস্থা।

পাভলভীয় বিজ্ঞানে ঘুমিয়ে পড়া থেকে জেগে ওঠার মধ্যে চারটি প্রধান পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। প্রথম পর্যায় প্রায় জাগ্রত অবস্থার মতো। দ্বিতীয় পর্যায়ও প্রায় প্রথম পর্যায়েরই মতো, তবে ঘুমের গভীরতা প্রথম অবস্থার চেয়ে দ্বিতীয় অবস্থায় বেশি। একে বলে ফেজ অব ইকোয়ালিটি। তৃতীয় পর্যায়ের নাম ফেজ অব প্যারাডক্স। এই পর্যায়ে আমরা স্বপ্ন দেখি। শেষ এবং চতুর্থ পর্যায়ের নাম ফেজ অব আলট্রা-প্যারাডক্স। এই পর্যায়ে আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকি।

সম্মোহিত অবস্থায় ঘুমের তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ 'প্যারাডক্সিকাল ফেজ' দেখা যায়। ঘুমের এই পর্বকে আর. ই. এম. বা 'র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট' পর্ব বলে। এই প্যারাডক্সিকাল ফেজে সম্মোহিতের উপর সম্মোহনকারীর নির্দেশ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্রতিক্রিয়া খুবই অভাবনীয়। মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তিক ধর্ম এবং বিশিষ্টতাই সম্মোহনকারীর শক্তি বলে প্রচারিত হয়ে আসছে।

স্বাভাবিক ঘুমে মস্তিষ্কের প্রায় সব স্নায়ুগুলো নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে এবং সারা দেহে এই নিষ্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় অবস্থাকে বলা হয় 'Inhibition'। সম্মোহন-ঘুমে মস্তিষ্কের সব স্নায়ু নিষ্ক্রিয় হয় না। সম্মোহনকারীর নির্দেশ মতো মস্তিষ্কের একটা অংশ জেগে থাকে ও উদ্দীপ্ত হতে থাকে। এই জেগে থাকা মস্তিষ্কের অংশ বা স্নায়ু সম্মোহিত ব্যক্তির সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের একমাত্র পথ। সম্মোহনকারী ও সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে এই যোগসূত্রকে বলা হয় 'rapport' বা 'সম্পর্ক'।

'Inhibition' অর্থাৎ বাংলায় বলতে গেলে নিস্তেজ বা নিষ্ক্রিয় থাকার অর্থ কিন্তু

উত্তেজনার অভাব বা অনুপস্থিতি নয়, উত্তেজনার বিপরীতধর্মী একটি প্রক্রিয়াকে বোঝাতে 'Inhibition' কথাটি ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কে উত্তেজনাধর্মী ও নিস্তেজনাধর্মী দুই ধরনের স্নায়ুপ্রক্রিয়া রয়েছে। এই দুই মিলেই স্নায়ুপ্রক্রিয়ার প্রকৃত রূপ। দুই প্রক্রিয়াই সব সময় গতিশীল এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মস্তিষ্কের কোনো স্নায়ু বা কেন্দ্রবিশেষ উত্তেজিত হলে, উত্তেজনার ঢেউ প্রথমে বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাকে বলা হয় 'irradiation'। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তেজিত স্নায়ুকেন্দ্রের আশেপাশের স্নায়ুকেন্দ্রগুলোতে উত্তেজনার বিপরীতধর্মী নিস্তেজ অবস্থা বা 'inhibition' দেখা দেয়।

ঘুমিয়ে পড়লে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের উদ্দীপনায় সাড়া দেয় না। উল্টো দিক থেকে বাইরের উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রবেশ করার পথগুলো আমরা বন্ধ করে দিলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। জার্মানে ডাক্তার ষ্ট্রামপল তাঁর এক বালক রোগীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, বালকটির একটি চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একটি কানে শুনতে পেত না। দেহের ত্বকের অনুভূতিশক্তিও গিয়েছিল নষ্ট হয়ে। বালকটির সুস্থ চোখ ও কানের দেখা ও শোনা কোনো কিছু দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বালকটি ঘুমিয়ে পড়ত। পাভলভও এই ধরনের একটি রোগীকে তার ইন্দ্রিয়-উপলব্ধি বন্ধ করে দিয়ে ঘুম পাড়াতেন। গ্যালকিস নামের আর এক বিজ্ঞানী কয়েকটি কুকুরের ঘ্রাণ, শ্রবণ ও দর্শন-ইন্দ্রিয়গ্রাহী স্নায়ুগুলো কেটে ফেলে দেখেছিলেন কুকুরগুলো সারা দিনরাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটাচ্ছে।

মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোর অবসাদ থেকেই যে সব সময় ঘুম আসে, এমনটি নয়। পাভলভের মতে ঘুম একরকম 'conditioned reflex' বা 'শর্তাধীন প্রতিফলন'।

ঘুমের ব্যাপারে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখলে সাধারণত ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু একজন লোকের দীর্ঘ ঘুমের পরেও একটা বিশেষ পরিবেশে একজন সম্মোহনকারী আবার তাকে 'suggestion' দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারে, এই সম্মোনহন-ঘুমের ক্ষেত্রে ঘুম 'conditioned reflex' বা শর্তাধীন প্রতিফলন। আমি আমার এক সহকর্মী বন্ধু ও এক পুস্তক প্রকাশকের কথা আগেই বলেছি, যাঁরা প্রতি রাতেই ঘুম আনতে ঘুমের ওষুধ খেতেন। দু'জনকেই আমি একবার ঘুমের জোরালো ওষুধ বলে ভিটামিন ক্যাপসুল দিয়েছিলাম। ক্যাপসুল খেয়ে দু'জনেরই খুব ভাল ঘুম হয়েছিল। ওই দু'জনের বেলায় ভিটামিন ক্যাপসুল আমার 'suggestion' বা ধারণা সঞ্চারের জন্য 'conditioned stimilus' বা শর্তাধীন উদ্দীপক বস্তুর কাজ করেছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক শল্য-চিকিৎসক এই ভারতবর্ষের বুকে প্রথম সম্মোহন করে রোগীকে ব্যথা চলে যাওয়ার suggestion দিয়ে একশোর মতো অপারেশন করেছিলেন। চিকিৎসকের নাম ছিল Dr. Esdaile। তিনি যে সময়ে সম্মোহন-ঘুম পাড়িয়ে রোগীদের বেদনাবিহীন অপারেশন করেছেন, সেই সময় ইথার বা ক্লোরোফর্মের ব্যবহার শুরুই হয়নি।

সোভিয়েত রাশিয়ায় একদা ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন কে· পি· মেনন। বছর কুড়ি আগে শ্রী মেননের কন্যাকে রাশিয়ায় সম্মোহন-ঘুমের সাহায্যে বেদনাহীনভাবে সন্তান প্রসব করানো হয়।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ সহ বিশ্বের প্রায় ৫০টির মতো দেশে বহু দন্ত-চিকিৎসকই সম্মোহন - ধারণা সঞ্চারের (Suggestion) সাহায্যে দাঁত তুলে থাকেন। রোগী দাঁত তোলার ব্যথা আদৌ অনুভব করে না। বেদনাহীন সন্তান প্রসবের জন্য সম্মোহনকে বিভিন্ন দেশই কাজে লাগাচ্ছে।

নিউরোসিস ছাড়াও নানা ধরনের রোগের উপরই হিপনোটিক সাজেশন বা সম্মোহন ধারণা সঞ্চারের ফলাফল ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে স্ট্যামারিং, অ্যাজমা,

কোলাইটিস, ইমপোটেন্সি, ফ্রিজিডিটি, হাইপোকনড্রিয়া এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলির reflex বা প্রতিফলন বিশৃংখলায় (সাইকো-সোমাটিক) হিপ্‌নটিক-সাজেশানে সাহায্যে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। উন্মাদরোগের মধ্যে স্কিজোফ্রিনিয়া এবং প্যারানইয়াতে হিপনটিক-সাজেশনে ভালই ফল পাওয়া যায়। অবশ্য সেই সঙ্গে ওষুধও দিতে হয়। এছাড়াও যে কোনো রোগেই সাহায্যকারী চিকিৎসা হিসেবে হিপনটিক-সাজেশন দেওয়া যেতে পারে।

সম্মোহনের সাহায্যে সম্মোহনকারী এমন অনেক ঘটনাই ঘটাতে পারেন যেগুলি শুনলে প্রাথমিকভাবে অসম্ভব বা অবাস্তব বলে মনে হয়।

সম্মোহনকারী সম্মোহিতকে যদি 'সাজেশন' দিতে থাকেন, 'এবার তোমার ডান হাতের কব্জিতে একটা গনগনে লোহা খুব সামান্য সময়ের জন্য ছোঁয়াব। লোহাটা আগুনে পুড়ে টকটকে লাল হয়ে রয়েছে, টকটকে লাল গরম লোহাটা এবার তোমার ডান কব্জির কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে। এটা প্রচণ্ড গরম। একটুক্ষণের জন্য লোহাটা তোমার ডান কব্জিতে ঠেকানো হবে। ফলে একটা ফোসকা পড়বে। ভয় নেই, শুধু একটা ফোসকা পড়বে' এই সাজেশনের সঙ্গে-সঙ্গে ডানহাতের কব্জিতে ঠাণ্ডা লোহা ঠেকালেও দেখা যাবে যে ওখানে Second degree burn সৃষ্টি হয়ে ফোসকা পড়েছে।

আধুনিক শারীরবিজ্ঞানে শিক্ষিত অনেকের কাছেও আমার কথাগুলো একান্তই অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কারণ, শারীরবিজ্ঞানে বলে, শরীরের কোনো স্থানে প্রচণ্ড উত্তাপ লাগলে সেখানে অনেকগুলো আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। বহু কোষ ফেটে যায়। কোষগুলোর ভিতরের রস বেরিয়ে আসে। এই কোষগুলোর রসই ফোসকায় জমা রসের প্রধান অংশ। শারীরবিজ্ঞানে এই ফোসকা পড়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোনো যোগাযোগের কথা পাওয়া যায় না বলেই অনেক শারীরবিজ্ঞান শিক্ষিতরাও বিশ্বাস করেন কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের কোষ ফাটিয়ে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা নেই। শারীরবিজ্ঞান সাধারণভাবে এটাই বলে যে, ফোসকা পড়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ না থাকলেও, ফোসকা পড়ার মুহূর্ত থেকে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে 'Autonomus' (অটোনোমাস) স্নায়ুতন্ত্রের কিছু প্রভাব দেখা যায়, যা শরীরকে দুর্বল করে বা মানসিক আঘাত (shock) দেয় কিংবা peripheral circulatory failure ইত্যাদির ক্ষেত্রে কাজ করে।

'Autonomus nervous system' (অটোনোমাস নার্ভাস সিস্টেম) সম্পর্কে নতুন ধারণা না থাকার দরুন এবং উচ্চ-মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবের দরুন অনেকের কাছেই আমার কথাগুলো উদ্ভট ও অবাস্তব মনে হতে পারে। এই বিষয়ে অবগতির জন্য জানাই, ১৯২৭ সালে বহু চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীদের সামনে V. Finne শুধুমাত্র হিপনোটিক-সাজেশনের দ্বারা একজন সম্মোহিতের শরীরে ফোস্কা ফেলে দেখান।

Platanov—The World as a Physiological & Therapeutic Factor; 1959, বইটির ১৯৩ পৃষ্ঠায় প্লাটানভ বলছেন "Suggested burns resulting from corresponding suggestions during suggested sleep maybe referred to the disturbances of cutaneous trophics and tissue blood supply arising under the influence of verbal suggestion."

বিখ্যাত দুই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ Nickolsky ও A. Zeitsev হিপনোটিক-সাজেশনের সাহায্যে বহু চর্মরোগ সমেত ফোস্কাপড়াও উৎপাদন করেছেন এবং সারিয়েছেন। এই প্রসঙ্গেই প্লাটানভ মন্তব্য করেছেন সেটাই তাঁর বইয়ের ১৯৩ পৃষ্ঠা থেকে তুলে দিচ্ছি—

"Since Cerebral Cortex can influence the nurohumoral and metabolic processes occuring in the skin it follows that it is possible to form

psychogenic disorders of the cutaneous trophics."

বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী J. A. Hadfield একবার এক রোগীকে সম্মোহিত করে হিপনোটিক-সাজেশন দিয়ে তাকে বোঝান যে, তার শরীরে এমন কিছু ছোঁয়ান হবে যাতে তার কোনও ব্যথা লাগবে না। তারপর সম্মোহিতের শরীরে একটি প্রচণ্ড গরম লোহার ছেঁকা দেওয়া হয়। ছেঁকা জায়গাটিতে সামান্য ফোস্কা পড়লেও গরম ছেঁকা লাগায় পোড়ার যে তাৎক্ষণিক তীব্র ব্যথা হওয়া উচিত, সম্মোহিত ব্যক্তি তা অনুভব করেনি।

আর একবার ওই ব্যক্তিকেই Hadfield সম্মোহিত করে 'সাজেশন' দিয়ে এই ধারণা-সঞ্চার করেন যে, তার শরীরে একটি গরম লোহা ছোঁয়ান হচ্ছে। গরম লোহার বদলে একটি আঙুল ছোঁয়ান মাত্র লোকটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শরীরের যেখানে আঙুল ঠেকান হয়েছিল, সেখানে ফোস্কা দেখা দেয়। একদিন পরে ফোস্কায় জল জমলো, পোড়া ফোস্কার মতো কালো দাগও পড়লো।

হিপনোটিক-সাজেশনের সাহায্যে Delboef, Kraft-Ebbing, Fourthachon এবং Forel সম্মোহিতের শরীরে ফোস্কা সৃষ্টি করেছিলেন।

বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষ আজ পৃথিবী থেকে মহাকাশ পর্যন্ত বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করলেও মানুষ তার মন বা মস্তিষ্কের সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছুই জানতে পারেনি।

সমব্যথী চিহ্নের মহাপুরুষ

বিভিন্ন শতাব্দীতে এমন অনেক 'stigmatist' বা 'সমব্যথী ক্ষতচিহ্নধারী'র কথা শোনা গেছে, যাঁদের অনেকেই ধর্মীয় সমাজে অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত হয়েছেন। গত প্রায় ৭৫০ বছরে ৩০০-র উপর 'সমব্যথী ক্ষতচিহ্নধারী'র কথা জানা গেছে। প্রথম যাঁর সম্বন্ধে এই অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনা যায়, তিনি হলেন ফ্রান্সিসকান অর্ডারের প্রতিষ্ঠাতা ইতালির অ্যাসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস। ঘটনাটি ঘটে ১২২৪ সালে। সেণ্ট ফ্রান্সিসের হাতের তালুতে ও পাতায় কিছু মাংস গজায়, যেগুলো অনেকটা পেরেকের মতো বলে শোনা যায়। অন্ধ ভক্তরা মনে করলেন, যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় হাতে যে পেরেক ঠোকা হয়েছিল, সেই পেরেকের চিহ্নগুলোই ফুটে উঠেছে সেণ্ট ফ্রান্সিসের হাতে, এগুলো যীশুর আশীর্বাদ-ধন্য চিহ্ন।

কোনেরশ্রুত-এর থেরেসা নিউম্যান (Theresa Neuman of Konnersreuth) তাঁর Stigmatisation বা সমব্যথী ক্ষতচিহ্নের জন্য বিশ্বজুড়ে হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। থেরেসা নিউম্যান জন্মেছিলেন ১৮৯৮-এর গুড ফ্রাইডের দিন, মৃত্যু ১৯৫২ সালে। ১৯২৬-এর ২ এপ্রিল থেরেসার হাত-পা থেকে প্রথম রক্ত ঝরতে দেখা গেল। তারপর প্রতি বছরই গুড ফ্রাইডেতেই থেরেসার হাত-পা থেকে ঝরতে লাগল রক্ত। যীশুর সঙ্গে একাত্মতার ফলেই যে এই রক্তপাত এই বিষয়ে ভক্তজনদের কোনো দ্বিমত ছিল না, থেরেসা এই সমব্যথী-চিহ্ন 'আত্ম-সম্মোহন' ও স্বধারণা-সঞ্চার'(auto-suggestion) -এর সাহায্যে সৃষ্টি করতেন না। তিনি এর জন্য চতুরতার আশ্রয় নিতেন। তাঁর এই জালিয়াতি শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে।

ইতালিয়ান অন্ধ-ধর্মবিশ্বাসী গোম্মা গ্যালভানির হাতে-পায়েও এমনি পবিত্র সমব্যথী-চিহ্ন ফুটে উঠত। তাই নিয়ে ইউরোপে প্রচুর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। গোম্মা গ্যালভানি জন্মেছিলেন ১৮৭৮ সালে, মৃত্যু ১৯০৩ সালে। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে অভিমত প্রকাশ করেন যে, গোম্মা আত্ম-সম্মোহন (auto-suggestion) ও হিস্টিরিয়াগ্রস্ত (hysterico epileptic fits) অবস্থায় নিজেই নিজের শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি করতেন।

বেলজিয়ামের আর এক ধর্মান্ধ ছিলেন লুইস লেটিউ (Louis Lateau) । তাঁর দেহে সমব্যথী ক্ষতচিহ্নের প্রথম প্রকাশ হয় ১৮৬৮ সালে। প্রতি শুক্রবারই লুইস-এর কপাল থেকে ঘামের মতোই ঝরে পড়ত রক্ত। বেলজিয়ামের এ্যাকাডেমি অব মেডিসিন লুইস-এর এই রক্ত ঝরে পড়া পরীক্ষা করে। তাকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিল সে কোনো রকম কৌশলের আশ্রয় না নিয়েই প্রতি শুক্রবার রক্ত ঝরাত।

সমব্যথী চিহ্নের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শোনা যায়, একবার রামকৃষ্ণদেবের নিষেধ সত্ত্বেও একজন আর একজনকে মেরেছিল। সেই মারে রামকৃষ্ণদেব এতই সমব্যথী হয়েছিলেন যে, তাঁর পিঠেও আঘাত-চিহ্ন ফুটে ওঠে। বস্তুবাদী মনস্তত্ত্ববিদ মাত্রেই আমার সুরে সুর মিলিয়ে বলবেন,রামকৃষ্ণদেব গভীর সংবেদনশীলতার (auto-ensetiveness) জন্যেই আত্ম-সম্মোহনের দ্বারা ও স্ব-ধারণা সঞ্চারের (auto-suggestion) দ্বারা এমনটা ঘটাতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিকতা থাকতে পারে, কিন্তু, অলৌকিকতা নেই। অর্থাৎ, সকলের পক্ষেই এমনটা ঘটানো সম্ভব নয় বটে, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের বিশেষ শারীরিক ও মস্তিষ্কের গঠনের জন্য auto-suggestion-এর দ্বারা এই ধরনের ঘটনা তাদের পক্ষে ঘটানো সম্ভব।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনেও এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিল বলে তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার অনুকূলচন্দ্র কুষ্টিয়া যাচ্ছিলেন ঘোড়ার গাড়িতে। সহিস ঘোড়াকে চাবুক মারতে চাবুকের দাগ ফুটে উঠেছিল অনুকূলচন্দ্রের গায়ে।

প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'পাভলভ পরিচিতি', ২য় পর্ব, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭-এ একটি মেয়ের কথা পাওয়া যায়। মেয়েটির নাম অঞ্জনা। নিটোল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ১৯-২০ বছরের মেয়ে। বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই দেখা দিয়েছে দাঁতে ব্যথা, সেইসঙ্গে বাঁ পা'টায় অসাড়তা। মাঝে-মধ্যে ডান দিকের তলপেটে তীব্র যন্ত্রণা হয়। দাঁতের ডাক্তার, নিউরোলজিস্ট ও আরও কিছু ডাক্তার পরীক্ষা করেছেন। কেউই উপসর্গগুলোর কারণ খুঁজে পাননি।

শেষ পর্যন্ত কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন ডাক্তার গঙ্গোপাধ্যায়। বিয়ের আগে মেয়েটি একজন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ত। শিক্ষকের নাম বঙ্কিমবাবু। বয়েসে অঞ্জনার দ্বিগুণ, বিবাহিত ও সন্তানের পিতা। তবু মেয়েটি বঙ্কিমবাবুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বাড়ির লোকেরা বোধহয় কিছুটা সন্দেহ করেছিলেন, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেন। অঞ্জনা প্রথমটায় বিয়েতে মত দেয়নি। কিন্তু, খুবই বিস্মিত হল ও দুঃখ পেল যখন দেখল তার মাষ্টারমশাইও অঞ্জনার এই বিয়েতে আগ্রহী।

অভিমানে অঞ্জনা বিয়েতে রাজি হল বটে কিন্তু মনে চিন্তার বোঝা রয়ে গেল, এবার থেকে মাষ্টারমশাই দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পেলে সে খবরও পাবে না। মাষ্টারমশাইয়ের বাঁ পায়ে মাঝে-মাঝে একটা অসাড়তা দেখা দেয়, যখন অসাড়তায় মাষ্টারমশাই কষ্ট পাবেন তখন সে থাকবে অনেক অনেক দূরে, সামান্য সহানুভূতিটুকু জানানোরও সুযোগ পাবে না।

বিয়ের দিন পায়ের ব্যথায় বঙ্কিমবাবু অঞ্জনাকে দেখতে আসতে পারলেন না। বিয়ের পর থেকেই অঞ্জনার দেখা দিল দাঁতে ব্যথা ও বাঁ পায়ের অসাড়তা। অঞ্জনার স্বামীর মাঝে-মধ্যে ডান দিকের তলপেটে খুব ব্যথা হয়। অঞ্জনারও মাঝে-মধ্যে শুরু হয়ে গেল ডান তলপেটে

ঠাকুর রামকৃষ্ণ
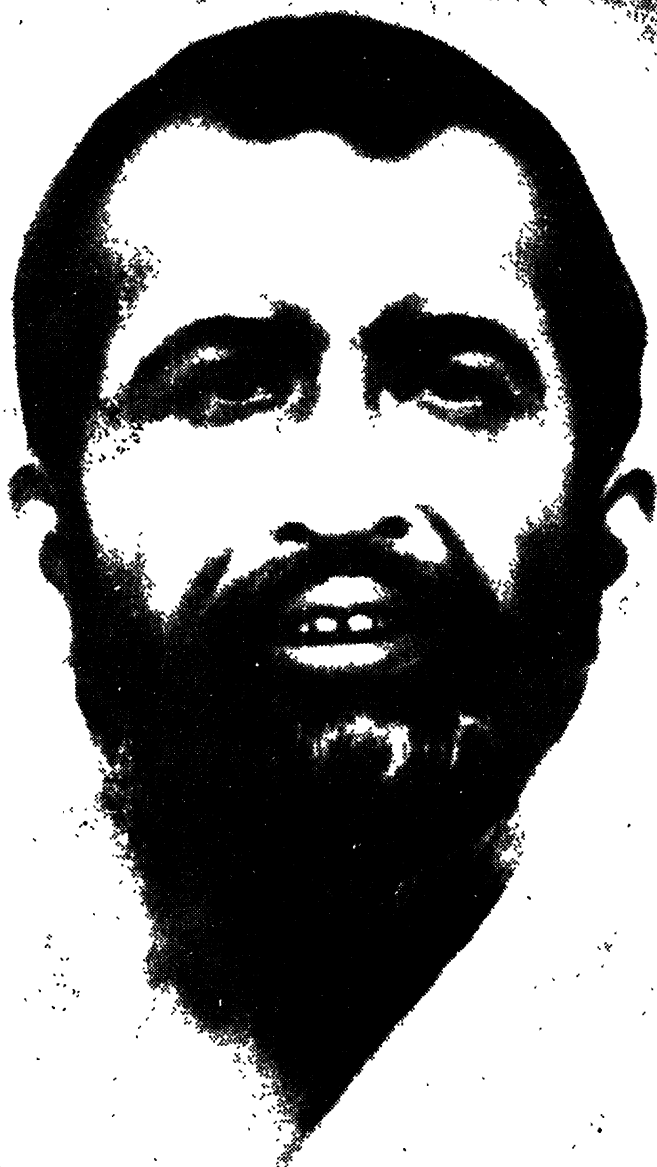
ব্যথা। এই সবগুলোই সমব্যথী-চিহ্নের ঘটনা। অঞ্জনা auto-suggestion-এর সাহায্যে মাষ্টারমশাই ও স্বামীর রোগ-উপসর্গগুলো নিজের দেহেও প্রকাশ করত।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে অনেকেই এই ধরনের সমব্যথী-চিহ্ন বা 'Stigmatisation' সৃষ্টিকারীকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে ধরে নেন। মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য এই ঘটনার মধ্যে খুঁজে পান abnormal psychology বা অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। তাঁরা মনে করেন, সমব্যথী-চিহ্নের ঘটনাগুলো অস্বাভাবিক হলেও আদৌ অলৌকিক নয়। অর্থাৎ, সব মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও কিছু-কিছু মানুষের শরীর-কাঠামোয় ও বিশেষ মস্তিষ্ক-কোষের জন্য এমনটা ঘটা সম্ভব।

V. Bekhterev, I. Tsctorch ও V. Myasichov বিশ শতকের এই তিন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, হিপনোটিক-সাজেশনের দ্বারা শরীরের কিছু-কিছু অংশে রক্তচাপ প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে রক্তবাহী শিরা (capillary) ফাটিয়ে রক্তপাত ঘটানো সম্ভব।

বিশ্ববিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী R. L. Moódy এই ধরনের একটি ঘটনা তাঁর The Lancet· 1948; I, গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (পৃষ্ঠা ১৬৪)। তাঁর এক রোগিণীকে শৈশবে তাঁর বাবা-মায়ের কেউ একজন চাবুক দিয়ে ভীষণ মেরেছিলেন। বড় হয়েও মহিলাটি ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ভুলতে পারেননি। তাঁর স্মৃতিতে ঘটনাটা এমনই গভীরভাবে দাগ কেটেছিল যে, ওই ঘটনার কথা গভীরভাবে মনে করলে মহিলাটির মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো শৈশবের বীভৎস সময়টির অবস্থায় ফিরে যেত এবং শৈশবে শরীরে যে সব জায়গায় চাবুকের তীব্র আঘাত পড়েছিল সেই সব জায়গাগুলো লাল হয়ে ফুলে উঠত, এমন কী ওই জায়গাগুলো থেকে রক্তও ঝরত।

এই ধরনের ঘটনা সকলের ক্ষেত্রে না ঘটলেও হিস্টিরিয়া ও মৃগী রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটতে পারে, বিশেষ করে যদি তাদের রক্তবাহী সরু নালীগুলো (capillary) খুব পলকা (fragile) হয়। এই সব ঘটনা এক ধরনের pathological ক্রিয়া। স্ব-সম্মোহনের ফলে অর্থাৎ নিজেকে নিজে সম্মোহন করে নিজের মস্তিষ্কে নির্দেশ পাঠিয়ে (auto-suggestion) এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সব ক্ষেত্রে সম্ভব না হলেও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী প্লাটানভ-এর (Platanov) The world as a Physiological & Therapeutic Factor; 1959. পৃষ্ঠা ১৯০-এ বলছেন, 'The literature on suggestion & hyposis contains numerous indications of the possibility of influencing the activity of the heart, the state of the cardiovascular system and, in particular, of the possibility of influencing changes in the state of the vasomotor centre by verbal suggestion.'

এবার যে ঘটনাটা বলছি, সেটা ঘটেছিল এই কোলকাতাতেই। (প্রখ্যাত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে স্বর বন্ধ হওয়া একটি রোগী এসেছিল আজ থেকে প্রায় বছর কুড়ি আগে। কথা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে বলা চলে না, বহু কষ্টে ফিসফিস করে কথা বলতে পারে। রোগীটি ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগে ভুগছিল। ডাঃ গাঙ্গুলি দেখলেন বিশেষজ্ঞের অভিমত functional paralysis of vocal chord। এই স্বর প্রথম যখন বন্ধ হয় তখন রোগীর ফ্রেনিক নার্ভ-এর উপর অপারেশন চলছিল। বোঝা যায় ভয়ই এই অসাড়তার কারণ।)

স্বরের সার ফিরিয়ে দেওয়ার সম্মোহন-চিকিৎসা চালাতে গিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলি আর এক সত্যকে আবিষ্কার করলেন, সেই সত্যের দিকেই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রোগীটি ছিল পূর্ববঙ্গের এক বড় ব্যবসায়ীর দ্বিতীয় পক্ষের শেষ সন্তান। '৪৬-এর দাঙ্গার পর

ব্যবসা বেশ পড়ে যায়। এই সময় বাবা মারা যান। বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ওকে আলাদা করে দেয়। কয়েক হাজার টাকা ও বিধবা মাকে নিয়ে আলাদা সংসার পাতলেও টাকাগুলোকে ঠিক কেমনভাবে ব্যবসায় খাটানো উচিত ষোল বছরের বালক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মা'য়ের পীড়াপীড়িতে বিয়েও করে ফেলে। মা আর বউকে দেশে রেখে সামান্য যা পুঁজি ছিল তাই নিয়ে এসে হাজির হয় কোলকাতায়। কোলকাতায় এসে ব্যবসা করতে গিয়ে প্রায় সব পুঁজিই লোকসান দিল। দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাসায় এসে ওঠে। সেখানে জোটে শুধু অনাদর। এখানেই একদিন ফুসফুসের যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ল। অনেক তদ্বিরের পর বেসরকারি হাসপাতালে জায়গা পেলেও সঞ্চয়ের শেষ তলানিটুকু এখানেই শেষ হয়ে যায়।

চিকিৎসায় রোগী ভাল হয়। রোগীর দাদারা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গেই আছে শুনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওর দাদাদের চিঠি দেয়। কোনো উত্তর আসে না। তিন তিনখানা চিঠি দিয়েও জবাব না পেয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে জানিয়ে দেন, সুস্থকে আর হাসপাতালে রাখা সম্ভব নয়, এবার বেড খালি করতে হবে। পরদিনই দেখা যায় সুস্থ মানুষটি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গায়ে জ্বর. সঙ্গে কাসি। কয়েকদিন পর এক্সরে করে দেখা গেল ফুসফুসে আবার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

এবার রোগীটির স্থান হল সরকারি উদ্বাস্তু হাসপাতালে। এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করা গেল। বার-বারই রোগী চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হয়ে উঠছে এবং বেড খালি করে দেওয়ার কথা বলার পরই দেখা যাচ্ছে আবার ফুসফুসের পুরনো ক্ষত সক্রিয় হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় অপারেশন করতে গিয়েই এই স্বর নিয়ে বিপত্তি।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বুঝেছিলেন রোগীর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অসহায়তা ও আশ্রয়হীনতার মানসিকতা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে না আনতে পারলে, মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের সহনশীলতা না বাড়াতে পারলে, শুধুমাত্র সম্মোহন-চিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। রোগ মুক্তির পর হাসপাতালের নিশ্চিত আশ্রয় থেকে অনিশ্চিত জীবন সংগ্রামের পথে নামতে হবে ভাবলেই রোগের উপসর্গগুলো আবার হাজির হয়, সৃষ্টি হয় ক্ষত। অনিশ্চয়তার কারণ দূর না করলে রোগের পুনঃআক্রমণের সম্ভাবনা দূর হবে না। সম্মোহন-চিকিৎসার শেষে রোগীর একটা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ছোট একটা সরকারি কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ফল পাওয়া গিয়েছিল হাতে-হাতে। রোগী তার স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধরত সৈনিকদের মধ্যে হিস্টিরিক - অন্ধত্ব ও স্মৃতিভ্রংশের অনেক ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। এদের প্রতিটি অন্ধত্ব ও স্মৃতিভ্রংশ বহিরাগত কোনো কাবণে হয়নি, হয়েছে মস্তিষ্ক-কোষের জন্য। শুধুমাত্র ভ্রান্ত ও বদ্ধমূল ধারণার কথা চিন্তা করাতে পঙ্গু হওয়ার ঘটনাও দেখা গেছে।

'Suggestion' বা 'ধারণা-সঞ্চার' শ্রবণকেন্দ্রের লাগোয়া মস্তিষ্ক-কোষগুলোকে উদ্দীপিত করে। তাদের মাধ্যমে কোষের উত্তেজনা, নিষ্ক্রিয়তা (inhibition) ও বিদ্যুৎ পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রণ করে, দেহগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।'Suggestion' দিয়ে বেদনাবাহী স্নায়ুগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হলে ব্যথা বোধ হয় না। এইভাবেই 'Suggestion' দিয়ে ফোসকা ফেলা, রক্তপাত ঘটানো, রক্তপাত বন্ধ করা বা শরীরে আঘাত সৃষ্টি করা সম্ভব।

কারও কারও এমন কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য থাকা সম্ভব, যাতে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সহজতর হয়। একই ধরনের বা একই মাপের আঘাতে যে বেশি ভয় পায় তার ব্যথা বেশি লাগে ও রক্তপাত বেশি হয়। অপারেশনের ক্ষেত্রেও ভয় পেলে ব্যথা ও রক্তপাত বাড়ে। যে রোগী আপ্রাণ বাঁচতে চায় তার আরোগ্য দ্রুততর হয়। আবার, শুধু চিন্তার প্রভাবেই ঘা সৃষ্টি হতে

পারে। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার জন্যে পেটে অত্যধিক অ্যাসিড নিঃসৃত হয়। দীর্ঘকাল এই রকম চলতে থাকলে ঘা তৈরি হয় ও রক্তক্ষরণ হয়। গ্যাসট্রিক আলসার, কোলাইটিস ও কিছু ক্যান্সার কেবলমাত্র মানসিক কারণেই হয়ে থাকে। ভয় পাওয়া যদিও মানসিক ব্যাপার, কিন্তু, সঙ্গে-সঙ্গে শরীরে তার বিরাট প্রভাব পড়ে। ভয়ে মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, শরীর ঘামে, অনেক সময় পায়খানা বা প্রস্রাবের বেগ দেখা যায়। রাগ হলে রক্তচাপ বাড়ে, চোখ-মুখ রক্তাভ হয়ে ওঠে।

মস্তিষ্কের বিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বা হিস্টিরিয়া রোগীরা বিভিন্ন ধরনের অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সংবেদনশীলতার জন্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই নিজের অজান্তে স্বনির্দেশ (auto-suggestion) পাঠিয়ে 'সমব্যথী-চিহ্ন' বা ওই জাতীয় অস্বাভাবিক সব কাণ্ডকারখানা ঘটিয়ে ফেলেন।

হিস্টিরিয়া, গণ-হিস্টিরিয়া, আত্ম-সম্মোহন, নির্দেশ

হিস্টিরিয়ার আধিক্য সাধারণত অশিক্ষিতদের মধ্যে বেশি। অশিক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্নদের মস্তিষ্কের কোষের নমনীয়তা (elasticity) কম এবং আবেগপ্রবণতা খুব বেশি। ফলে কোনো কিছুই তারা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখতে পারে না। হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর সংখ্যাও কমছে। তবে, নামসংকীর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাবাবেগে চেতনা হারিয়ে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে পড়তে এখনও কিছু-কিছু নারী-পুরুষকে দেখা যায় বইকী।

প্রাচীনকালে গণহিস্টিরিয়া সৃষ্টির বিষয়ে প্রধান ভূমিকা ছিল ধর্মের। এখন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা। ধর্মান্ধতা, আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবোধ, তীব্র প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি অন্ধ আনুগত্য বহুজনের যুক্তি-বুদ্ধিকে গুলিয়ে দিয়ে তীব্র ভাবাবেগে চলতে বাধ্য করে। এই গণহিস্টিরিয়া বা গণসম্মোহনের ক্ষেত্রে সম্মোহন-ঘুম না পাড়িয়েও Suggestion ধারণা সঞ্চারের দ্বারা গভীর প্রভাব বিস্তার করে প্রয়োজনীয় ফল লাভ করা যায়। বিশেষত সাধারণ মানুষ যখন কোনো কারণে ভীত, উত্তেজিত বা ভক্তিরসে আপ্লুত হয় তখন ধর্মগুরু, রাষ্ট্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের Suggestion কিছু-কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব রকম কার্যকর হয়।

আত্ম-সম্মোহন ও স্ব-নির্দেশ (auto-suggestion) যেমন একজন ব্যক্তির নিজের ইচ্ছেয় হতে পারে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তার অজ্ঞাতসারেই সে auto-suggestion দ্বারা নিজেকে নিজে সম্মোহিত করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রেও শারীরবৃত্তি তার স্বাভাবিক নিয়ম মেনে চলে না, অস্বাভাবিক আচরণ করে এবং এই ধরনের আচরণ অস্বাভাবিক হলেও শারীরবৃত্তিরই অংশ।

তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথকে পুজো দেওয়ার জন্য ভক্তরা যখন প্রচণ্ড শীতের মধ্যে মন্দির সংলগ্ন পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন ভক্তি ও বিশ্বাস মস্তিষ্কের কোষগুলোকে ঠাণ্ডা না লাগার জন্য নির্দেশ পাঠায়, ফলে ঠাণ্ডা লাগে না।

এই ভক্তরাই প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুরে আগুন হয়ে থাকা দেবস্থানের সিমেন্ট বা পাথরে ছাওয়া চাতালে খালি পায়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যে তাপ অসহ্য, দেবস্থানে এলে সেই তাপেই কষ্টের কোনো অনুভূতি ভক্তদের মধ্যে দেখা যায় না।

দুটি ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-মাহাত্ম্যের কথা ভেবে ভক্তেরা নিজের অজান্তেই নিজেরা সম্মোহিত হয়ে পড়েন এবং সেইভাবেই তাঁদের মস্তিষ্কের কিছু কিছু স্নায়ুকে auto Suggestion-এর দ্বারা পরিচালিত করেন।

অতীতের এক বিখ্যাত সাধক সম্বন্ধে শোনা যায়, খাবারের সঙ্গে তাঁকে কোনো দুষ্টপ্রকৃতির লোক বিষ খাইয়ে ছিল। বিষ খাওয়ার পরেও সাধকের জীবনহানি ঘটেনি। কী করে এমনটা হল? যুক্তিবাদী হিসেবে ধরে নিচ্ছি কারণ ছিল। এ-যুগে আধুনিক চিকিৎসায় বিষপানের রোগীর পাকস্থলী পাম্প করে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। সেই সাধকও কী তবে আত্ম-সম্মোহন ও স্ব-নির্দেশের দ্বারা বমি করে পাকস্থলীর বিষাক্ত খাবার উগরে দিয়েছিলেন? প্রাচীন এই কাহিনীর সত্যতা কতটুকু তা জানতে না পারলেও এইটুকু বলতে পারা যায়, আত্ম-সম্মোহনের ও স্ব-নির্দেশের দ্বারা বমি করা সম্ভব।

ভাবুন, আপনি খেতে বসেছেন। পরিপাটি করে খাবার সাজিয়ে দিয়েছেন আপনার স্ত্রী। ভাত ভেঙে মাছের ঝোলের বাটিটা ভাতে ঢালতেই টকটকে লাল ঝোলটা ভাতের উপর দিয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল থালায়। মুহূর্তে আপনার মনে পড়ে গেল, ঘণ্টাখানেক আগে দেখা সেই বাসে-চাপা পড়ে মরে যাও লোকটার কথা। তার সারা শরীর বেয়ে এমনি ঝোলের মতোই গড়িয়ে পড়ছিল রক্ত। ঘটনাটা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই আপনার গা গুলিয়ে উঠল। আপনি বমি করে ফেললেন। আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠা দৃশ্য আপনার মস্তিষ্কের সেই স্নায়ুগুলোকে উদ্দীপিত করল, যা বমি নিয়ে আসে। এবার, যখন বমি করা প্রয়োজন তখন যদি আপনি তীব্র ঘৃণা সঞ্চার করে, এমন কোনো দৃশ্য চোখের সামনে জীবন্ত করে ভাসিয়ে রাখতে পারেন, তবে, মস্তিষ্কের বিশেষ স্নায়ুগুলো এমনভাবে উদ্দীপিত হবে, যার দরুন আপনার গা গুলিয়ে বমি এসে পড়বে।

'৮৩-র জানুয়ারিতে এক প্রকাশক বন্ধুর সঙ্গে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলাম একটি বিশেষ কাজে উঠেছিলাম কলাভবনের কাছেই একটি হোটেলে। পৌঁছতে বেশ রাত হয়েছিল। মধ্যরাতে খাওয়ার পাট চুকোলাম ভাত আর হাঁসের ডিম দিয়ে। তারপর, আরও অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল অস্বস্তিতে। আমার হার্টে একটু গণ্ডগোল আছে। সেটাই বেড়ে উঠল ডিম খাওয়ার ফলে উইণ্ডে, বুকে চিনচিনে ব্যথা, বাঁ হাত ঠাণ্ডা, সারা মুখও স্যাঁতসেঁতে ঠাণ্ডা। এই রাত-দুপুরে ডাক্তার চাইলেই পাব কিনা সন্দেহ। বমি করে পেটের খাবার বের করে দিলে ভাল লাগবে। গলায় আঙুল দিয়ে যে বমি করব, তারও উপায় নেই। গলায় একটা ক্ষত আছে, ভারত বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎসাধীন রয়েছি দীর্ঘদিন ধরে। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় আত্ম-সম্মোহন ও স্ব-ধারণাসঞ্চারের সাহায্যে বমি করা। কুকুরের গায়ের এঁটুলি দেখলেই ঘেন্নায় আমার গা শিরশির করে ওঠে, শরীরের বেশ কিছু লোম খাড়া হয়ে ওঠে, গা চুলকোতে থাকে, বমি এসে পড়ে। আমি একান্তভাবে এঁটুলি বোঝাই কুকুরের কথা ভাবতে শুরু করলাম, সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের এঁটুলি দেখলে, আমরা শরীরে যে-সব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হতে থাকে সেগুলো হতে শুরু করল, তারপরই আরম্ভ হল প্রবল বেগে বমি। বমিতে পেট হালকা হতেই শরীরের অসস্তি ও কষ্ট দূর হল।

অনেক সাধু-সন্তদের সম্বন্ধে শোনা যায়, তাঁরা প্রচণ্ড শীতেও খালি গায়ে থাকতেন, যোগ সাধনার ফলে শীত বোধ হত না। অনেক সময় মানুষ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে ঠাণ্ডা বা গরমকে সহ্য করে নেয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়ে গেল, গল্পটি সম্ভবত রস-সাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষের মুখে শুনেছিলাম। একবার কুমারেশদা কনকনে শীতের সকালে পুরুলিয়ার রাস্তায় (বাঁকুড়াও হতে পারে) একটি অনাবৃত গায়ের খাটো ধুতি পরা রাখাল ছেলেকে দেখে

জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী রে, এই শীতে খালি গায়ে তোর কষ্ট হচ্ছে না?"

ছেলেটি উত্তরে বলেছিল, "আপনার মুখটাও তো বাবু খালি রয়েছে, ঢাকেননি, মুখে ঠাণ্ডা লাগছে না?"

সহ্য-শক্তির ব্যাপার ছাড়াও কিন্তু আর একটি ব্যাপার আছে, যার সাহায্যে কেউ কেউ সহ্যাতীত শীত বা গরমকেও আত্ম-সম্মোহনের দ্বারা নিজের সহ্য সীমার মধ্যে নিয়ে আসেন।

একজন সম্মোহনকারী যে সব সময়েই সম্মোহন-ঘুম পাড়িয়ে suggestion দিয়ে থাকেন, তেমন কিন্তু নয়। অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ঘুম না পাড়িয়েও একজনের মস্তিষ্ক কোষে suggestion পাঠিয়ে আশ্চর্য ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। এই ধরনের সম্মোহনের একটি ঘটনা বলছি।

এক সময় ফলিত জ্যোতিষ নিয়ে আমি কিঞ্চিত পড়াশুনো করেছি। পড়ে এবং বাস্তবক্ষেত্রে পরীক্ষা করে স্পষ্টতই বুঝেছি ফলিত জ্যোতিষ নেহাতই একটি চান্সের ব্যাপার, অর্থাৎ মিলতেও পারে, না-ও মিলতে পারে। অনেকেই আমার কাছে ছক বা হাত হাজির করেছে, আমি রাশিচক্র বা হস্তরেখা কোনো জ্যোতিষীর মতো বিচার না করে ইচ্ছেমতো যা খুশি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছি। পুরো ব্যাপারটাই ছিল আমার কাছে খেয়ালখুশির খেলা মাত্র। কখনও উৎসাহ দিতে, কখনও বা সান্ত্বনা দিতে, কখনও বা মনের জোর ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন-মাফিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছি। তবুও অনেক ক্ষেত্রেই অনেক কথা নাকি মিলে গেছে। যদিও আমি জানি, আমার যত ভবিষ্যদ্বাণী মিলেছে, মেলেনি তার বহুগুণ। আর এও জানি, ফলিত জ্যোতিষ ও অলৌকিকে বিশ্বাসী লোকেরা ওই দু-একটি মিলে যাওয়া ভবিষ্যদ্বাণীকেই মনে রাখেন এবং অন্যের কাছে বলার সময় সেটাকেই আরও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলেন, আর, না মেলা কথাগুলো চটপট ভুলে যান। আসলে, ফলিত জোতিষের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসই তাদের এমনটা করতে বাধ্য করে।

আমার প্রতি এমনই এক অন্ধ-বিশ্বাসী হল দমদমের বাঙুর অ্যাভিনিউ নিবাসী প্রবীর সাহা। ঘটনাটি ১৯৫১ সালের। বয়েসে তরুণ প্রবীর একদিন হঠাৎই এসে হাজির হল আমার অফিসে। আমাকে বলা ওর প্রথম কথাটাই ছিল, "প্রবীরদা, আমাকে বাঁচান।"

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার, খুলে বলো তো। আমার যদি সাধ্যে কুলোয় নিশ্চয়ই করব।"

লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত থাকায় আমার পরিচিতির গণ্ডিটা স্বভাবতই বড়। অনেকেই বিভিন্ন প্রয়োজনে অনেক সময় এসে হাজির হয়, অবশ্য অনেক সময়ই অন্যের প্রয়োজন মেটাবার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। প্রবীরকে দেখে ভাবলাম হয়তো কোনো বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে এসেছে।

প্রবীর আমার মুখোমুখি বসে যা বলল তা হল, সম্প্রতি বন্ধুদের সঙ্গে ও একটা পিকনিকে গিয়েছিল, সেই পিকনিকে একটি ছেলে ছিল, যে জ্যোতিষী হিসেবে একটু-আধটু নাম কিনেছে। জ্যোতিষী বন্ধু প্রবীরের ভাগ্য বিচার করে জানিয়েছে, ওর মৃত্যুযোগ খুব কাছেই, মাস কয়েকের মধ্যেই। পিকনিক থেকে ফেরার পর দিনকয়েক জ্যোতিষী বন্ধুর কথাটা মনের মধ্যে খচ্-খচ্ করে বিঁধতে লাগল। শেষ পর্যন্ত একদিন কোলকাতার অন্যতম সেরা জ্যোতিষী ও গ্রহরত্নের প্রতিষ্ঠানে গিয়ে হাজির হল। সেখানকার এক জ্যোতিষীর থেকে যা উত্তর পেল, তাতে বেচারা একেবারে ভেঙে পড়ল। জ্যোতিষীর মতে খুব কাছেই মৃত্যুযোগ। হ্যাঁ, জীবনের পরিধি আর মাত্র মাসকয়েক। এবার বাড়িতে মা-বাবার কাছে দুঃসংবাদটা ভাঙল। মোটামুটি স্বচ্ছল পরিবারের আদরের ছেলে। মা আর দেরি না করে প্রবীরকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর পরিচিত এক তান্ত্রিকের কাছে। তান্ত্রিক খুব একটা ভরসা দিতে পারেননি। অতএব, ও যে এখন মৃত্যুর

মুখোমুখি এই বিশ্বাস নিয়েই ফিরে এসেছে।

দিনকয়েক আগে ডালহাউসি স্কোয়ারে টেলিফোন ভবনের সামনে বাস থেকে নেমে গাড়িতে চাপা পড়া একটা লোকের মৃতদেহ দেখে প্রবীরের গা গুলিয়ে ওঠে। মাথা ঘুরে যায়। ফুটপাতেই বসে পড়ে নিজের পতন রোধ করে। তারপর থেকে ওর সবসময়ই মনে হচ্ছে, এই বোধহয় কোনো দুর্ঘটনা হবে। মৃত্যু যেন ওর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুরছে। ওই বীভৎস মৃত্যুটা দেখার পর থেকে গত ছ'টা রাত এক মিনিটের জন্যেও ঘুমোতে পারেনি।

ঘটনাটা বলে বলল, "আপনি আমাকে বাঁচান, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে আমার হাত-পা কেমন যেন কাঁপে, মাথা ঘোরে। রাতে সকলে যখন ঘুমোয়, আতঙ্কে আমার চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। ক্যামপোস খেয়ে দেখেছি, তাতেও কাজ হচ্ছে না। আমি আর পারছি না। আমাকে আপনার বাঁচাতেই হবে।"

কথাগুলো শেষ করবার আগেই ওর গলা ধরে এল। দেখলাম, ও একান্তভাবে কান্না চাপার চেষ্টা করছে। বেচারা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। অবিজ্ঞান-মনস্ক, বুজরুক জ্যোতিষী আর তান্ত্রিকদের ওপর রাগে সারা শরীর রি-রি করে উঠল। সমাজের বুকে বসে সম্মানের সঙ্গে ওরা প্রবীরকে একটু একটু করে খুন করছে। প্রবীরের মৃত্যু হলে তার জন্য দায়ী ওই সব যুক্তিহীন অপবিজ্ঞানীরা,অথচ কত সুন্দরভাবে ওরা মৃত্যুর জন্য গ্রহদের দায়ী করে ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রের জয়গান গাইবে। এমনিভাবে কত প্রবীর যে ওদের হাতে খুন হয়েছে এবং হবে, তার হিসেব কে বলতে পারে?

প্রবীরকে বললাম, "দুটো হাতই পাশাপাশি মেলে ধরো তো।" মেলে ধরল। হাতের রেখাগুলোর ওপর গভীরভাবে চোখ বোলাবার অভিনয় করলাম। কিছুক্ষণ মাপামাপি করে বললাম, "দিনকয়েকের মধ্যে তোমার পেটে কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, এই পেট খারাপের মতো কিছু?"

প্রবীর সাহা উৎসুক চোখে বলল, "হ্যাঁ, সত্যিই তাই। দিনকয়েক হল পায়খানা হচ্ছে।"

আমার এই সঠিক বলতে পারার পিছনে অলৌকিকত্ব বা হাত দেখার কোনো ব্যাপারই ছিল না। স্নায়ুদুর্বলতার দরুন কয়েকটা রাত ভাল ঘুম না হলে পেট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। আর, এই সম্ভাবনাটুকুর কথাই আমি প্রশ্নের আকারে প্রকাশ করেছিলাম।

আমার এই সামান্য মিলে যাওয়া কথাটাই আমার প্রতি প্রবীর সাহার বিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলল।

এবার ওর ডান হাতের প্রায় অস্পষ্ট একটা রেখাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললাম, "আমার ওপর তোমার বিশ্বাস আছে তো?"

"নিশ্চয়ই। আর, সেই জন্যেই তো বাধ্য হয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।"

এবার কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব আত্মবিশ্বাসের সুর মিশিয়ে বললাম, "তোমার জ্যোতিষ বিচার করতে গিয়ে সকলেই এক জায়গায় মারাত্মক রকমের ভুল করেছেন। আমি তোমাকে বলছি, তুমি বাঁচবেই। তোমার কিছুই হবে না। এই ছোট্ট রেখাটা বলে দিচ্ছে একটা কিছু ঘটার যে সম্ভাবনা ছিল, তা কেটে গেছে। তোমার জীবনের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, তোমার কিছুই হবে না। তবে তোমাকে একটা জিনিস পরতে বলব। পরলে তোমার গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগবে না।"

এবার ও প্রশ্ন করল, "কী?"

বললাম, "একটা পাঁচ-ছ'রতির ভাল মুক্তো সোনায় বাঁধিয়ে আগামী শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার সকালে পরলে হবে। মুক্তোটা দিয়ে আংটি বানিয়ে শোধন করে নিও। আর, এই শুক্লপক্ষ পর্যন্ত

দিনগুলোর জন্যে তোমার ভাল-খারাপের দায়িত্ব আমি নিলাম। আর একটা কথা, বাড়ি ফিরেই ধনে ও মৌরি ভিজিয়ে রাখবে শোবার আগে ওই ধনে-মৌরি ভেজানো জলটা খেয়ে ফেলবে। আজ থেকে তোমার সুন্দর ঘুম হবে, কোনো চিন্তা নেই।

মুক্তোর কথাটা এলোমেলো ভাবে মনে এল বলেই বলে ফেললাম। হীরেআর মুক্তো আমি নিজেও ভালবাসি। আমার নিজের হাতেও হীরে আর মুক্তোর আংটি আছে। প্রবীর সাহার প্রবল জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাসই ওকে একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছিল। এই প্রবল বিশ্বাস এক কথায় ভাঙার চেষ্টা করলে কোনো কাজ হবে বলে আমার মনে হল না। তার চেয়ে এই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস দিয়েই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম, ওর স্নায়ুগুলোকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম।

কাজও পেলাম হাতে-হাতে। পরের দিনই প্রবীর এসে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে খবর দিল, "কাল রাতে ভালই ঘুম হয়েছিল।"

বুঝলাম, আমার Suggestion-এ ভালই কাজ হচ্ছে। এই লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত প্রবীর দিব্যি সুস্থ-সবল হয়ে বেঁচে রয়েছে তিন জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণীকে উপেক্ষা করে। বিয়েও করেছে প্রবীর। কয়েক মাসের বদলে কয়েকটা বছর নিশ্চিন্তে পার হওয়া এবং জ্যোতিষীদের দেওয়া Suggestion থেকে বাঁচার পিছনে রয়েছে এক ধরনের সম্মোহন। এই সম্মোহনের ব্যাপারে দেব-মাহাত্ম্যের মতোই কাজ করেছে আমার প্রতি প্রবীরের অন্ধ-বিশ্বাস।

এবার যে ঘটনাটার কথা বলছি, তার নায়ক আমারই সহকর্মী অরুণ চট্টোপাধ্যায়। থাকে ২৪ পরগণা জেলার পোলঘাট গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন মানিকপুরে। '৭৮-এর পঞ্চায়েতের নির্বাচনে পোলঘাট এলাকা থেকে অরুণ নির্বাচিত হয় নির্দল প্রার্থী হিসেবে। নির্দল হিসেবে জিতলেও ওর গায়ে আছে একটা রাজনৈতিক গন্ধ। ওই এলাকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলের তখন দারুণ রমরমা। ডামাডোলের বাজারে ওই তল্লাটে রাজনৈতিক খুন তখন 'ডাল-ভাত'। অরুণ নতুন বিয়ে করেছে। বউ, একটি ছেলে, মা-বাবা আর ভাই-বোন নিয়ে গড়ে ওঠা সুখের সংসারে হঠাৎই হাজির হল রাজনৈতিক আক্রমণ শঙ্কার কালো মেঘ। বিরোধী আক্রমণের আশঙ্কায় শঙ্কিত অরুণ একদিন আমাকেই মুশকিল আসানের জন্য গ্রহশান্তির ব্যবস্থাপত্র করে দিতে বলল। অরুণের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্টতই আমার ধারণা হয়েছিল ও এবং ওদের পরিবারের সকলেই গভীরভাবে ভাগ্যে এবং জ্যোতিষ বিচারে বিশ্বাসী। ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ পরিবারে যে-পরিবেশে অরুণ এত বড় হয়েছে, আমার শুকনো উপদেশে সেই পরিবেশের সংস্কার এক মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে যাবে না। অথচ, চোরাগোপ্তা খুন হওয়ার চিন্তায় ওর মানসিক ভারসাম্যের যে অভাব দেখতে পেলাম, সেই অভাবটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূর করার প্রয়োজন রয়েছে।

এই মুহূর্তে অফিসের পাশাপাশি চেয়ারে বসে সম্মোহন-ঘুম এনে Suggestion দিয়ে ওর মানসিক জোর ও ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চিন্তা একান্তই অবাস্তব। অথচ, ওর ফলিত জ্যোতিষ-বিশ্বাসকে এই মুহূর্তে যুক্তির কূটকৌশলে ভাঙার চেষ্টা না করে যদি ওর বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই মনোবল বাড়াতে পারি, বিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারি যে, ও খুন হবে না, তবে অরুণের সঙ্গে-সঙ্গে ওর পরিবারের সকলেরও মানসিক ভারসাম্য ফিরে আসবে।

অরুণের হাত দেখে বললাম, "তোর রক্তপাতের কারক মঙ্গল। তুই, ডান হাতে একটা ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম ওজনের তামার বালা পর। বালাটা যে কোনো চেনাসোনার দোকানে বললে বানিয়ে দেবে। কয়েকটা কথা স্পষ্ট মনে রাখবি। (১) বালাটা বানাতে দোকানদার যে দাম চাইবে, সেই দামই দিবি। কোনো দরদাম করবি না। (২) বালাটা শোধন করিয়ে আগামী মঙ্গলবার ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে স্নান করে ডান হাতে পরবি। (৩) বালাটার ওজন কম

হলে কাজ হবে না। কিন্তু বেশি হলে বালাটা পরার পর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাবে, গা প্রচণ্ড গরম হয়ে উঠবে।

সেদিনই বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার স্যাকরার কাছে তামার বালা বানাতে দিয়ে গেল অরুণ। তারপর বোধহয় দিন-দু'য়েক পরেই একদিন আমাকে বালাটা দেখাল। বলল, "ঠিক আছে ?"

বললাম, "বালাটা খাঁটি তামার বটে, কিন্তু এটার ওজন তো মনে হচ্ছে অনেক বেশি। তুই ওজন দেখে নিসনি ?"

অরুণ বলল, "না, নেওয়ার সময় আর ওজন দেখে নিইনি। ঠিক আছে, আজই যাওয়ার পথে দোকান থেকে ওজনটা জেনে যাব। আজ রাতে বালাটা শোধন করে নেব, কালই তো পরবো।"

পরের দিন অরুণ অফিসে এল ঝোড়ো কাকের মতো। বালাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। বালার বাঁকানো, জোড়া না লাগানো মুখের কাছটা এমনভাবে হাঁ হয়ে আছে যে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, বালাটা যথেষ্ট শক্তি ব্যয় করে হাত থেকে তাড়াতাড়ি খোলা হয়েছে।

অরুণ যা বলল, তাতে জানতে পারলাম, কাল সোনার দোকানে বালাটা ওজন করিয়ে দ্যাখে, ওটা প্রায় ৪৫ গ্রামের। রাতে শোধন করিয়ে সকালে পরেছে। তারপর বেরিয়ে পড়েছে অফিসে। ট্রেনে ওঠার পর ওর সারা গায়ে কেমন একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শরীর গরম হয়ে উঠতে থাকে, অসহ্য গরম। সেই সঙ্গে গায়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে, শিরশির করে ওঠে। গোটা শরীরটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়। অরুণের বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই সবই বেশি ওজনের তামা ধারণের ফল। ট্রেনে বালাটা খুলে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার শরীর স্বাভাবিক হয়।

অরুণের এই শরীর খারাপ হওয়ার পিছনে বেশি ওজনের তামার কোনো কার্যকর ভূমিকা ছিল না। গোটা ব্যাপারটাই ছিল মনস্তাত্ত্বিক। আমার কথার উপর অন্ধ-বিশ্বাসের দরুনই এমনটা ঘটেছে। অরুণের মস্তিষ্ক কোষে যে ধারণা আমি সঞ্চার করেছিলাম তারই ফলে অরুণের শরীর এইসব অস্বাভাবিক আচরণ করেছে।

ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর অনুভূতি

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় বহু সাধকদের সম্বন্ধেই প্রচলিত আছে, তাঁরা ঈশ্বরের দেখা পেয়েছেন। যাঁরা ঈশ্বর দেখেছেন বা ঈশ্বরের বাণী নিজের কানে শুনেছেন বলে দাবি করেন, মনোবিজ্ঞানের চোখে তাঁরা মানসিক রোগী মাত্র। ঠিকমতো চিকিৎসা হলে তাঁদের এই ধরনের মানসিক ভ্রান্তি কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাঁরা আবার ফিরে আসতে পারেন সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এই ধরনের ভ্রান্ত অনুভূতিকে বলা হয় 'Illusion', 'hallucination', 'delusion' ও 'paranoia' ইত্যাদি। মনোবিজ্ঞান কিন্তু একজন মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ কিছু কোষকে নিস্তেজ রেখে hallucination (হ্যালুসিনেশন) বা delusion (ডিলিউশন)-এর অবস্থা সৃষ্টি করে ঈশ্বরের দেখা পাওয়া, ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার অনুভূতি তৈরি করতে পারে।

মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জেমস্ ওল্ডস্, সুইজারল্যাণ্ডের প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডঃ ওয়াল্টার হেজ, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ জে· ডেলগাজো সহ বিশ্বের বহু মনোবিজ্ঞানী মানুষের মনে ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বরের কথামৃত শোনার অনুভূতি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

এঁরা প্রমাণ করেছেন বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্নায়ুকোষে উত্তেজনা ও নিস্তেজ অবস্থার সৃষ্টি করে আধ্যাত্মিক অনুভূতি আনা সম্ভব, একই ভাবে সম্ভব প্রেম, ঘৃণা, ভয় ও সাহসের অনুভূতি তৈরি করা।

Illusion (ভ্রান্ত অনুভূতি) : অভিধানে illusion ও delusion এর অর্থ দেওয়া আছে, 'মোহ' এবং 'ভ্রান্তি', কিন্তু মনোবিজ্ঞানে illusion, hallucination ও delusion প্রতিটি কথাই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ বহন করে।

ছবি ২

ছবি ১

ছবি ৩
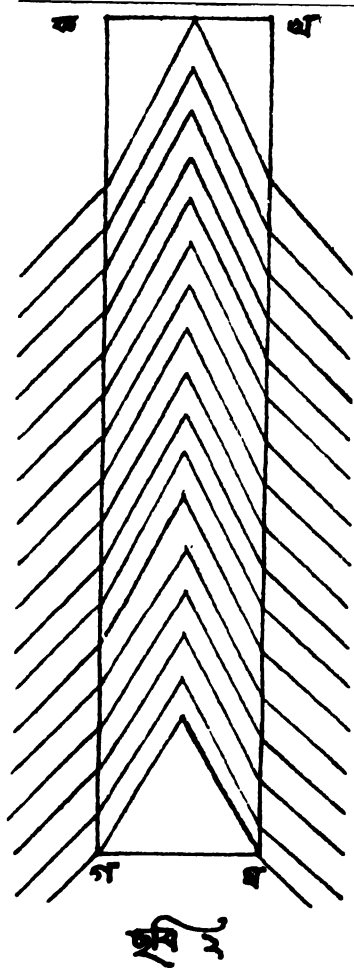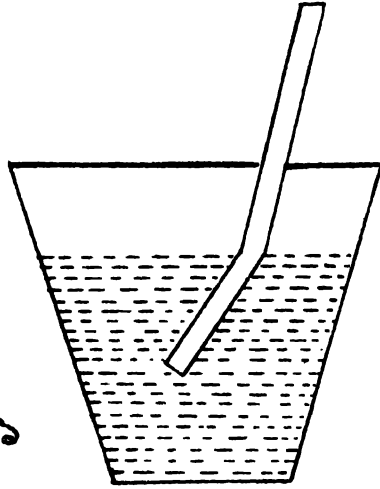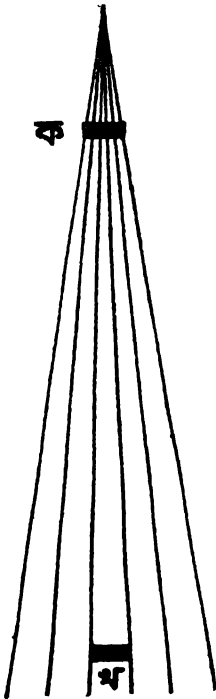
মনোবিজ্ঞানে illusion হচ্ছে, কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে যা, তাকে সেই ভাবে উপলব্ধি না করা। একটা সোজা লাঠির কিছুটা অংশ জলে ডুবিয়ে রাখলে লাঠিটাকে আর সোজা দেখায় না। দেখলে মনে হয় লাঠিটা বেঁকে আছে। আমাদের দর্শনানুভূতি ভুল করছে। ছবি ১

পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিটা দেখুন। 'ক-খ' ও 'গ-ঘ' সরলরেখা দুটির দিকে তাকালে কোনটিকে বড় মনে হয়? নিশ্চয়ই 'ক-খ'? আসলে, দুটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যই কিন্তু সমান। এখানেও আমাদের দর্শনানুভূতি ভুল করছে। ছবি ২

পরের ছবিতে 'ক' ও 'খ' যে দুটো ছোট্ট আয়তকার ক্ষেত্র দেখা যাচ্ছে, এদের মধ্যে 'ক'-কে 'খ'-এর চেয়ে বড় বলে মনে হচ্ছে। অথচ বাস্তবে কিন্তু 'ক' ও 'খ' দুটি আয়তনই সমান, তা সত্ত্বেও আমাদের দর্শনানুভূতি ভুল করছে। ছবি ৩

এই বছরেরই অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহের একটা ঘটনা বলছি। আমার স্ত্রী সুমি চেয়ারে বসে বই পড়ছে। ডাইনিং টেবিলের আর একটা চেয়ারে বসে ছেলে পিংকী মেতে রয়েছে ওর কার্টুন সিরিজ 'বার্ডম্যান' আঁকা নিয়ে। আমি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে রেডিওতে সংকর্ষণ রায়ের বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প শুনছিলাম। সুমি পড়তে পড়তেই একটা চড় বসাল কাঁধে। মুখে বলল, "মশা বেড়েছে।"

একটু পরেই দেখলাম পিংকি উঠে দাঁড়াল। আর, তার একটু পরেই সুমি আবার চাপড় বসাল ঘাড়ের নীচে। পিংকী হো-হো করে হেসে উঠল। সুমি বলল, "দেখলে, তোমার ছেলে কেমন দুষ্টু হয়েছে?

আসল ঘটনা ছিল, পিংকী ওর মায়ের ঘাড়ের নীচে আলতো করে আঁকার তুলিটা ছুঁইয়েছে। তুলির ছোঁয়াকে মশার উপস্থিতি ভেবে সুমি চড় চালিয়েছে। এটা স্পর্শানুভূতির ভ্রান্তি।

মরুভূমিতে অনেক সময় দূর থেকে বালিকেই জল বলে ভুল হয়। এটা দর্শানুভূতির ভ্রমের উদাহরণ।

'৮৪র ডিসেম্বরের শীত শীত সন্ধ্যায় ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে লিখতে বসেছি, হঠাৎ 'ঘেউ-ঘেউ' 'ঘেউ-ঘেউ' একটানা চিৎকারে বিরক্ত হয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরোলাম, কী ব্যাপার হঠাৎ এত কুকুরের চেঁচামেচি? দেখি না 'ঘেউ-ঘেউ' নয়, ভোটের মিছিল বেরিয়েছে, তারাই চেঁচাচ্ছে 'ভোট দিন' 'ভোট দিন'। 'ভোট দিন' শব্দটাই 'ঘেউ ঘেউ' হয়ে আমার কানে পৌঁছচ্ছে। শ্রবণানুভূতিব ভুলে এমনটি হয়েছে।

আপনি হয় তো সকাল বেলায় চায়ের কাপটা নিয়ে ইজিচেয়ারে বসে আয়েস করে খবরের কাগজটা পড়ছেন। পড়ছেন আপনার প্রিয় দলের ফেডারেশন কাপ জেতার বিবরণ, এমনি সময় গিন্নি বাজারের ব্যাগটা নিয়ে এসে হাজির হলেন। বললেন, "আজ কিন্তু চা আনতে হবে। দুশো গ্রামের একটা হলুদ গুঁড়ো আনবে।"

আপনার পড়ায় মন দিতে অসুবিধে হচ্ছে। বললেন, "আর কিছু লাগবে না তো? ঠিক আছে ব্যাগ এখানেই—"

কথা শেষ করতে পারলেন না। লাফিয়ে উঠলেন শিরশিরে এক আতঙ্কে: খোলা কাঁধের উপর কী যেন একটা—বিছে নয় তো? চল্‌কানো চায়ের কাপটা ইজিচেয়ারের সামনে রাখা টুলটায় নামিয়ে রেখে প্রায় লাফাতে লাফাতে ডান হাত দিয়ে কাঁধটা ঝেড়ে ফেলতেই মেঝেতে পড়ল এক টুকরো সুতো। গিন্নির হাত থেকে বা ব্যাগ থেকে কাঁধে পড়েছে। স্পর্শানুভূতির ভ্রান্তিতে আপনি সুতোকেই ভেবেছিলেন বুঝি বিছে।

এই ধরনের ভ্রম স্বাদগ্রহণের অনুভূতি ও ঘ্রাণানুভূতির ক্ষেত্রেও হতে পারে।

পঞ্চেন্দ্রিয়কে ভিত্তি করে ভ্রম বা ভ্রান্তিকে (illusion) পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

১· দর্শনানুভূতির ভ্রম (optical illusion অথবা visual illusion)– ২· শ্রবণানুভূতির ভ্রম (auditory illusion), ৩· স্পর্শানুভূতির ভ্রম (tactile illusion) ৪· ঘ্রাণানুভূতির ভ্রম (olfactory illusion) ও স্বাদগ্রহণের বা জিহ্বানুভূতির ভ্রম (taste illusion)।

Hallucination (অলীক বিশ্বাস) : অভিধানে hallucination কথার বাংলা অর্থ দেওয়া আছে, 'অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস'। অলীক বা অস্তিত্বহীন কোনো কিছু সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করাকেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় hallucination বলা হয়। অতএব, hallucination এর প্রতিশব্দ হিসেবে 'অলীক বিশ্বাস' কথাটাই আশা করি ঠিক হবে।

ধরে নিলাম, রামবাবু পুজো-আর্চা করেন। অফিস যাওয়ার আগে স্নানটি সেরে ঠাকুর পুজো করে খেতে বসেন। সেদিন শনিবার, কালীর ছবিতে অপরাজিতার মালা পরিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করছেন, হঠাৎই দেখতে পেলেন মা কালী ছবি ছেড়ে এক'পা এক'পা করে বেরিয়ে এলেন। Optical hallucination বা Visual hallucination-এর রোগীরা এই ধরনের দৃশ্য দ্যাখেন

সুন্দরী তরুণী সুমনা বিয়ের এক বছরের মধ্যে স্বামীকে হারিয়েছে। স্বামী শ্যামলেন্দু অফিস যাওয়ার পথে স্কুটার অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। শ্যামলেন্দুর ব্যাঙ্কে সুমনা চাকরি পেয়েছে। সহকর্মী ধ্রুবকে ভালই লাগে। ধ্রুবও ওকে চায়, সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হয় না। একদিন ধ্রুব বিয়ের প্রস্তাব দিল সুমনাকে। আর, সেই রাতেই শুতে যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে ক্লিনজিং মিল্ক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতে করতে সুমনা তাকাল ড্রেসিং টেবিলে রাখা শ্যামলেন্দুর ছবির দিকে, আর, অমনি স্পষ্ট শুনতে পেল শ্যামলেন্দুর গলা, "তুমি আমাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে সুমনা ?" Auditory hallucination-এর রোগী এই ধরনের কথা শুনতে পায়।

আমার বন্ধু অমিত সেন-এর বড়দা (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের ভাইপো) সুজিত সেন মারা যান ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ সালে কেদারে। গত বছর একমাত্র সন্তানের আত্মহত্যায় অমিতের বড়দা ও বৌদি খুবই মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন। এবার বেরিয়েছিলেন তীর্থদর্শনে। কেদারের পথে হাঁটতে হাঁটতেই অমিতের বড়দা হার্টে ব্যথা অনুভব করেন। আত্মীয় বন্ধুহীন এই তীর্থযাত্রায় দাদার একমাত্র সঙ্গী বৌদি পাগলের মতোই সাহায্যের জন্য চেঁচাতে থাকেন। এক সময় বৌদি হঠাৎই দেখতে পান এক সন্ন্যাসী ছুটতে ছুটতে আসছেন। মরণপথযাত্রী বড়দার সামনে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসী বড়দার মুখে প্রসাদ ও কমণ্ডলুর জল দিয়ে যেমন এসেছিলেন তেমনি আবার ছুটতে ছুটতে চলে যান। একটু পরেই বড়দা মারা যান। বৌদি আশ্রয় পেলেন এক আশ্রমে। বড়দার শেষ কাজ বৌদিই করলেন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের উপদেশ মতো। সন্ন্যাসীরা এই মৃত্যুকে মহাপুরুষের মৃত্যু হিসেবে ধরে নিয়ে মৃত-দেহ না পুড়িয়ে জলে ভাসিয়ে দিলেন। দু-একদিন পরে বৌদি কেদারনাথকে দর্শন করতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এ কী, এই কী কেদারনাথ ? ইনিই তো সেদিন স্বামীর মুখে জল ও প্রসাদ তুলে দিয়েছিলেন!

অমিতের বৌদি ঈশ্বরে বিশ্বাস, দীর্ঘদিনের সংস্কার, তীর্থক্ষেত্রের ধর্মীয় পরিবেশ, প্রচণ্ড মানসিক আঘাতের আবেগ ও সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক কথাবার্তা এই ধরনের Visual hallucination সৃষ্টি করেছিল।

আমার সহকর্মী মণি দালালের এক আত্মীয় হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করলেন তাঁর বাড়িতে কোলকাতা কর্পোরেশনের যে জল আসে তাতে প্রস্রাবের গন্ধ। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল এর পিছনে

আছেন তাঁরই এক আত্মীয়। বাড়ির লোকজনেরা বোঝালেন, এটা অলীক চিন্তা। ভদ্রলোক কিন্তু বুঝলেন না। তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন, দুষ্টু আত্মীয়টি কর্পোরেশনের লোকজনদের হাত করে প্রস্রাব মেশাচ্ছে।

দীর্ঘদিন আর স্নান করেননি তিনি। অতি সামান্য জল খেতেন এবং সেই জলও নিজেই নিয়ে আসতেন দূরের এক টিউব-ওয়েল থেকে। এটা ঘ্রাণভিত্তিক ভ্রান্তির (Olfactory Hallucination) উদাহরণ।

আমার অফিসের এক বড় অফিসার তাঁর চেম্বারে ডেকে আমাকে বললেন, তাঁর স্ত্রী বোধহয় কোনো তুকতাক করেছে, অথবা কোনো পিশাচ ঘরে ঢুকেছে। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর থেকে পিশাচের গন্ধ পাচ্ছেন। ভদ্রলোক আমাকে একদিন তাঁর বাড়িতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি পিশাচের কোনো গন্ধ না পেলেও তিনি কিন্তু তখনও গন্ধ পাচ্ছিলেন, এটাও একটা ঘ্রাণভিত্তিক হ্যালুসিনেশনের দৃষ্টান্ত।

একদিন আড্ডা দিচ্ছিলাম শিল্পী গণেশ হালুইয়ের সল্টলেকের বাড়িতে। সেই আড্ডায় আমরা দু'জন ছাড়া ছিলেন আর একজন শিল্পী। তাঁর নাম প্রকাশে একটু অসুবিধে থাকায় ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম শ্যামবাবু। শ্যামবাবু শ্রীমার পরম ভক্ত। সঙ্গের ওয়ালেটে সব সময় শ্রীমার ছবি থাকে। একদিন তিনি অসতর্কভাবে রাস্তা পার হতে গিয়ে ডবলডেকার বাসে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যান। সেদিনের আড্ডায় শ্যামবাবুর প্রতিটি কথা আক্ষরিকভাবে মনে না থাকলেও কথার ভাবটুকু আমার স্মৃতিতে জমা পড়ে রয়েছে। শ্যামবাবু মোটামুটিভাবে সেইদিন এই ধরনের কথা বলেছিলেন, বুঝতে পারছিলাম চাপা পড়বই। আর এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। শেষ সময়ে শ্রীমা'কে স্মরণ করতেই ঘটে গেল অলৌকিক ঘটনা। দেখতে পেলাম আমার পাশে শ্রীমা। তারপরই অনুভব করলাম একটা হ্যাঁচকা টান। হুড়মুড় করে চলে গেল বাসটা। দেখলাম আমি বেঁচে আছি। সেদিনের সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার কথা বলতে গেলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

অস্তিত্বহীন শ্রীমার আত্মা উপস্থিত হয়ে শ্যামবাবুকে বাঁচিয়েছেন এবং শ্যামবাবু স্বচক্ষে শ্রীমাকে দেখেছেন এই অলীক চিন্তাই হল দৃষ্টিভিত্তিক হ্যালুসিনেশন।

অতীন মিত্র একটি আধা সরকারি সংস্থায় মোটামুটি ভাল পদেই কাজ করেন। দু'বছর আগে একমাত্র সন্তান রুণা রসগোল্লা খেতে গিয়ে গলায় আটকে মারা যায়। তারপর থেকেই অতীনবাবুর স্ত্রী কোনো মিষ্টি খেতে পারেন না। মুখে দিলেই মনে হয় বিষ তেতো। এটা স্বাদভিত্তিক বা taste hallucination এর নমুনা।

পাভলভের মতে ঘুমের অবস্থায় স্বপ্ন আর জাগ্রত অবস্থায় 'অলীক বিশ্বাস' (hallucination) একই ধরনের শরীরভিত্তিক ব্যাপার। অর্থাৎ বলতে পারি hallucination হল জেগে স্বপ্ন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই hallucination অসুস্থ মস্তিষ্কের ফল। Hallucination ও পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের (chemical stimulus) সাহায্যেও hallucination সৃষ্টি করা সম্ভব। গাঁজা, আফিম L.S.D. ভাঙ, চরস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় মাত্রায় শরীরে গ্রহণ করলেও অনেক সময় তুরীয় আনন্দ, আধ্যাত্মিক আনন্দ, দেবদর্শন বা দেববাণী শোনা যায়। আমার এক পরিচিত তরুণ আমাকে বলেছিল. সে একবার L.S.D. খাওয়ার পর অনুভব করেছিল, তার দেহটা খাটে শুয়ে আছে এবং আত্মা সিলিং-এ ঝুলে রয়েছে।

Delusion (মোহ,অন্ধ ভ্রান্ত ধারণা) Delusion কথার অর্থ যে মোহ তা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। Illusion ও hallucination এর সঙ্গে Delusion (ডিলিউশন) এর

অনুভূতির পার্থক্য রয়েছে।

Delusion রোগীর মধ্যে বদ্ধমূল কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকে। এই যুক্তিহীন ভ্রান্ত ধারণা অসুস্থ মস্তিষ্কেরই ফল। Delusion রোগী ভাবল, সে এমন একটা মন্ত্র প্রায় পেয়ে গিয়েছে, যার সাহায্যে দূরের যে কোনো লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারে।

কেউ হয়তো ভাবতে শুরু করল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, শ্রীকৃষ্ণ তার স্বামী। সে যখন রাতে শোয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার শয্যায় নেমে আসে।

আমাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচিত একটি মেয়ের কথা বলছি। মেয়েটির নাম প্রকাশে অসবিধে থাকায় ধরে নিলাম তার নাম শ্রী। বয়েস বছর ষোলো। দেখতে যথেষ্ট সুন্দরী। মেয়েটির মা আরও অনেক বেশি সুন্দরী। মেয়েটির হঠাৎ বদ্ধমূল ধারণা হল মা ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন, জলে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছেন। ও বাড়ির জল খায় না, আশেপাশের বাড়িতে গিয়ে জল খেয়ে আসে।

আমার এক বন্ধুর স্ত্রী'র অন্ধ বিশ্বাস তার শ্বশুরমশাই পূর্বজন্মে তার উপর পাশবিক অত্যাচার করেছিলেন। বন্ধুর সংসার বলতে নিজে, স্ত্রী, একটি ছোট্ট মেয়ে ও বাবা। বন্ধু অফিসে বেরোলেই ওর স্ত্রী ভয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিত। বাড়িতে সব সময়ের কাজের জন্য একটি মেয়ে ছিল, মেয়েটি কখনও দু-চার দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে গেলে বন্ধু-পত্নীও মেয়েকে নিয়ে চলে যেত বাপের বাড়ি। বন্ধু-পত্নীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, ওর বদ্ধমূল ধারণা, পূর্বজন্মে ওর শ্বশুর ছিলেন আকবর, আর ও ছিল আনারকলি।

রামকৃষ্ণদেব, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন মা কালী বা মা তারা তাঁদের সঙ্গে সব সময় কথা বলছেন, ঘুরছেন, ফিরছেন, দৈনন্দিন কাজকর্মে সাহায্য করছেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁরা নিজেদের মনে করতেন মা কালী বা মা তারারই ছেলে। আজন্মলালিত বিশ্বাসই একসময় বদ্ধমূল ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাস বা delusion এ পরিণত হয়েছে।

আমার এক মধ্যবয়স্ক সহকর্মী আছেন, যিনি delusion -এর রোগী। নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় ধরে নিচ্ছি তাঁর নাম যদুবাবু। যদুবাবুর দৃঢ় ধারণা সহকর্মীরা তাঁর প্রতি সহানুভূতিহীন, হীনচরিত্র ও দুষ্ট প্রকৃতির। সহকর্মীরা নিজেদের মধ্যে কথা বললে যদুবাবু ধরে নেন ওঁরা তাঁর সম্বন্ধেই কথা বলছেন। কোনো দুই সহকর্মী নিজের দিকে তাকালে যদুবাবু ধরে নেন তাঁকে উদ্দেশ করেই ওরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করল। ও কেন আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় সিগারেটের প্যাকেট বের করল? আমার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কেন আমজাদ খাঁ'র গল্প করল এরা? আমি কী ভিলেন? অফিসের বিবেক ঘোষ কেন আমাকে হেমা মালিনীর ছবিওয়ালা ক্যালেণ্ডার দিল? আমি কী লম্পট? আমি সেকশনে ঢুকতেই ওরা সকলে হেসে উঠল। আমি কী ওদের হাসির রসদ? এই রকম নানা ধরনের আত্মপ্রাসঙ্গিক ভ্রান্তি নিজের সঙ্গে জুড়ে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করে রোগী। নির্যাতনমূলক এই delusion রোগী কিন্তু নিজের প্রতিটি ধারণা ও ব্যাখ্যাকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে।

পাভলভের মতে delusion -এর উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রথমত কোষের বিকারগত অনড়ত্ব, আর দ্বিতীয় কারণ হল অতি স্ববিরোধী মানসিক অবস্থা। এই দুটি ব্যাপারই একসঙ্গে বা পর পর ঘটতে পারে। সেই অনুসারে delusion রোগীর উপসর্গেরও কিছু হেরফের হয়।

Paranoia:

'Paranoia' কথাটির অভিধানগত অর্থ 'বদ্ধমূল 'ভ্রান্তিজনিত মস্তিষ্ক বিকৃতি'। বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি করার চেষ্টা না করে একে আমরা বরং বাংলায় 'প্যারানইয়া'ই বলি।

'প্যারানইয়া' রোগী delusion রোগীর মতোই অন্ধ ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয় বটে, কিন্তু প্যারানইয়া রোগী তার এই বিশ্বাসের পিছনে এমন সুন্দর যুক্তি হাজির করতে থাকেন যে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পক্ষেও বিচার করা কঠিন হয়ে পড়ে-উনি মানসিক রোগী অথবা বক্তব্যের যুক্তিগুলো সত্যি ?

ধরুন, মধুবাবু একদিন আপনাকে বললেন তাঁর স্ত্রী ব্যাভিচারে লিপ্ত। শুধু এই কথাটাই বললেন না, তাঁর বক্তব্যের প্রমাণ হিসেবে যে সব ঘটনা ও যুক্তি হাজির করলেন তাতে আপনি প্রাথমিকভাবে হয়তো বিশ্বাসই করতে বাধ্য হবেন, মধুবাবুর স্ত্রী ব্যাভিচারে লিপ্ত। মধুবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়ার সুবাদে আপনি আপনার পরিচিত প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগালেন, নিজেও লেগে পড়লেন বন্ধুকে নষ্টা স্ত্রীর হাত থেকে বাঁচাতে। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলেন বন্ধুর প্রতিটি সন্দেহ ভিত্তিহীন।

নিজের ভুল বিশ্বাসকে যুক্তিসহ হাজির করার প্রচেষ্টাই প্যারানইয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য। নিজের ওই বিশেষ ভ্রান্ত বদ্ধমূল বিশ্বাসের বাইরে প্যারানইয়া রোগীকে পুরোপুরি সুস্থ ও স্বাভাবিক মনে হয়।

এবার এক সুন্দরী রমণীর কথা বলছি। নাম প্রকাশে অসুবিধে থাকায় এখানে তাঁর নাম দিলাম রাধা। রাধা শুধু সুন্দরীই নন, যথেষ্ট গুণীও। স্বামী, ধরা যাক নাম তার সত্য, সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত। রাধার বদ্ধমূল ধারণা সত্যর চরিত্র ভাল নয়। সুযোগ পেলেই আত্মীয়-অনাত্মীয়, কুমারী, সধবা, বিধবা, যে কোনো বয়েসের মেয়ের সঙ্গেই ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে যান সত্য। এই বিষয়ে রাধা যে সব যুক্তি হাজির করেন, যে-সব ঘটনার অবতারণা করেন, সে-সব শোনার পর রাধার বান্ধবীদের অনেকেরই ধারণা সত্য একটি প্লে-বয়।

বেচারা সত্যকে রাধার তৈরি যুক্তি-তর্কের কালি মেখেই থাকতে হচ্ছে।

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের মতে প্যারানইয়া রোগীর গোপন মনে হীনমন্যতাবোধ বা পাপবোধ লুকিয়ে থাকার দরুন সে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে এবং ধীরে-ধীরে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি খাড়া করতে থাকে।

পাঁচ

পীঠস্থান ও স্থান মাহাত্ম্য রহস্য

আদ্যা'মা রহস্য

দক্ষিণেশ্বরের কাছে আদ্যাপীঠের মন্দির ভারতীয় এবং হিন্দুদের কাছে এক পবিত্র মন্দির। বহু বাড়িতেই আদ্যামারূপী কালীমূর্তির ছবি যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে পূজিত হয়। কথিত আছে, আদ্যামায়ের স্তব পাঠ করলে অনেক মুশকিলের অবসান হয়। আদ্যাস্তবেই বলা হয়েছে, তিন পক্ষকাল আদ্যাস্তব শ্রবণ করলে অপুত্রার পুত্র হয়। দু'মাস শুনলে বন্ধন মুক্তি ঘটে (জেল থেকে খালাস পেতে অপরাধীরা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)। মৃতবৎসা দু'মাস স্তব শ্রবণে জীববৎসা হয়। ঘরে লিখিত স্তব রেখে দিলে অগ্নি এবং চোরের দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে না (সরকারি উদ্যোগে কয়েক কোটি স্তব ছাপিয়ে প্রতিটি পরিবারপিছু একটা করে বিলি করলে আর অহেতুক ফায়ার ব্রিগেড পুষতে হয় না, পুলিশের উপরেও চাপ কমে। অন্ততঃ ব্যাঙ্কগুলো চোর-ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে আদ্যাস্তবের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন)।

আদ্যামায়ের এই কালীমূর্তি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিলেন কোলকাতার ইডেন গার্ডেনে। সালটা সম্ভবত ১৯২৮। শ্রীঅন্নদা ঠাকুর নাকি স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন যে, আদ্যাকালী গঙ্গার তীরে ইডেন গার্ডেনে হাজার হাজার বছর ধরে মাটির তলায় বন্দিনী হয়ে রয়েছেন। এবার মা তাঁর বন্দীদশা কাটিয়ে মেদিনী ভেদ করে উঠবেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে শ্রীঅন্নদা ঠাকুর ইডেনে গেলেন, সেখানেই পেলেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে-আসা আদ্যাকালীকে। সেই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হল দক্ষিণেশ্বরের কাছে আদ্যাপীঠের মন্দিরে। এরই মধ্যে কিছু লোক সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে, মূর্তিটি আদৌ হাজার হাজার বছর ধরে ইডেনে ছিল না। দু-এক দিন আগে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল, আর মূর্তির তলায় ঢালা হয়েছিল বস্তাখানেক শুকনো ছোলা। ছোলাতে জল ঢেলে মাটি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। শুকনো ছোলা জল পেয়ে ফুলতে শুরু করে। প্রচুর ছোলা ফুলছে, আয়তন বাড়ছে, অতএব আশেপাশে চাপও বাড়ছে, গর্তের চারপাশে চাপ বাড়লেও শক্ত মাটিতে কিছুই করারও উপায় নেই। স্বাভাবিক কারণেই ছোলার উপর চাপানো মূর্তিটিকে ঠেলে ছোলাগুলো নিজেদের জায়গা বাড়িয়েছে। তাই মূর্তিও একটু একটু করে মাটি ঠেলে উপরে উঠেছে। অন্য মতে মূর্তিটা পাওয়া গিয়েছিল ইডেন গার্ডেনের জলাশয়ে।

আদ্যামায়ের ভক্তেরা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেন, কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন কালীমূর্তিটি ওঠার পিছনে কোনো চাতুরী নেই, এ-সবই মায়ের অলৌকিক লীলা মাত্র।

এগিয়ে এলেন বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আদ্যাপীঠের কালীবিগ্রহ দেখে ও পরীক্ষা করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, এই মূর্তি সম্প্রতি তৈরি করা হয়েছে। একে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন বলাটা নিছক মূর্খতা।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে বহু সাধারণ মানুষ এই ধরনের ছলনায় ও চতুরতায় ক্ষিপ্ত হলেন। সাধারণের রোষ থেকে বাঁচতে মায়ের প্রধান ভক্তেরা আদ্যামূর্তি বিসর্জন দিলেন গঙ্গায়।

এরপর বেশ কিছু বছর আদ্যামায়ের মন্দির বিগ্রহ-শূন্য থাকার পর বর্তমানের আদ্যামূর্তিটি তৈরি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনা অবশ্য বহুবার বহু জায়গায় ঘটেছে। কেউ স্বপ্ন দেখে মাঠে গিয়ে খুঁজে পান স্বপ্নের দেবমূর্তিকে, কেউ দেব মূর্তিকে আবিষ্কার করেন গোরু খুঁজতে গিয়ে। দ্যাখেন গোরু একটা মূর্তির কাছে দাঁড়িয়ে আছে, গোরুর বাঁট থেকে আপনা-আপনি দুধ
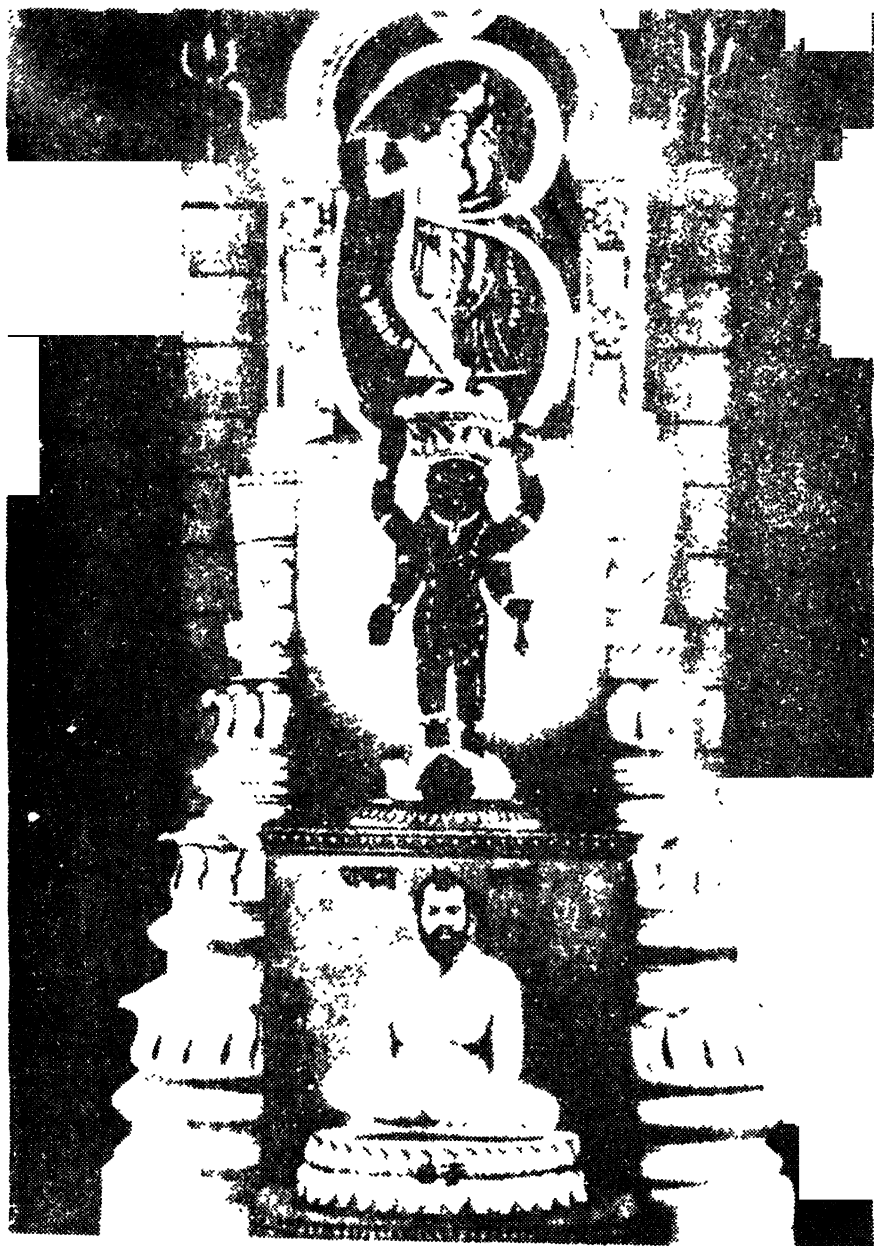
মাঝে আদ্যা মূর্তি

ঝরে পড়ছে : কেউ নতুন কাটা পুকুরে আবিষ্কার করেন দেবমূর্তি, কেউ স্বপ্নের দেবতাকে খুঁজে পান জলের বা মাটির তলায়। দেবমূর্তি আবিষ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় প্রচার। স্বপ্নে পাওয়া দেবতার সঙ্গে দু-একটা অলৌকিক ঘটনা জুড়ে দিতে পারলে তো কথাই নেই, অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই একে একে এসে পড়বে দেব-পূজারীর হাতে।

মানুষের দুঃখকষ্ট, অসহায়তা ও মানসিক দুর্বলতার পরিণতিতে এসেছে ঈশ্বর-বিশ্বাস। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেনি, মানুষই সৃষ্টি করেছে ঈশ্বর।

ধর্মের নামে লোক ঠকাবার উপদেশ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও আছে

সাধারণ মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অলৌকিকত্ব আরোপ করে আখের গোছানোর ধান্দা পৃথিবীর ইতিহাসে অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। ভারতবর্ষও এর বাইরে নয়। ২২০০ বছর আগে ভারতবর্ষে ঈশ্বরের নামে লোকঠকানো যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' তার উল্লেখ পাই। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য তাঁর বর্ণাশ্রম নীতি রক্ষার জন্য 'অর্থশাস্ত্রের' পঞ্চম অধিকরণের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কিছু উপায় বর্ণনা করেছেন। কৌটিল্য বর্ণিত নীতি ও উপদেশগুলো নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাবেন কী প্রচণ্ড মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রজাশোষণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

"কোনো প্রসিদ্ধ পূণ্যস্থানে ভূমি ভেদপূর্বক দেবতা নির্গত হইয়াছেন এই ছলে সেখানে রাত্রিতে বা নির্জনে একটি দেবতার বেদী স্থাপন করিয়া ও এই উপলক্ষ্যে উৎসবাদি ও মেলা বসাইয়া সেই স্থানে শ্রদ্ধালু লোকের প্রদত্ত ধন দেবতাধ্যক্ষ গোপনে রাজসমীপে অর্পণ করিবেন।" (কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, ৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়, ৯০ তম প্রকরণ)।

'দেবতাধ্যক্ষ' কথাটি লক্ষ্য করুন। সেনাদের দেখার দায়িত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর উপর থাকত তাঁকে বলা হত সেনাধ্যক্ষ। তেমনি, দেবস্থান অর্থাৎ মন্দির এবং পুরোহিত ও পণ্ডিতদের দেখাশুনোর দায়িত্ব যাঁর উপর থাকত তাঁকে বলা হত দেবতাধ্যক্ষ। এই দেবতাধ্যক্ষ কাজ চালাতেন তাঁর অধীন পণ্ডিতকুল ও পুরোহিতকুলের সাহায্যে।

ওই গ্রন্থের ৯০তম প্রকরণে আরও বলা হয়েছে, "দেবতাধ্যক্ষ ইহাও প্রচার করিতে পারেন যে, উপবনে একটি বৃক্ষ অকালে পুষ্প ও ফলযুক্ত হইয়াছে এবং ইহা হইতেই সেখানে দেবতার আগমন নিশ্চিত হইয়াছে।"

"সিদ্ধপুরুষের বেশধারী গুপ্তচরেরা কোনো বৃক্ষে প্রতিদিন এক-একটি মানুষ ভক্ষনার্থ করব্রূপে দিতে হইবে—এই মর্মে রাক্ষসের ভয় উৎপাদন করিয়া পৌর ও জনপদজন হইতে বহু টাকা লইয়া সেই ভয়ের প্রতিকার করিবে ; অর্থাৎ রাক্ষস-ভয়ে স্ব-জীবনার্থ প্রদত্ত টাকা রাজাকে গোপনে অর্পণ করিবে।"

অর্থাৎ, প্রজাদের শোষণ করার জন্য চাণক্য শুধু দেবতাদেরই সৃষ্টির কথা বলেননি, ভূত বা রাক্ষস সৃষ্টির কথাও বলেছেন। রাক্ষসের ভয় দেখিয়ে তারপর রাক্ষস তাড়াবার নাম করে অর্থ আদায়ের এই পন্থা বাইশশো বছর পরে আজও তেমনই রয়েছে। আজও ভারতবর্ষের বহু প্রান্তে ভূত ধরা ও ভূত তাড়ানোর নানা অলৌকিক (?) খেলা সমানে চলেছে।

৫ম অধিকরণ, ২য় অধ্যায়ের ৯০ তম প্রকরণে আরও রয়েছে, "দেবতাধ্যক্ষ দুর্গের ও রাষ্ট্রের দেবতাগণের ধন যথাযথভাবে এক স্থানে একত্রিত রাখিবেন এবং সেইভাবে রাজাকে আনিয়া দিবেন।"

ধর্মের নামে সুন্দর ব্যবসা ফেঁদে বসাতে হবে এবং সাধারণকে দোহন করে রাজকোষ বাড়াতে হবে। রাজকোষ বাড়াবার জন্যে ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যেই চাণক্য পুরোহিতদের কাজে

লাগাবার কথা উল্লেখ করেছেন।

একালের মতোই সেকালেও কিছু যুক্তিবাদী লোক ছিলেন, যাঁরা 'সকলেই যা মেনে নিয়েছে তাই সত্য' এই যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না, রাজা, পুরোহিত বা প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন বলেই কোনো কিছুকে যুক্তি দিয়ে বিচার না করেই মেনে নিতে হবে। তাঁরা সর্বযুগের যুক্তিবাদীদের মতো সব কিছুকেই যুক্তি দিয়ে বিচার করতেন এবং তারপরই সেটা মেনে নিতেন অথবা বর্জন করতেন।এই সব যুক্তিবাদীরা শাসক, পুরোহিত, পণ্ডিতসমাজ ও ধনীদের পক্ষে ছিলেন যথেষ্টই বিপজ্জনক। মানুষকে দুর্বল, অসহায় ও ঈশ্বর-নির্ভর করে তোলার পক্ষে এই সব ঈশ্বরে শ্রদ্ধাহীন যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন যথেষ্ট বাধা স্বরূপ। এঁদের সম্বন্ধে চাণক্যের উপদেশ হল, "যাহারা অশ্রদ্ধালু, তাহাদিগকে ভোজন ও স্নানাদি-দ্রব্যে স্বল্পমাত্রায় বিষ মিশাইয়া মোহিত করিয়া 'ইহা দেবতার অভিশাপ' বলিয়া প্রচার করিবে।"

চাণক্যের এই শিক্ষা এখনও কিছু-কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলেন। কথাটা আমি কিন্তু কথার-কথা হিসেবে বলছি না, এটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য। আমি এই ধরনের একাধিক মহাত্মাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি ও জানি। বিনা শ্রমে, বিনা মেধায় কয়েকটা জাদু কৌশল দেখিয়ে প্রচারে বাজিমাৎ করে যে-সব বাবারা আজ অন্যায়ভাবে অর্থ, সম্মান ও প্রভাবের চূড়োয় বসে রয়েছেন, তাঁদের সেখান থেকে ঠেলে ফেলতে গেলে সেই সব সমাজবিরোধী যে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শেষ লড়াই চালাবেন এবং অসুর শক্তির প্রয়োগ করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক।

এই সব সমাজবিরোধী ধর্মগুরু ও শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ শাসকরা সব সময়ই চাইবেন সাধারণ মানুষ, শোষিত মানুষ যেন তাদের দারিদ্র্যকে ধনীদের শোষণ মনে না করে এই সব তাদেরই পূর্বজন্মের কর্মফল বলে মেনে নেন। ধনীদের স্বার্থে, শাসকদের স্বার্থে, পুরোহিতদের স্বার্থে তৈরি হল ভাববাদ দর্শন। ভাববাদ নিয়ে এল জন্মান্তরবাদকে। বলল,এই সবই পূর্বজন্মের কর্মফল। হাত ধরাধরি করে এল ফলিত জ্যোতিষ। বলল, সবই বরাত। সাধারণ মানুষ সুবিধাভোগীদের অসত্য ভাষণকেই সত্য বলে মেনে নিল। শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে চরম অন্যায় ও দারিদ্র্যকে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেনে নিয়ে বলতে লাগল, "এই সবই আমার পূর্বজন্মের কর্মফল। না হলে এমনটা হবে কেন ? আমারই বরাতটা খারাপ, না হলে আমার বউ রাজার নজরে পড়ে যাবে কেন ?" অথবা বলল, "আমার ভাগ্যটাই খারাপ, নতুবা এম·এ· পাশ করে দশ বছর ধরে বেকার বসে রয়েছি কী এমনি ?" "কী ভাগ্য মেয়েটার, এত সুন্দর স্বামী পেয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যে সইল না। নইলে বছর না ঘুরতেই ভেজাল ওষুধে ওর স্বামী মরবে কেন ?" ভাববাদীরা ও ধর্মগুরুরা কী সুন্দরভাবে জন্মান্তর ও ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সমস্ত রকম সামাজিক অবিচারকে মেনে নেওয়ার নেশায় মাতিয়ে দিলেন জনসাধারণকে। ধনীদের ও প্রধানত রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই গড়ে উঠেছিল সেকালের বিখ্যাত মন্দিরগুলো, যেগুলো আজও লক্ষ-কোটি ভক্তদের আকর্ষণ করে ও আদায় করে প্রণামী। প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু মন্দির আজও ভারতের বিখ্যাততম ধনীদেরও ঈর্ষা জাগাবার মতো সম্পদের অধিকারী। এক-একজন ধর্মগুরুর সম্পদ দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পপতিদের সম্পদকেও হার মানায়। কুচো-কাচা এক-একজন গুরুও যে বিশাল সম্পদের অধিকারী হয়ে বসে থাকেন, তাতে অনেকেই যে বিদ্যার বদলে অ-বিদ্যার দিকে আকর্ষিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কী ?

কখনও ধান্দাবাজ, প্রবঞ্চক ধর্মগুরুরা কখনও বা সরলমতি মানসিক রোগগ্রস্ত গুরুরা সাধারণ মানুষকে অস্তিত্বহীন ঈশ্বরের কথা বলে,

অন্নদাঠাকুর

আধ্যাত্মিক চেতনার কথা বলে, কখনও বা যুগোপযোগী সমাজসংস্কারের ফাঁকা বুলি কপচিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত জগতের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মানসিক রোগী তৈরি করছে।

সোমনাথ মন্দিরের অলৌকিক রহস্য

সোমনাথ মন্দিরের কথা প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পেরোনো সকলেরই জানা। বিশ্ববিখ্যাত সেই মন্দিরের বিপুল ধনরত্ন একাদশ শতাব্দীতে লুণ্ঠন করেছিলেন গজনীর সুলতান মামুদ। সোমনাথ মন্দিরের শুধু ঐশ্বর্যই সুলতানকে আকর্ষণ করেনি, আকর্ষণের আর একটি প্রধান কারণ ছিল মন্দিরের বিগ্রহের অলৌকিকত্ব।

সোমনাথ মন্দিরের দেবমূর্তির অলৌকিকত্বের কথা যুগ-যুগ ধরে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেব-বিগ্রহ কোনো বেদীতে বসানো ছিল না। বিগ্রহ অবস্থান করতেন মন্দিরের মাঝখানে শূন্যে। শূন্যে ভাসমান সোমনাথদেবকে দর্শনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে বহু কষ্ট স্বীকার করেও হাজির হতেন লক্ষ লক্ষ ভক্ত। অলৌকিকের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ। চাক্ষুষ অলৌকিক শক্তির প্রকাশ এবং জাগ্রত দেবতাকে দেখার সুযোগ কে-ই বা অবহেলায় নষ্ট করবে? কে-ই বা জীবন্ত দেবতাকে দেখে সব পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অক্ষয় স্বর্গবাসের সুযোগ নেবে না? ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে লক্ষ-কোটি ভক্ত দর্শক এসেছেন এবং দেবতার অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্ব দেখে নিজেদের সাধ্যমতো প্রণামী উজাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। দীর্ঘ বছরের সঞ্চয়ে মন্দিরে জমে উঠেছিল কুবেরের ঐশ্বর্য।

শূন্যে ঝুলন্ত দেবমূর্তির অসাধারণত্ব সুলতান মামুদকে আকর্ষণ করে। মামুদ শুধু মন্দিরের ধনরত্ন লুঠ করেই বিরত হননি। তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেবমূর্তির শূন্যে ঝুলে থাকার কারণ জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে আসা বিজ্ঞানী, ধাতুবিদ ও বাস্তুকারদের নিয়ে মূর্তিটি পরীক্ষা করিয়ে দেখেন যে ওটি লোহার তৈরি। বিশেষজ্ঞরা আরো মত প্রকাশ করেন যে সম্ভবত মন্দিরের দেওয়ালের চারপাশে চুম্বক-পাথর বসানো আছে। এমন করে চুম্বক-পাথর বসানো হয়েছে, যাতে, লোহার মূর্তিটি মাঝামাঝি একটা জায়গায় এনে ছেড়ে দিলে বিভিন্ন প্রান্তের চুম্বক-আকর্ষণে শূন্যে ভেসে থাকছে।

সুলতান মামুদের নির্দেশে দেবমূর্তিকে আবার শূন্যে স্থাপন করা হল। তারপর, তাঁর লোকজনদের মন্দিরের দেওয়ালে লাগানো পাথরগুলো আস্তে আস্তে খুলে ফেলতে বললেন। এক পাশের দেওয়ালের পাথর একটি একটি করে খুলে ফেলতেই খুলে এল এক পাশের চুম্বক-পাথর বা ম্যাগনেটাইট। দেবমূর্তি শূন্য থেকে পড়ে গেল মাটিতে। অলৌকিক দেবমূর্তির রহস্যভেদ হল, বোঝা গেল শূন্যে দেবতার বদলে এক টুকরো লোহা রাখলেও ভাসত। মন্দিরের পুরোহিতরা এবং কোনো ধাতুবিদ বাস্তুকার তাঁদের জ্ঞানের অপপ্রয়োগ করে শুধু লোক ঠকিয়ে বিপুল অর্থ ও সমীহ আদায় করেছিলেন।

মামুদ তথাকথিত অলৌকিক কিছু দেখেই যুক্তিহীন হয়ে পড়েননি বলেই প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন হয়েছিল। নতুবা আরও কত শত বছর ধরে সোমনাথ মন্দিরের লোক ঠকানোর রমরমা ব্যবসা চলত, তা কে জানে। হয়তো আমাদের দেশের নেতারা নির্বাচনের আগে সোমনাথের আশীর্বাদ নিতে দৌড়তেন। সাধারণ মানুষ অসাধারণদের অনুসরণ করে ভিড় বাড়াতেন।

প্রাচীন মিশরের ধর্মস্থান রহস্য; Physics for entertainment; Ya. Perelman; Vol. 1, Mir Publishers, Moscow -এ প্রাচীন মিশরের ধর্মস্থানের এক সুন্দর অপকৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন মিশরের এক বিখ্যাত ধর্মস্থান একটি বিশেষ অলৌকিকত্বের জন্য

বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। দেবালয়ের মূল কক্ষের দরজা ছিল দুটি। একটি ছিল প্রধান দরজা, যার বাইরে অগণিত ভক্ত অপেক্ষা করতেন দেব-মাহাত্ম্যে দরজা খুলে যাওয়ার অপেক্ষায়।

দ্বিতীয় ছোট দরজাটি ছিল পুরোহিতদের যাতায়াতের জন্য নির্ধারিত সময়ে পুরোহিত মূল কক্ষে প্রবেশ করে একটা যজ্ঞবেদীতে অগ্নিসংযোগ করতেন। মঞ্চের আগুনে ফেলতেন সুগন্ধী ধূপ সঙ্গে চলত মন্ত্রপাঠ। কক্ষের বাইরে অপেক্ষমান ভক্তেরা শুনতেন সেই অলৌকিক মন্ত্রোচ্চারণ। কিছুক্ষণ চলার পর ভক্তেরা সবিস্ময়ে দেখতেন দরজা একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে। অথচ না, দরজার দু'পাশে কেউ কোথাও নেই। দরজায় নেই কোনো দড়ি বাঁধা, যে দড়ি টেনে থিয়েটারের স্ক্রিন টানার মতো করে কেউ দরজা খুলবে। কক্ষে একমাত্র লোক পুরোহিত, তিনি গভীর মনযোগের সঙ্গে যজ্ঞের আগুনে ধূপ ফেলে মন্ত্র পড়ে চলেছেন। যজ্ঞবেদীতে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। না, কোনো কৌশল নেই। সবটাই অলৌকিক।

প্রাচীন মিশরের এই অলৌকিকত্বময় ধর্মস্থানের আসল রহস্য জানতে পারি প্রাচীন গ্রীসের গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ আলেকজান্দ্রিয়া হেরোর উল্লিখিত যান্ত্রিক কৌশল থেকে।

ধর্মস্থানের মূল কক্ষের যজ্ঞবেদীটি হত ফাঁপা ও ধাতুর তৈরি। বাকি কলাকৌশল ছিল পাথরের মেঝের তলায়। ফাঁপা যজ্ঞবেদী থেকে একটা নল চলে যেত একটা জল-পাত্রে। জল-পাত্র থেকে একটা নল যেত ঝুলন্ত একটা বালতির মুখে। প্রধান দরজার পাল্লার নীচে পাল্লার সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় মেঝের তলায় লুকোনো থাকত দুটি খুঁটি। এই খুঁটি দুটির সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হত বালতিটা।
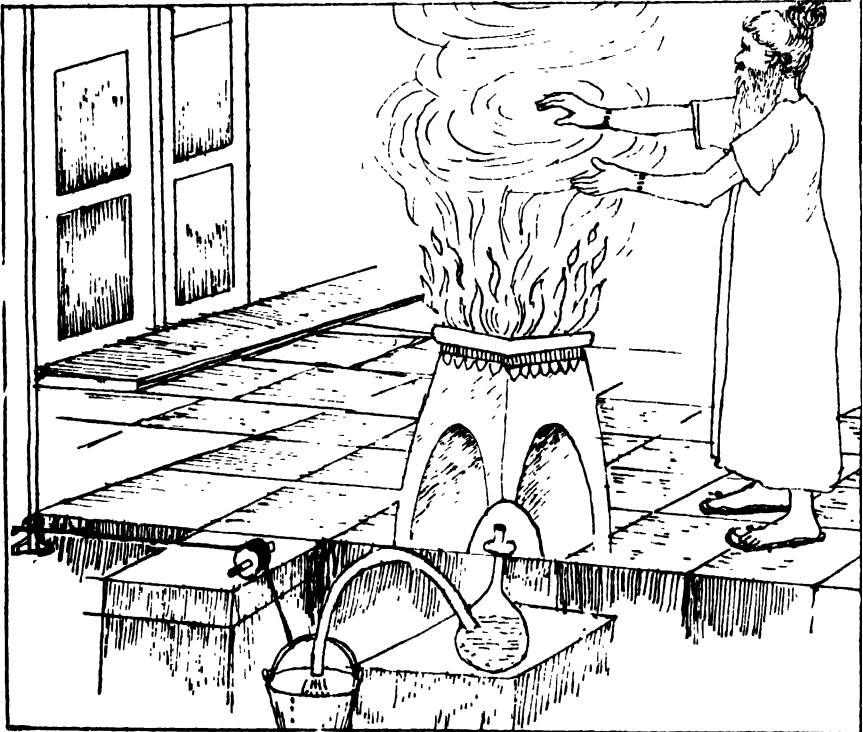
বেদীতে আগুন জ্বললে বেদীর ভিতরের বাতাস গরম হয়ে আয়তনে বেড়ে ক্রমাগত চাপ বাড়াতে থাকবে বেদীর নীচে রাখা জল-পাত্রের উপরে। জলের মধ্যে সেই চাপ সঞ্চারিত হয়ে নল দিয়ে একটু একটু করে জল বের করে এনে ঝুলন্ত বালতিতে ফেলবে। বালতিতে বাঁধা দড়িতে টান পড়বে। ঘুরবে দড়িতে বাঁধা খুঁটি, সেই সঙ্গে ঘুরবে দরজার পাল্লা।

এমনি করেই বারবার বিজ্ঞানের জ্ঞান ও কৌশলকে কাজে লাগিয়ে প্রবঞ্চক পুরোহিত ও গুরুরা ঈশ্বরের কৃপা প্রাপ্ত অলৌকিক ক্ষমতাবান বলে নিজেদের প্রচারিত করে অথবা নিজের মন্দিরকে অলৌকিকত্ব আরোপ করে জনসাধারণকে ঠকিয়ে শুধু দোহনই করেছে এবং সাধারণের কাছ থেকে ঘৃণার পরিবর্তে আদায় করেছে অন্ধ ভক্তি, অন্ধ বিশ্বাস, ভয় ও অর্থসম্পদ।

কলকাতায় জীবন্ত শীতলাদেবী ও মা দুর্গা

১৯৫৮-৫৯ সাল নাগাদ আমাদের কোলকাতার বুকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোড ও রূপনারায়ণ নন্দন লেন-এর মোড়ে শীতলা মন্দিরের শীতলামূর্তি হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠলেন। মায়ের চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল জল, মা কাঁদছেন। অন্ধ ভক্তের অভাব হল না। প্রণামীর টাকায় ঘন-ঘন থালা ভরে উঠতে লাগল। শহর কোলকাতায় ঘটনাটা এতই উত্তেজনা, ধর্মোন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল যে, পত্রিকাতেও খবর বেরিয়ে গেল। কিছু যুক্তিবাদী অনুসন্ধিৎসু লোক কার্যের পিছনে কারণটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেই মা শীতলার পুরোহিত ব্যবসা গুটোল।

মাত্র বছর কয়েক আগে দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোডের ২৩ পল্লীর দুর্গাপুজো নিয়ে কলকাতা তথা সারা বাংলাদেশে কম হৈ-চৈ হয়নি। দুর্গাঠাকুর বিসর্জন দিতে গিয়ে দেখা গেল মা কাঁদছেন। মা বিদায় নিতে কাঁদছেন, অতএব বিসর্জন হয় কী করে? বিসর্জন বন্ধ রইল। সারা শহর তোলপাড়, পত্রিকায় খবর পড়ে ঈশ্বরে ও অলৌকিকে বিশ্বাসীরা নতুন প্রেরণা পেলেন। কলিযুগেও তবে আবার মায়ের আবির্ভাব হল।

প্রতিদিনই কাতারে কাতারে লোকের ভিড়। মা দুর্গার চোখের জল আর শুকোয় না, বিসর্জনও হয় না। একটু একটু করে রহস্যের পরদা উঠল, ব্যাপারটা নাকি পুরোপুরি জমি দখলের চক্রান্ত। উদ্দেশ্য, বেদখল জমিতে পাকাপাকি একটা মন্দির তৈরি। ঘটনাটা ফাঁস হতেই অলৌকিক খেলা সাঙ্গ করে মা দুর্গাকে বিসর্জন দেওয়া হল।

জব্বলপুরে জীবন্ত দুর্গা

মা দুর্গাই আবার সারা দেশের খবর হয়ে দাঁড়ালেন, এবারের ঘটনাস্থল জব্বলপুর। সাল ১৯৫২। ২৯ অক্টোবর ভেড়াঘাটে নর্মদা নদীতে শ্রীভবানী মণ্ডল দুর্গোৎসব কমিটির দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হল, জলে ফেলতে প্রথমে দুর্গা প্রতিমা ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল কিছুটা দূরে, নর্মদার ডান তীরে প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যেও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দুর্গা প্রতিমা। প্রতিমা তীব্র স্রোতকেও উপেক্ষা করে অনড় হয়ে রয়েছেন। নর্মদার তীব্র স্রোত

ভেসে চলেছে মা দুর্গার পা ধুয়ে দিয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মা দুর্গার এই অলৌকিক কাহিনী শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই রাতেই হাজারে হাজারে লোক এসে হাজির হল এই অলৌকিক দৃশ্য দেখতে। পরের দিন, ৩০ অক্টোবর ভেড়াঘাটে তিলধারণের জায়গা রইল না। বিভিন্ন রুট থেকে বাস সরিয়ে ভেড়াঘাটে অনবরত বাস যাচ্ছে আর আসছে। ভেড়াঘাট বিরাট একটা মেলার রূপ পেল। নানা রকমের দোকান, খাবার, ফুল, ফলের দোকানই ভিড় সবচেয়ে বেশি। লক্ষ লক্ষ ভক্ত মা দুর্গার উদ্দেশে নর্মদাতেই ছুঁড়ে দিচ্ছে ফুল, ফল বা মেঠাই। লক্ষ লক্ষ ধর্মপাগলকে সামলাতে শহরের পুলিশ হিমশিম খেয়ে গেল। এই সঙ্গে ব্যাপক হারে বিক্রি হতে লাগল অলৌকিক মা দুর্গার ফোটোগ্রাফ। এমন জীবন্ত দুর্গার ছবি বাড়িতে থাকলে দুর্গতি দূর হবে এই বিশ্বাসে বহু ভক্তই মা দুর্গার ফোটোগ্রাফ কিনল, বলতে গেলে ফোটো কেনার হুজুগ পড়ে গেল ওখানে। জব্বলপুরের হিন্দী দৈনিক পত্রিকা নবভারত-এর দেওয়া তথ্য অনুসারে ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর মাত্র চার দিনেই জব্বলপুরের মতো একটি মাঝারি শহরে ছবি বিক্রি হল ৪ থেকে ৫ লক্ষ। দাম হিসেবে জনসাধারণের পকেট থেকে চলে গিয়েছিল ৩৫ লক্ষ টাকার মতো। সেই সঙ্গে দেবী দুর্গার কৃপায় অন্যান্য দোকানেরও বিক্রি-বাটার রমরমা ছিল দেখার মতো। স্থান-মাহাত্ম্যের স্থায়ী রূপ দিয়ে এই জায়গাটাকে একটা তীর্থক্ষেত্র বানিয়ে ফেলতে পারলে আখেরে যে প্রচুর লাভ হবে এ-টুকু বুঝে নিয়েছিল স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকেরা।

এরই মধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। দুই উৎসাহী যুবক গাঞ্জীপুরার রামকিষণ সাহু ও অজয় বর্মন দেবী প্রতিমাকে স্পর্শ করতে সাঁতার কেটে এগোতে গিয়ে নর্মদার তীব্র স্রোতে ভেসে গেল। দুই তরুণের এই মৃত্যুতে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন চিন্তিত হলেন। বুঝলেন, দেবীপ্রতিমা পাথরের খাঁজে যতদিন আটকে থাকবে, ততদিনই আরও দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েই যাবে। ধর্মান্ধ লোকেরা জাগ্রত দুর্গাকে স্পর্শ করতে গিয়ে মৃত্যু হলে অক্ষয় স্বর্গবাস হবে বলে যদি একবার ধরে নেয়, তবে বিপর্যয় ঘটে যাবে। গণহিস্টিরিয়ার প্রকোপে স্বর্গবাসের বাসনায় অনেকেই আত্মাহুতি দেবে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিলেন প্রতিমা ডুবিয়ে দেবেন।

এইবার বোধহয় জব্বলপুরের ভেড়াঘাট সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। ভেড়াঘাট জব্বলপুরের বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থান। ভেড়াঘাটে এলে দেখতে পাবেন বিশ্ববিখ্যাত 'মার্বেল রক'-এর অসাধারণ শোভা। দু'পাশে সাদা মার্বেল পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে নর্মদা নদী।

নদীতে বোটে চেপে পর্যটকেরা পাহাড়ের সৌন্দর্য পান করেন। এখানকার প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের জন্য নদীর বাঁ দিক বেশ গভীর, কোথাও কোথাও এই গভীরতা তিন চারশো ফুট পর্যন্ত। স্বভাবতই গভীরতার দরুন নদীর বাঁ দিকের জল শান্ত ও স্রোত কম। ডান দিকে নদীর গভীরতা খুবই কম। এত কম যে, কোথাও কোথাও জলের উপর পাথরও চোখে পড়ে। জলের দু-চার ফুট গভীরতার মধ্যে রয়েছে বহু পাথর ও পাথরের তৈরি খাঁজ। তাই ডান দিকে নদীর স্রোত খুব তীব্র।

বাঁ দিকে বেশি জলে বিসর্জন দেওয়ায় ডুবে গিয়েছিল বটে কিন্তু ডুবন্ত অবস্থায় স্রোতের টানে ডান দিকে চলে যায় এবং প্রতিমার পাটাতন আটকে যায় কোনো ডুবন্ত পাথরের খাঁজে। জলের তীব্র ধাক্কায় আটকে থাকা প্রতিমা সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা অসাধারণ হলেও অলৌকিক নয়।

২ নভেম্বর বিকেলে কোমরে নাইলনের দড়ি বাঁধা ডুবুরী নামল প্রতিমা ডোবাতে। পুলিশের এমন অধার্মিক কাজে জনতা উত্তেজিত হল। পুলিশ উত্তেজিত জনতার উপর লাঠিচার্জ করতে

বাধ্য হল। ডুবুরীরা দেবী প্রতিমার পাটাতন কেমনভাবে পাথরের খাঁজে আটকে গেছে পরীক্ষা করে মূর্তিকে দড়ি বেঁধে টানাটানি করল, শাবল দিয়ে চাড় দিল, মূর্তি কিন্তু তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। উন্মত্ত জনতা ডবুরীদের থামাতে পাথর ছুঁড়তে লাগল। তারই সঙ্গে মাঝে-মাঝে সমস্বরে চিৎকার করতে লাগল, "জয় দুর্গে, জয় নর্মদে," "ধর্ম কী জয় হো, অধর্মকা নাশ হো"। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের পর রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ অধার্মিকেরাই জিতে গেল। মা দুর্গা অবশেষে ডুবলেন।

পক্ষিতীর্থমের অমর পাখি

'পক্ষিতীর্থম' দক্ষিণ ভারতের একটি প্রখ্যাত ধর্মস্থান। মাদ্রাজ থেকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরে থিরুকালিকণ্ডুম নামে একটা জায়গায় পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে পক্ষিতীর্থ মন্দির। প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে বারোটা নাগাদ একটি বা দুটি পাখি উড়ে আসে পক্ষিতীর্থে। পুরোহিতের নিবেদন করা ভাত, ময়দা, ঘি ও চিনিতে তৈরি খাবার খেয়ে আবার ওরা উড়ে চলে যায়। পুরোহিত বলেন, প্রতিদিন এই পক্ষিদেবতা বা দেবতারা উড়ে আসেন সুদূর বারাণসী থেকে, নিবেদিত খাদ্য গ্রহণের পর আবার ফিরে যান বারাণসীতে। পুরোহিতরা আরও বলেন, এই পক্ষিদেবতারা অমর। যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁরা এমনি করেই প্রতিদিন বারাণসী থেকে উড়ে এসে পুজো গ্রহণ করে আবার ফিরে যান। এরা নাকি পৌরাণিক যুগের পাখি। দীর্ঘকাল আগেই নাকি এই জাতীয় পাখি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। জীব মাত্রেই মরণশীল—এই তত্ত্ব পক্ষিদেবতাদের বেলাতে খাটেনি। পুরোহিতদের প্রতিটি কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলে ধরে নেওয়ার মতো ভক্তের অভাব নেই আমাদের দেশে। তারা পক্ষিতীর্থের পক্ষিদেবতার অলৌকিকত্বকে স্বীকার করে নিয়ে পরম ভক্তির সঙ্গে পুজো দিতে যায়।

অনেক মানুষই অলৌকিক কোনো কিছুকে দেখতে আগ্রহী, অলৌকিকে বিশ্বাস করতে আগ্রহী। তাই, অস্বাভাবিক কোনো কিছু দেখলেই অন্ধ বিশ্বাসে তাকেই অলৌকিক বলে ধরে নেয়।

পাখিদের ঠিক একই সময়ে উড়ে আসা এবং খাবার খাওয়ার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকতা থাকলেও অসম্ভব কিছু নয়। আপনার বাড়ির আশেপাশের কাকদের নিয়ম করে কিছুদিন দিনের যে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে খাবার দিতে থাকুন. কয়েক দিন পরেই দেখবেন, ঠিক খাবার দেওয়ার সময় কাকেরা এসে হাজির হচ্ছে।

আমার স্ত্রী গত বছর-দুয়েক ধরে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে ন'টার মধ্যে একটা কাক ও একটা চড়ুইকে নিজের হাতে খাওয়ায়। প্রতিদিন ঠিক ওই সময়ে পাখি দুটো এসে হাজির হয় এবং ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু করে দেয়। বেশি চেঁচামেচি করলে আমার স্ত্রী ধমক দেয়, ওরাও দেখি বকুনি খেলে দিব্যি বুঝদারের মতো চুপ করে যায়। স্ত্রী সুমি পাউরুটি, রুটি বা বিস্কুটের টুকরো ধরে হাতে। ওরা হাত থেকেই টুক্‌টুক্ করে খাবার খায়। পাখিদের এই ধরনের ব্যবহারের কারণ হল অভ্যাস বা ট্রেনিং। এই পাখি দুটির ব্যবহার অন্য পাখিদের তুলনায় কিছুটা অস্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু, তার বেশি কিছু নয়।

অনেকের মনে হতে পারে, খাবার খেতে শুধু দুটি মাত্র পাখি আসে কেন? কেন অন্য পাখিরাও আসে না?

আমার স্ত্রী সুমিকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখেছি চারদিকে খাবার ছিটিয়ে অনেক পাখিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা না করে একটা বা দুটো পাখিকে আলাদা করে খাওয়াবার চেষ্টা করলে শুধু তারাই খাবার দেবার নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হয়। আমি একবার প্রায় এক বছর ধরে সামনের বারান্দায় বসে সকালের চা খেতাম এবং আমার বিস্কুট থেকে একটা টুকরো একটা কাককে দিতাম। প্রতিদিনই কাকটা বিস্কুটের টুকরোর লোভে আমার সকালের চা খাওয়ার সময়ে এসে হাজির হত।

তা হলে এটুকু নিশ্চয়ই বোঝা গেল যে, পক্ষিতীর্থের পাখিদের নির্দিষ্ট সময়ে খেতে আসার মধ্যে কোনো অলৌকিকত্ব নেই। এবার দেখা যাক, পাখি দুটো সত্যিই প্রতিদিন ১৩০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে কাশী থেকে উড়ে আসে এবং তাদের নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করে আবার কাশীতেই ফিরে যায় কি না!

সত্যিই যদি কাশী থেকেও পাখিরা আসছে বলে ধরে নিই, তবুও তাকে অলৌকিক কিছু বলা যায় না, ১৩০০ কিলোমিটার কেন, কয়েক হাজার কিলোমিটার পথ উড়ে যাযাবর পাখিরা জায়গা চিনে এক মহাদেশ থেকে আর এক মহাদেশের নির্দিষ্ট কোনো চিড়িয়াখানায় বা জলাশয়ে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজির হয়।

কিন্তু পক্ষিবিশেষজ্ঞদের মনেও বিস্ময় জাগে, যখন শোনা যায় পক্ষিদেবতা প্রতিদিনই ১৩০০ কিলোমিটার পথ উড়ে আসে এবং ১৩০০ কিলোমিটার উড়ে ফিরে যায়।

সত্যিই যে ওরা বারাণসী (কাশী) থেকে আসা তার কোনো প্রমাণ নেই। অবশ্য কিছু পক্ষিবিশেজ্ঞের মতে পাখি দুটি উৎসর্গীকৃত ভোগ গ্রহণের পর একটু দূরের একটা ছোট পাহাড়ে তাদের বাসায় চলে যায়। আবার সেখান থেকে পরের দিন ফিরে আসে।

বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতরা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী কিছু ব্যক্তি সোসাইটির গবেষকদের অনুসন্ধান চালাতে দেননি। ফলে, পক্ষিবিশেষজ্ঞদের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা ধরে নিতে পারি বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাখিরা সুদীর্ঘকাল ধরে এমনি করেই কিছুটা দূরের বাসা থেকে উড়ে এসে ভোগ খেয়ে যাচ্ছে। পাখিদের অমর বলে চালানোর জন্য প্রয়োজন মতো বৃদ্ধ বা আহত পাখি বদল করা হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, পাখি দুটি কোন জাতীয় পাখি? পুরোহিতদের কথামতো পাখি দুটি এতই প্রাচীন আমলের যে, এই জাতীয় পাখি বর্তমান বিশ্বে আর নেই। পৌরাণিক যুগের পাখি হলে

অবশ্য বিলুপ্ত প্রাণী হওয়াই স্বাভাবিক। ওই জাতীয় পাখির বংশধরদের রূপান্তর ঘটতে ঘটতে আজ সম্পূর্ণভাবে অন্য জাতের পাখিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সাধারণ ভক্ত-দর্শকরা অবশ্য বিশ্বাস করেন এ-ধরনের পাখি তাঁরা আগে কখনও দেখেননি। তাঁদের কাছে এই অচেনা পাখির রহস্যময় চালচলন পুরোহিতদের কাহিনীর প্রতি বিশ্বাস এনে দেয়।

সকলেই পক্ষিতত্ত্ববিদ নন। তাই বিরল শ্রেণীর পাখি চিনতে না পারাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু, এই বিষয়ে পক্ষিতত্ত্ববিদদের মতামতটা কী, তা একবার দেখা যাক।

প্রখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ শ্রীঅজয় হোম ১৯৫৫ সালে পক্ষিতীর্থমে গিয়েছিলেন। তিনি বেলা সওয়া এগারোটা নাগাদ উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঈগলের চেয়ে ছোট, প্রায় চিলের মতো দুটি পাখিকে উড়ে আসতে দেখেন। পাখিরা এসে নামল ভোগের থালা থেকে হাত-পাঁচেক দূরে। তারপর অজয় হোমের ভাষায়, "ও হরি, এ যে আমার অত্যন্ত চেনা পাখি। গিরিডিতে হাটের পাশে ডাঁই করা জঞ্জালের উপরে, পাশে কত দেখেছি। এ তো গিন্নি শকুন (নিওফ্রন পেবক্‌নোপটেরাস) ইং, স্ক্যাভেঞ্জার ভালচার।"(আজকাল, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৫২ সাল)

তামিলনাড়ু সরকারের একটি রঙিন প্রচারপত্রে পক্ষিতীর্থমের পাখির ছবি ছাপা হয়েছে। সেই ছবি দেখে আরও কিছু পক্ষিতত্ত্ববিদ মত প্রকাশ করেছেন, এটা শ্বেত-শকুন (Neophron Vulture)। শ্বেত-শকুন বিরল হলেও আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এই জাতীয় শকুনের দেখা মেলে অর্থাৎ, এরা অবলুপ্ত নয়।

যে গাছ কাটা যায় না

সালটা ঠিক মনে নেই, বোধহয় ১৯৫৩-৫৪ হবে। তখন ভি· আই· পি· রোড তৈরির কাজ হচ্ছে, এখন যার নাম নজরুল সরণী। বাগুইহাটি ও কেষ্টপুরের মাঝামাঝি জায়গায় রাস্তা তৈরির কাজে বাধা দেখা দিল। শুনলাম রাস্তার মাঝখানে পড়ে-যাওয়া একটা গাছ কাটতে গিয়ে নাকি কেউ গাছটাকে কাটতে পারছে না। কুড়ুল তুললে তা আর নেমে এসে গাছে পড়ছে না। এও শুনলাম, বুলডজারও নাকি ওপড়াতে এসে ফেল মেরে গেছে। গাছের কাছাকাছি এসে থেমে পড়ছে, আর এগোতে পারছে না। এই অলৌকিক গাছকে পুজো দিতে আশপাশের অঞ্চল থেকে নাকি ঝেঁটিয়ে লোক আসছে।

অনেকে মত প্রকাশ করলেন, একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য, দেব-মাহাত্ম্য, গাছটা হল দেবস্থান, তাই বিজ্ঞানও এখানে অচল হয়ে যাচ্ছে।

যখন অন্ধ ভক্তদের সমর্থন নিয়ে গাছতলায় একটা মন্দির গড়ে তোলার পরিকল্পনা কার্যকর হতে চলেছে সেই সময় কোনো এক অধার্মিক, বেরসিক গাছটা কাটতে এগিয়ে এল। সাহসী ওই লোকটিকে ধর্মান্ধ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট লোকদের হাত থেকে বাঁচাতে রাস্তা নির্মাণ কর্তৃপক্ষ পুলিশের সাহায্য নিলেন। পুলিশী সাহায্যের প্রয়োজন ছিল, দেখা গেল বেশ কিছু লোক লাঠিসোটা নিয়ে গাছ কাটা প্রতিরোধ করতে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু, গাছের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী লোকদের গাছের অলৌকিক শক্তিকে অবিশ্বাস করে লৌকিক সাহায্যের হাত বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল কী? এ তো তাদের জানা থাকাই উচিত যে এই লোকটিও গাছ কাটতে ব্যর্থ হবে। লোকটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি, গাছ কাটতে সমর্থ হয়েছিল। বুঝতে অসুবিধে হয় না অলৌকিকত্ব আরোপ করে মন্দির গড়তে পারলে বিনা শ্রমে লোক ঠকিয়ে কুবের হওয়া যাবে ভেবেই সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো হয়েছিল। গাছ কাটতে এসে যার কুড়ুল থেমে গিয়েছিল,

গাছের উপর দিয়ে বুলডোজার চালাতে গিয়ে যে ব্যর্থ হয়েছে, তারা ছিল সাজানো লোক, স্রেফ অভিনয় করেছে।

গাইঘাটার অলৌকিক কালী

১৯৫৩ সাল, চব্বিশ পরগণার জেলার কলাসীমা বাজারের কাছের একটি কালীমন্দির পত্রপত্রিকার প্রচারে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়ে। '৮৩-র ১২ এপ্রিল সন্ধে নাগাদ চব্বিশ পরগণার গাইঘাটার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল এক ক্ষণস্থায়ী তীব্র ঘূর্ণিঝড়। এই ঝড়ে ২০টি গ্রাম প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৩ জনের মৃত্যু হয়। আহতের সংখ্যা ছিল ২০০ মতো। ঝড়ে পঞ্চায়েত অফিসের ছাদ উড়ে গিয়ে পড়ে প্রায় ১০০ ফুট দূরে। বিদ্যুৎ দপ্তরের পাকা বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চারটি রিভার লিফট পাম্প উপড়ে ফেলে। সুপুরি ও খেজুরগাছ মাথা কাটা কণিষ্ক হয়ে যায়। কলাসীমা একতলা পাকা স্কুল বাড়ির ঢালাই ছাদ পুরোটাই উড়িয়ে নিয়ে যায় প্রলয়ঙ্কর ঝড়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথামতো ঝড়ের সময় মনে হল একটা আগুনের গোলা তীব্র বেগে ঘুরতে ঘুরতে চলে যাচ্ছে। আগুনের গোলা ও ঝড় দুটো একই সময় একই সঙ্গে বিদায় নেয়। ঝড়ের প্রচণ্ডতায় এত ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও আশ্চর্যভাবে রক্ষা পেয়েছে কলাসীমা বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মন্দির। সন্ধ্যায় মন্দিরের পুরোহিত মানিক গাঙ্গুলী মায়ের পুজো কবছিলেন। ঝড় সবকিছু তছনছ করে চলে গেল, শুধু স্পর্শ করল না মায়ের মন্দির। সাধারণের মনে প্রশ্ন এল, এটা কী দেবী-মাহাত্ম্য নয়? একে মায়ের লীলা ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?
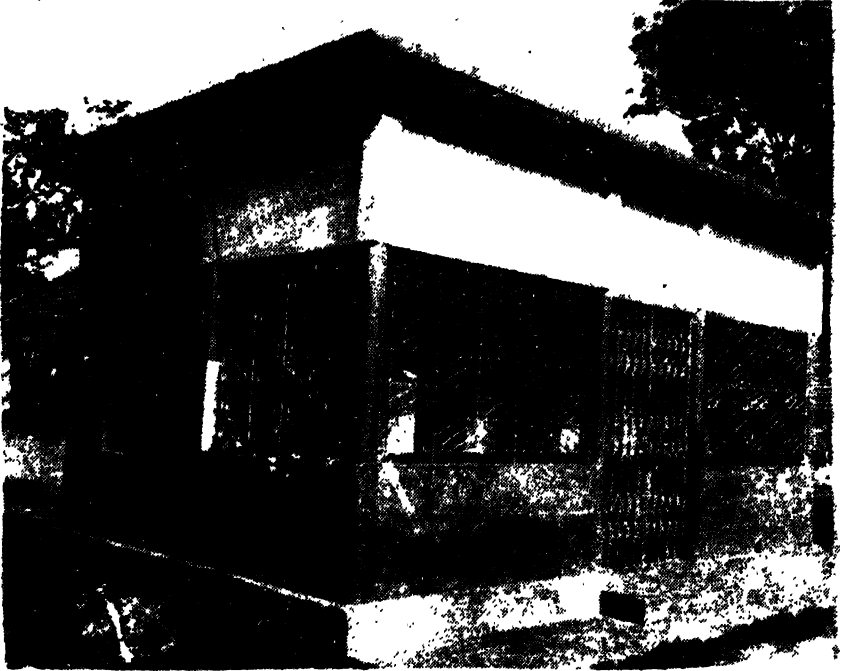
কালাসীমা মন্দির

সাধারণের অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে আর একটু ইন্ধন যোগাল পত্রপত্রিকাগুলো। মন্দির অক্ষত রাখার কারণ অনুসন্ধানে কোনো আবহাওয়া বিজ্ঞানীর সাহায্য না নিয়ে, যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যার জন্য কোনো কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে বেশির ভাগ পত্রপত্রিকাগুলোই মন্দিরে আবিষ্কার করল 'মায়ের লীলা'। অগ্নি গোলকেও আবিষ্কার করল 'মায়ের লীলা'। অগ্নি গোলকেও আবিষ্কার করল 'রহস্য'।

যে ঝড়টি সেদিন সন্ধেতে গাইঘাটার বুকে অপ্রলয় তুলেছিল আবহাওয়াবিদদের ভাষায় সেই ঝড়টির নাম 'Tornado' (টর্নেডো)। টর্নেডোর প্রকৃতি সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটা কথা অন্ততঃ না বললে এই ঘটনাটার যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যাও অনেকের বুঝতে অসুবিধে হতে পারে।

এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখীর সময় যে কালো ঝটিকা মেঘবাহিনীকে দেখা যায়, সেগুলোতেই থাকে টর্নেডো ঝড়ের সম্ভাবনা। টর্নেডো ঝড়ের সৃষ্টিকর্তা মেঘগুলোর মাথা থাকে প্রায় ৪০ হাজার ফুট উঁচুতে, মেঘের তলদেশ থাকে মাটি থেকে প্রায় ২ হাজার ফুট উঁচুতে। এই কুচকুচে কালো ঝটিকা-মেঘের ভিতরে তীব্র বেগে আলোড়িত হতে থাকে এবং ঘুরতে থাকে কয়েক লক্ষ টন ওজনের জলকণা। জলকণাগুলোর অনবরত প্রচণ্ড ঘর্ষণে মেঘরাশি হয় বজ্রগর্ভ। এই ঝটিকা-মেঘের তলার দিকের অংশের কোনো স্থানে কখনও আলোড়ন তীব্র হয়ে ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। এই ঘূর্ণির মেঘ নেমে আসে মাটির অনেক কাছাকাছি। ঝটিকা-মেঘ থেকে নেমে আসা হাতির শুঁড়ের মতো দেখতে এই ঘূর্ণির মাটি বা জল ছুঁয়ে যেমন কখনও কখনও বা চলে যায় মাটি থেকে ১০, ১৫ বা ২০ ফুট উচু দিয়ে। তবে, যখন বয়ে যায়, তখন রেখে যায়

তার চিহ্ন। অথচ আশ্চর্য এই যে টর্নেডো যদি ১৫ ফুট উঁচু দিয়ে যায় তবে তার যাত্রাপথে পনেরো ফুটের বেশি উঁচু গাছ, কী বাড়ির ছাদ যাই পড়ুক ভেঙে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর ১০-১২ ফুট পেঁপেগাছ, কলাগাছ কী চালাবাড়ি সবই থাকবে অটুট। ঘূর্ণির এই হাতির শুঁড় তার যাত্রাপথে কখনও মাটি ছুঁয়ে চলে, কখনও কিছুটা উঁচু দিয়ে চলে, কখনও উঠে যায় অনেক উঁচুতে।

আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা মনে করেন টর্নাডো ঝড়ের তীব্র ঘূর্ণিতে ধূলিকণাগুলো ঘূর্ণিত হতে থাকে। ঘর্ষণের তীব্রতায় সৃষ্টি হয় সুপ্রচুর ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ। এই ঘর্ষণজনিত বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ গোলার সৃষ্টি করে। এই ধরনের বিদ্যুৎ গোলাই সেদিন দেখেছিলেন গাইঘাটার লোকেরা।

কলাসীমা বাজারের মন্দির আমি দেখেছি। মন্দিরটির বয়েস বছর খানেক। উচ্চতা ফুট দশের মতো। ওই তল্লাটে কিন্তু শুধু মন্দিরই রক্ষা পায় নি, আরো অনেক কিছুই রক্ষা পেয়েছে। পঞ্চায়েত অফিসের ছাদ উড়লেও অফিসের লাগোয়া ফুট দুয়েক উঁচু গাছগুলোর সামান্যতম ক্ষতি হয় নি। বুঝতে অসুবিধে হয় না এখানে ঘূর্ণি গেছে ছ'ফুটেরও কিছুটা উঁচু দিয়ে কিন্তু দশ ফুটের নীচু দিয়ে, তারই ফলে এমন আপাত অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। আরও লক্ষ্যণীয় পঞ্চায়েত অফিস ও বিদ্যুৎ দপ্তরের ছাদ গেলেও দেওয়াল বা দরজা, জানালার ক্ষতি হয় নি। তার কারণও ওই একটিই। টর্নাডো দরজা-জানালার চেয়েও উঁচু দিয়ে বয়ে গেছে।

কলাসীমা বাজারের উল্টোদিকে একটি বাড়ি দেখেছিলাম, যার চাল উড়ে গিয়েছিল, কিন্তু ওদের কলাগাছগুলোর কোনও ক্ষতি হয় নি। কলাগাছ খুবই নরম জাতীয় গাছ। ঝড়ে এদেরই সবচেয়ে আগে শুয়ে পড়ার কথা। কলাগাছের উচ্চতার দিকে তাকালেই বোঝা যায় স্বল্প-উচ্চতাই এদের রক্ষা পাওয়ার কারণ। পনের ফুট উচ্চতার সাইনবোর্ডকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন দেখেছি। আর তারই পাশে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আট ফুট উচ্চতার চালাঘরকে। অতএব ১০ ফুট উঁচু মন্দির রক্ষার সঙ্গে দেবী-মাহাত্ম্যের কোনও প্রমাণ আমি পাই নি। বুঝেছি টর্নেডো ঝড়ের গতি-প্রকৃতির জন্যেই এমনটা হয়েছে।

পীরের নামে আঙুলের ছোঁয়ায় যে পাথর শূন্যে ভাসে

বাংলা ভাষার জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পরিবর্তন'-এর ১৬-মে ১৯৫৯-এর সংখ্যাটি আর এক ঝড় তুলল। অলৌকিকে ও ঈশ্বর মাহাত্ম্যে বিশ্বাসীরা পরিবর্তনে প্রকাশিত সংবাদ পাঠে যেমন আপ্লুত হলেন, তেমনি যুক্তিবাদীরা হলেন হতচকিত। সংবাদটির শিরোনাম ছিল, "আঙুলের ছোঁয়ায় যে পাথর শূন্যে ভাসে"। প্রতিবেদক শ্রীবিকাশ লিখেছেন পুনের ২০ কিলোমিটার দূরে এক জাগ্রত পীরের অলৌকিক দরগার কথা। এই দরগার মাজারে রয়েছে দুটি পাথর। একটির ওজন ৬০ কিলোগ্রাম ও অপরটির ওজন ৯০ কিলোগ্রাম। তারপর শ্রীবিকাশ যা লিখেছেন তাই আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। "প্রথমটিতে ৭জন ও অপরটিতে ৯জন মানুষ যদি একত্রে একটি করে আঙুল ছুঁয়ে চিৎকার করে বলে, 'কামার আলিশা দরবেশ...' তাহলে পাথর দুটি আপনা থেকেই শূন্যে ভেসে ওঠে। পাথর শূন্যে ভেসে থাকে আঙুলগুলি স্পর্শ করে ; কিন্তু আঙুলে বিন্দুমাত্র ওজন অনুভব হয় না। যতক্ষণ একটানা এক শ্বাসে চিৎকার চলে, ততক্ষণ পাথর শূন্যে ভাসে। যার কণ্ঠ আগে বন্ধ হয় পাথর গড়িয়ে পড়ে তারই দিকে। কেউ একজন চিৎকার না করে তাহলে পাথরটি সামান্য একটু ওপরে উঠে নীচে আছড়ে পড়ে।"

"সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার কামার আলিশা দরবেশের নাম ছাড়া অন্য কোন নামে বা শব্দে

পাথর দুটির একটিও শূন্যে ভাসে না।"

যদিও প্রতিবেদক জানিয়েছেন, এমন অলৌকিক ঘটনা যার ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিয়ে আজও হয় নি। তবু বিজ্ঞানেরই সামান্য সাহায্য নিয়ে ও যুক্তি দিয়ে ঘটনার ব্যাখ্যা করছি এবং সেই সঙ্গে এও জানিয়ে রাখি কলকাতার বুকেই যুক্তিবাদে বিশ্বাসী, বিজ্ঞান-মনস্করাই বেশ কয়েকবার কম বেশি ওই ওজনের পাথর একই পদ্ধতিতে আঙুল ঠেকিয়ে শূন্যে ভাসিয়েছেন। না, তাঁরা পাথর ভাসাবার জন্য কোনও পীর বা সাধু-সন্ন্যাসীর নাম উচ্চারণ করেন নি।

প্রাথমিকভাবে পরিবর্তনের খবর আমাকে যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিল। যদিও বুঝেছিলাম ৯০ কেজি পাথর ৯জনের হাতের ছোঁয়ায় উঠে থাকলে বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে এক একজনকে তুলতে হয়েছিল কম-বেশি ১০ কেজি ওজন। আর, দ্রুত এক শ্বাসে দরবেশের নাম একসঙ্গে চিৎকার করে উচ্চারণ করার মধ্যে তৈরি হচ্ছিল Impulsive force (ইম্পালসিভ ফোর্স)। শ্রমিকেরা ভারী কিছু তোলার সময় "আউর থোড়া", "হেঁইয়ো", "মারো জওয়ান", "হেঁইয়ো", ইত্যাদি বলতে থাকে এ নিশ্চয়ই আপনারা প্রায় সকলেই দেখেছেন। "হেঁইয়ো" কথাটা সব শ্রমিককে একই সঙ্গে ইম্পালসিভ ফোর্স তৈরি করতে সাহায্য করে, অর্থাৎ সব শ্রমিক একই সময়ে স্থিরভাবে বল (force) প্রয়োগ না করে এক ঝটকায় বল (Impulsive force) প্রয়োগ করে। ঝটকা দিয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে ফল পাওয়া যায় তা স্থিরভাবে শক্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ বেশি। ফলে বিজ্ঞানের নিয়ম মাফিক বাস্তবক্ষেত্রে এক হ্যাঁচকা টানে ১০ কেজি তলতে এক একজন ভক্তকে ২ থেকে ২১/২ কেজি ওজন সাধারণভাবে তোলার মত শক্তি নিয়োগ করতে হয়।

ইলোরা থেকে গোয়া যাওয়ার পথে পুনে নেমেছিলাম প্রধানতঃ কামার আলিশা দরবেশ-এর দরগা দেখতে। পুনে থেকে ২০ কিলোমিটারের মতো দূরে ব্যাঙ্গালোর রোডের উপর শিবাপুর স্টপেজে নেমে দরগায় যেতে হয়। একটা ছোট পাহাড়ের উপর দরগা।

পরিচ্ছন্ন দরগা। মাঝখানে মাজার-ঘর, দরবেশের সমাধি। মাজারের সামনে মাটিতে রয়েছে দুটো পাথর যার ওজন সম্বন্ধে প্রতিবেদক লিখেছিলেন ৬০ কেজি ও ৯০ কেজি। সঠিক ওজন জানার মতো কোনও ব্যবস্থা ওখানে ছিল না, সুতরাং দরগার ফকিরদের বলা ওজনের হিসেব সঠিক না-ও হতে পারে।

মাজারে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নেই, সুতরাং স্ত্রীকে বাইরে রেখেই আমি আর ছেলে পিংকী মাজারে গিয়েছিলাম। ওখানে আমরা বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম। তারই মধ্যে কয়েকবার কিছু ভক্ত আঙুল ছুঁইয়ে ছোট আর বড় দুটো পাথরই তুললেন। ছোট পাথর তুলতে ৯ জন এবং বড় পাথর তুলতে ১১ জনের প্রয়োজন হচ্ছিল। আমি দরগার ফকিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "শুনেছি ছোট আর বড় পাথরটা তুলতে ৭ জন ও ৯ জনের প্রয়োজন হয়?"

ফকির বললেন, "না, ভুল শুনেছেন, ৯ জন আর ১১ জনের আঙুল ছোঁয়াতে হয় পাথরের তলায়। সবাই একসঙ্গে 'কামার আলিশা দরবেশ' বলে যত জোরে সম্ভব একবার উচ্চারণ করুন, দেখবেন দরবেশের কৃপায় পাথর শূন্যে উঠে যাচ্ছে।"

দেখলামও বেশ কয়েকবার। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, প্রতিবার পাথরে আঙুল ছোঁয়ার সময় ভক্ত দর্শকদের চেয়ে দরগার ফকিরের সংখ্যাই থাকছে বেশি।

আমি কিছুক্ষণের অপেক্ষায় আমাকে নিয়ে ৮ জন দর্শক যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ৯ জন পূর্ণ করতে আমাদের একজন ফকিরের সাহায্য নিতে হয়েছিল। আমরা ফকিরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে একসঙ্গে চিৎকার করলাম 'কামার আলিশা দরবেশ'। কথাটা উচ্চারণ করতে আমাদের সময় লেগেছিল ১১/২ সেকেণ্ডের মতো। আমরা প্রতিটি দর্শক আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য

পুনে দরগার শূন্যে ভাসা পাথর

করল্যাম পাথর উঠল না। অমনি আমাদের কাছে ছুটে এলো আর কয়েকজন ফকির। তারা বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কয়েকজন খারাপ লোক আছে, তাই পাথর ওঠে নি। বুঝেছিলাম, ক্ষিপ্ততা আসলে অভিনয়। পাথর না ওঠার কারণ যাতে দর্শকদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় তাই তাদের এই ছেঁদো যুক্তি সহযোগে অভিনয়। আসলে পাথর দরবেশের নামের জোরে ওঠে না। ওঠে দরগার ফকিরদের অভিজ্ঞ হাতের আঙুলের ছোঁয়ায়। ফকিরদের হাতের হ্যাঁচকায় পাথর ওঠে, পাথর উঠতে থাকার স্থায়িত্বকাল দরবেশের নাম উচ্চারিত হওয়া পর্যন্ত এবং সেটা দেড় সেকেণ্ডের মতো, Impulsive force প্রয়োগ করার সময় পর্যন্ত। অন্ধ ভক্তেরা ধরে নেন পাথর উঠলো তাঁদেরই হাতের ছোঁয়ায় ও দরবেশের নামের জোরে।

প্রতিবেদক লিখেছেন, "আঙুলে বিন্দুমাত্র ওজন অনুভব হয় না।" আমি পরীক্ষা করে ও যাঁরা তুলেছেন তাঁদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি, স্বল্প হলেও প্রত্যেকেই ওজন অনুভব করেছেন।

কলকাতার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ-এ ৮০-কে·জি· ওজনের একটি বার্মা সেগুনের টেবিল তুলেছেন পাঁচজন।

বুঝেছি মস্তিষ্কের কোষগুলো স্বাভাবিক থাকলে প্রত্যেকেই ওজন অনুভব করবেন।

প্রতিবেদক লিখেছেন, "সব থেকে আশ্চর্য ব্যাপার : কামার আলিশা দরবেশের নাম ছাড়া অন্য কোন নামে বা শব্দে পাথর দুটির একটিও শূন্যে ভাসে না।"

তাহলে শ্রীবিকাশের পক্ষে আরো আশ্চর্য হওয়ার মতো একটি খবর দিই, কলকাতার যুক্তিবাদীরা একাধিকবার এই ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন ৯ জনের আঙুলের ছোঁয়ায় Impulsive force ব্যবহার করে ৫০ কেজি পাথর তোলা যায়, যাকে প্রতিবেদকের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়—'পাথর ভাসান' যায়। আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি। যুক্তিবাদীরা পাথর তোলার সময় চেঁচিয়েছিলেন ঠিকই, তবে ভুলেও কোনও অবতারের নাম নিয়ে নয়।

আমি মাজারে দুটি পাথর তোলার ক্ষেত্রেই একাধিকবার আঙুল ছুঁইয়েছি। 'কামার আলিশা

দরবেশ' উচ্চারণ করার বদলে একই সুরে অন্য কথা উচ্চারণ করে পরীক্ষা চালিয়েছি। কিন্তু আমার দিকে পাথর গড়িয়ে পড়ে নি। প্রতিবেদক নিজেই আমার কথার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

অলৌকিক প্রদীপে মৃত বাঁচে

কামার আলি দরবেশের দরগাতেই আছে এক আশ্চর্য অলৌকিক প্রদীপ। "পীরের কবরের পশ্চিম দিকে মাথার উপর একটা চৌকোণা লণ্ঠন ঝোলানো আছে। লণ্ঠনের ভিতরে একটি প্রদীপ বাদাম তেলে ২৪ ঘণ্টা জ্বলে। প্রদীপটির বিশেষত্ব হচ্ছে : কোন সাপে কাটা রোগীকে যদি তিন ঘণ্টার মধ্যে এখানে এনে প্রদীপের চারপাশে ৭ পাক ঘোরান যায় তাহলে রোগী চার ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণ বিষমুক্ত হয়ে ওঠে। বিষাক্ত সাপে কাটার পরে মরে গিয়ে নীল হয়ে গেছে এমন অনেক রোগীও এখানে এসে সেরে উঠেছে বহুবার।" পরিবর্তন সাপ্তাহিক পত্রিকার ঐ সংখ্যাটিতেই শ্রীবিকাশ এই কথাগুলো লিখেছেন।

মৃতকে বাঁচাতে বিজ্ঞানও যেখানে ব্যর্থ সেখানে অলৌকিক দরগার অলৌকিক প্রদীপের চারপাশে ৭ বার ঘোরালেই সাপে কাটা মৃতও বেঁচে ওঠে—এটা যে কোনও লোকের কাছেই একটা অসাধারণ খবর। কিন্তু, এখানেও পত্রিকা তার দায়িত্ব সেরেছে একান্তই দায়সারা ভাবে। মৃতকে জীবন দেওয়ার একটা খবর দেওয়া হলো, কিন্তু এই নিয়ে আদৌ কোনও অনুসন্ধান চালানো হলো না। ওই দরগার কোনও দরবেশ কী বিষাক্ত সাপের কামড় খেয়ে মারা যাওয়ার পর আবার বেঁচে উঠে তাঁদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন ? একজন যুক্তিবাদী হিসেবে আমার চ্যালেঞ্জ রইলো, এই ধরনের পরীক্ষায় কোনও দরবেশ বা প্রতিবেদক স্বয়ং জিতে গেলে আমি যুক্তিবাদকে বিসর্জন দিয়ে অলৌকিকের পূজারী হবো।

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের ধোঁকা ধরা পড়েছে

১৯৫৫ সালে আমেরিকান লেখক চার্লস বার্লিৎজ্ 'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' লিখে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। এমন রহস্যময় রোমাঞ্চকর বই সম্ভবত এর আগে আর লেখা হয়নি। বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুড়ি-মিছড়ির মত লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। অতি দ্রুত পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলা ভাষাতেও বইটির অনুবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দারুণ বিক্রি হয়েছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিমের জলভাগে একটি ত্রিভুজ কল্পনা করা হয়েছে যার তিন দিকে আছে বার্মুডা, ফ্লোরিডা ও পোয়ের্তোরিকো। এই ত্রিভুজকেই বলা হয় বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল। মহাসাগরের এই বিশেষ অঞ্চলে নাকি রহস্যজনকভাবে শ'য়ে শ'য়ে জাহাজ ও বিমান যাত্রীসহ নিখোঁজ হয়েছে। অভিশপ্ত ওই সব জাহাজ ও বিমান থেকে যে সব বার্তা পাঠানো হয়েছিল তাতে নাকি জানা গেছে তাদের কম্পাসের কাঁটা আশ্চর্যজনকভাবে বন্-বন্ করে ঘুরতে আরম্ভ করেছিল এবং অদ্ভুত প্রাকৃতিক পরিবেশ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, এমনি আরো কত কিছু। বইটির মোদ্দা কথা ছিল—বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল এমন এক অলৌকিক রহস্যময় ফাঁদ পেতে বসে রয়েছে, যার রহস্য উদ্ধার করা কোন মানুষের বা বিজ্ঞানের কর্ম নয়। কারণ, পৃথিবীতে এখনও এমন অনেক কিছু ঘটে বিজ্ঞানে যার ব্যাখ্যা মেলে না। 'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' বইটি পৃথিবীতে এত বেশি আলোড়ন এনেছিল যে, একাধিক রাষ্ট্র এই বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য এগিয়ে এলো, এগিয়ে এলেন বহু বিজ্ঞানী। আমেরিকা ও রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত
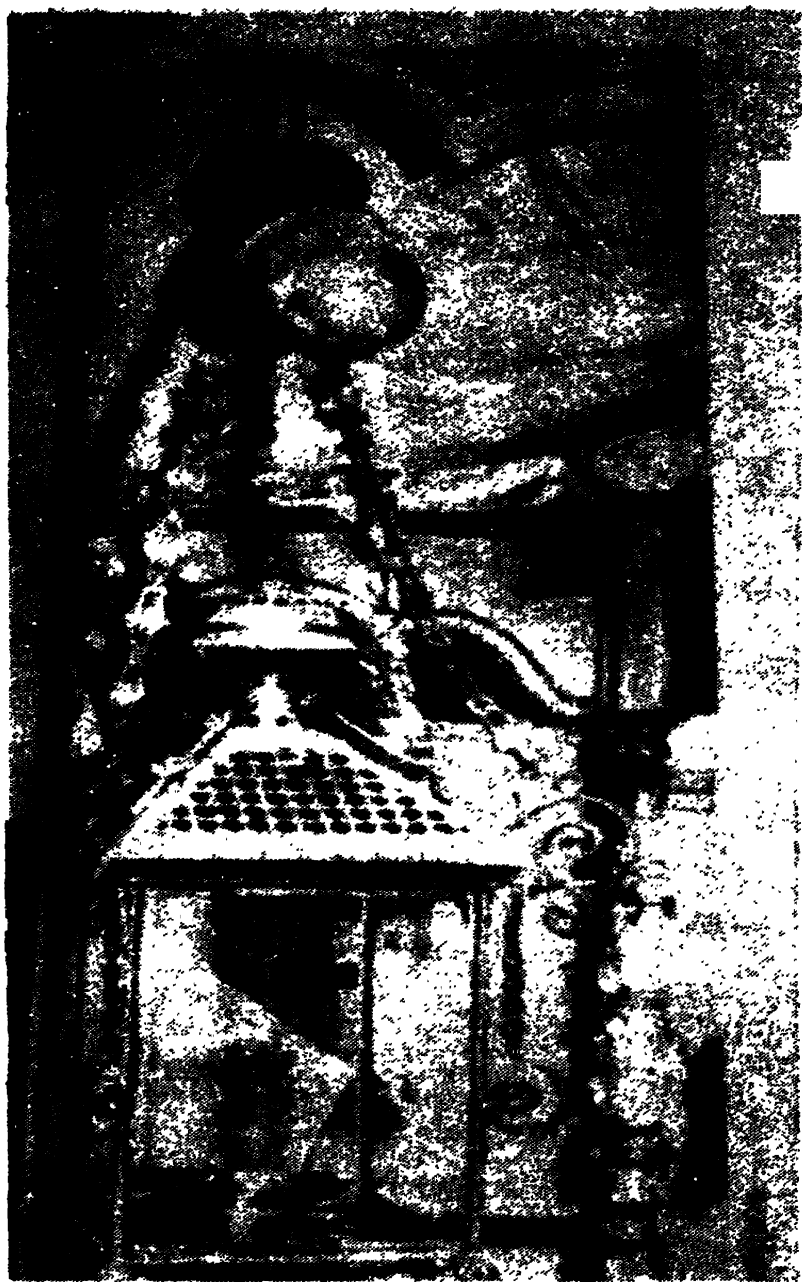
পুনে দরগার অলৌকিক বাতি

ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হলো। এই অনুসন্ধান প্রোগামের নাম দেওয়া হয়েছিল 'পলিমোড' প্রোগাম।

এই সব অনুসন্ধান থেকে জানা যায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী ওই অঞ্চলে জাহাজের ভিড় প্রচণ্ড বেশি। বছরে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জাহাজ বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল দিয়ে যাতায়াত করে। প্রতি বছর ওই সব জাহাজ থেকে গড়ে দশ হাজার সাহায্য বার্তা পাঠানো হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ওই অঞ্চলে নিখোঁজ জাহাজের সংখ্যা বিস্ময়করভাবে কম। তাছাড়া অনুসন্ধানকারীরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করে জানিয়েছেন, পৃথিবীতে প্রতি বছর গড়ে দু-তিনটি বড় জাহাজ নিখোঁজ হয়। কয়েক বছরের হিসেব নিয়ে দেখা গেছে জাহাজের ভিড় বেশি এমনি সব অঞ্চলের তুলনায় বার্মুডা ত্রিভুজে জাহাজ ডুবির সংখ্যা মোটেই বেশি নয়, আর পৃথিবীর সমস্ত বিমান কোম্পানিগুলির কাছ থেকে গত বারো বছরের যে রেকর্ড পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে এই বারো বছরের মধ্যে তাদের কারোরই কোন বিমান বার্মুডা ত্রিভুজে নিখোঁজ হয়নি।

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল বইয়ে একটি ঘটনায় বলা হয়েছে ১৯৫৬-এর ডিসেম্বরে মিয়ামির উপকূল থেকে মাত্র এক মাইল দূরে শান্ত সমুদ্রে 'কেবিন ক্রুজার উইচক্র্যাফট' জাহাজটি রহস্যজনকভাবে আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায়। অথচ আমেরিকান নৌবাহিনীর সীমান্তরক্ষীদের রেকর্ড থেকে জানা যায় এই সময় প্রচণ্ড সমুদ্র ঝড় হচ্ছিল, জাহাজ থেকে রেডিও বার্তায় বলা হয়েছিল ঝড়ে তাদের প্রপেলারটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জাহাজটি অশান্ত বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে অসহায়ভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জাহাজটি শেষ পর্যন্ত ডুবে যায়, এটা মোটেই কোন অলৌকিক ঘটনা নয়।

বইটিতে আর একটি ঘটনায় বলা হয়— জাপানী ট্যাংকার 'রাইফুকু মারু' বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল থেকে এস· ও· এস· পাঠিয়ে শান্ত সমুদ্রে হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায়।

অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধানে জানা যায় জাপানী ট্যাংকারটি শেষ যে রেডিও-বার্তা পাঠিয়েছিল তা গ্রাহক স্টেশনের রেডিও লগ বইতে লেখা আছে। বার্তাটি ছিল 'এখন খুব বিপদ। শীগগির এসো।' বার্তার ভাষায় কোন অতিপ্রাকৃত ভয়ের উল্লেখ ছিল না, এস· ও· এস· পাবার পর একটি উদ্ধারকারী জাহাজ দ্রুত রওনা হয় এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখতে পায় সমুদ্র প্রচণ্ড ঝড়ে উত্তাল এবং ট্যাংকারটি সমুদ্র ঝড়ে ডুবে গেছে।

'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' বইটির আর একটি উত্তেজক কাহিনী হল ১৯৫৩ সালে দুটি 'কে· সি· জেট স্ট্র্যাটোট্যাংকার' বিমানের রহস্যময় অদৃশ্য কাহিনী। লেখক বার্লিৎজ লিখেছেন, বিমান দুটির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল একশো মাইল ব্যবধানে, বিমান দুটির মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে থাকলে তাদের ধ্বংসাবশেষ একই জায়গায় পাওয়ার কথা। সরকারী রিপোর্টে জানা যায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বিমান দুটি খুব কাছাকাছি পাশাপাশি উড়তে গিয়ে আকাশে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়, এবং বিমান দুটির ধ্বংসাবশেষ একই জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল।

'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল'-এ সবচেয়ে দুর্ধর্ষ মাথার চুল খাড়া করা কাহিনী হলো ১৯৪৫-এর ডিসেম্বরে ছ'টি বিমানের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ এবং এই ঘটনাটাকে নিয়েই বিশ্বে নাকি সবচেয়ে বেশি সোরগোল হয়েছিল। বইটির কাহিনীতে বলা হয়েছে—১৯৪৫-এর ৫ই ডিসেম্বর আমেরিকার ফোর্ট-লডার এল ন্যাভাল বিমান বন্দর থেকে মার্কিন নৌবাহিনীর পাঁচটি অ্যাডভেঞ্চার বোমারু বিমান চোদ্দজন আরোহী নিয়ে আকাশে ওড়ে। রুটিন মাফিক প্রশিক্ষণে বেরিয়ে ছিলেন তারা। দিনের বেলা, আকাশ ছিল সম্পূর্ণ পরিস্কার। রুটিন ওড়ার শেষে অবতরণের আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি। এমন সময় বিমানবন্দরের কন্ট্রোল টাওয়ার চোদ্দজন বৈমানিকের দলনেতা লেফটেন্যান্ট চার্লস টেলরের কাছ থেকে বিপদ বার্তা পেল। টেলরের গলার স্বরে

প্রচণ্ড আতঙ্ক, তিনি জানালেন—"আমরা বোধ হয় নির্দিষ্ট পথ থেকে সরে এসেছি, আমরা মাটি দেখতে পাচ্ছি না। জানি না কোন দিকটা পশ্চিম, সবকিছুই উল্টোপাল্টা লাগছে... এমন কি সমুদ্রটাকেও যেমন দেখাবার কথা সে-রকম লাগছে না... মনে হচ্ছে আমরা যেন..." টেলর তারবার্তা পাঠানো সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। রহস্যময় ভাবেই নিখোঁজ হলো বিমান পাঁচটি। সঙ্গে সঙ্গে এই বিমানগুলোর খোঁজে বিমানচালক সমেত তেরোজনের এক উদ্ধারকারী দল নিয়ে একটি বিমান যাত্রা করে। কিন্তু ওই উদ্ধারকারী বিমানটিও আমেরিকার সেনাবাহিনীকে হতবাক করে নিখোঁজ হয়। নিখোঁজ ছ'টি বিমান ও সাতাশজন যাত্রীকে খুঁজে বের করার জন্য মার্কিন নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনী সবচেয়ে ব্যয়বহুল অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিখোঁজ বিমানগুলোর কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

অথচ বাস্তবে যা ঘটেছিল তা হল—বিমানগুলো পরিষ্কার দিনের আলোয় অদৃশ্য হয়নি। সেদিন আবহাওয়া ছিল খারাপ, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পরও সাতটা পর্যন্ত তারা আকাশে ছিল, এই সময় সামুদ্রিক ঝড় ওঠে। টেলর ছাড়া সকলেই ছিলেন শিক্ষার্থী। টেলর তার অবস্থান নির্ণয়ে ভুল করেন, আর সেটাও অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়, ফ্লোরিডা কী ও বাহামা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বড় বেশি সাদৃশ্য থাকার জন্য এর আগেও অনেক বৈমানিকই খারাপ আবহাওয়ায় এই ধরণের ভুল করেছেন। টেলরও বাহামাকে ফ্লোরিডা মনে করায় উত্তর-পূর্বে বিমান বন্দর অনুমান করে বিমানগুলো সেই দিকে চালাতে নির্দেশ দেন। বাহামার উত্তর-পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর। তাই আটলান্টিকের ওপর দিয়ে যেতে যেতে বিমানগুলো এক সময় জ্বালানীর অভাবে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে। এর বেশি আর কিছু ঘটে নি। অনুসন্ধানকারীদের এই অভিমত।
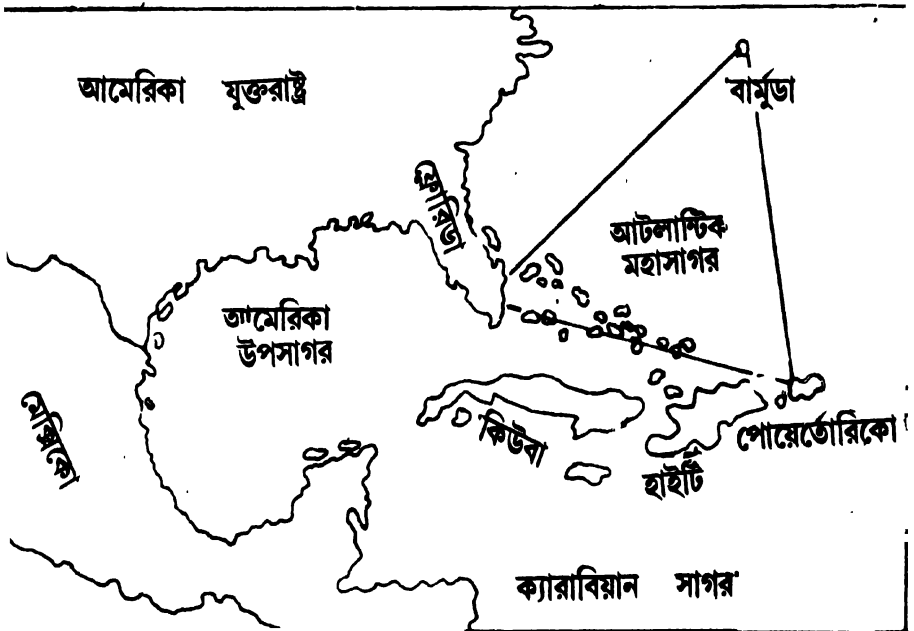
টেলরের পাঠানো বার্তা সরকারী লগ বুকে লেখা আছে। সেটা পড়লে দেখা যায় টেলর আদৌ অলৌকিক কোন বর্ণনা দেন নি, বরং বলেছেন— "আমি আমার অবস্থান জানি..." অতএব গোটা ব্যাপারটাতেই অলৌকিক কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বার্লিৎজ বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্যের কথা লিখতে গিয়ে তাঁর আর একটি বই 'উইদাউট এ ট্রেস'-এ লিখেছেন—স্যাটেলাইট এন· ও· এ· এ· কে পাঠানো হয়েছিল মেঘ সম্বন্ধে বেতার সংকেত পাঠানোর জন্যে, কিন্তু, বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় কোনও এক রহস্যময় কারণে বেতার সংকেত পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়। জায়গাটা অতিক্রম করার পর আবার স্যাটেলাইট স্বাভাবিক ভাবে বার্তা পাঠাতে থাকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ এন· ও· এ· এ· স্যাটেলাইট মেঘ বিষয়ক যে সংকেত পেত সেগুলো টেপে ধরে রাখা হতো এবং ভূকেন্দ্রে পাঠানো হতো। টেপের সংকেত প্রচার শেষ হলে টেপটা গুটিয়ে নিয়ে আবার সংকেত প্রেরণ শুরু করা হতো। এই টেপ গোটানোর সময় স্বভাবতই কোনও বেতার সংকেত পাঠানো সম্ভব নয়। ঘটনার দিন বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় স্যাটেলাইটটি সংকেত পাঠানো বন্ধ করে টেপ গোটাচ্ছিল। আর, এই স্বাভাবিক ব্যাপারটার মধ্যেই অস্বাভাবিকতা দেখতে পেলেন রহস্য-ব্যবসায়ী লেখক।

বর্লিৎজের তৈরি আরো এক গা শিরশিরে রহস্যঘন গল্প হলো—ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্সের একটি বিমান মিয়ামি যাওয়ার পথে বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলে পৌঁছতেই মিয়ামি বিমানবন্দরের র‍্যাডার থেকে হঠাৎ অদৃশ্য হয়। বিমান হয়তো কোনও দুর্ঘটনার পড়েছে, এমন অনুমান করে সমস্ত বিমানবন্দরকে মুহূর্তে সতর্ক করে দেওয়া হয়। অথচ দশ মিনিট পরেই আবার বিমানটি র‍্যাডারে ধরা পড়ে। মিয়ামি বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণের পর দেখা যায় প্রত্যেক বিমানযাত্রীদের ঘড়ি কোনও এক অদৃশ্য কারণে দশ মিনিট করে শ্লো হয়ে গেছে।

রুশ-মার্কিন যৌথ অনুসন্ধানী দল অনুসন্ধান করে। দেখেন, মিয়ামি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বা ইস্টার্ণ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোনও ঘটনার বিষয়ে কিছুই জানেন না। অর্থাৎ, ঘটনাটি আদৌ ঘটেনি।

বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলকে ঘিরে এমনি আরো গাদা-গাদা তথাকথিত রহস্য নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে অনুসন্ধানকারীরা দেখেছেন কোনটির পিছনেই সামান্যতম সত্য নেই। কোনও সত্যি না থাকলে বার্লিৎজ কেন এই ধরনের পাগলের মতো লিখতে যাবেন ? অনেকেই এই ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। এমন পাগলামি করে রাতারাতি কোটিপতি ও বিখ্যাত হতে পেলে সেই সুযোগ সুযোগসন্ধানীরা নেন বইকী। তবে, বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেলের রহস্য ফাঁস হওয়ায় বার্লিৎজ আর আর বিখ্যাত নন কুখ্যাত ব্যক্তি।

ছয়

পরামনোবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি (Parapsychology & E. S. P.)

প্রায় এক যুগ (১২ বছর) হল Parapsychology বা পরামনোবিদ্যার কথা বেশ একটু বেশি করেই শোনা যাচ্ছে। বলতে পারি পরামনোবিদ্যার পালে কিছুটা হাওয়া লেগেছে, যেমন এদেশে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় হাওয়া লেগেছে জ্যোতিষীদের পালে।

প্রচারের ব্যাপকতা পেলেই অথবা সবচেয়ে বেশি লোক বিশ্বাস করলেই কোনও মিথ্যে সত্যি যায় না, কোনও অ-বিজ্ঞান বিজ্ঞান হয় না।

Parapsychology-র (পরামনোবিদ্যা) বর্তমান এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের "American Society for the advancement of science"-এর ১৯৫৪ সালে Parapsychology-র সংস্থা বিশেষকে সভ্য হওয়ার অনুমতি দান। অবশ্য এটাও সত্যি যে, বিশেষ সভ্য পদ পেলেও Parapsychology-(পরামনোবিদ্যা) Natural philosophy-র (প্রকৃতিবিজ্ঞানের) মর্যাদা পায়নি।

Parapsychology নিয়ে আরো বেশি আলোচনার গভীরে ঢোকার আগে Parapsychology-র বিষয়বস্তু কী? বক্তব্য কী? এগুলো আগে জানা থাকলে পরবর্তী আলোচনায় আমাদের ঢুকতে কিছুটা সুবিধে হবে।

যুগ যুগ ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধর্মগুরু, পুরোহিত, ওঝা-গুণিন ইত্যাদির উৎপত্তি হয়েছে, হচ্ছে এবং জানি না আরও কত যুগ ধরে হবে। এই সব শ্রেণীর লোকেরা বারবারই নিজেদের প্রচার করেছেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে। আমাদের সাধারণভাবে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে ১. চক্ষু, ২. কর্ণ, ৩. নাসিকা, ৪. জিহ্বা, ৫. ত্বক। বিশেষ কোনও কারণে এই পাঁচটির কোনও এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়র ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আলাদা কথা, নইলে স্বাভাবিকভাবে আমরা এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনও কিছু অনুভব করি। এই পাঁচের বেশি আর কোনও ইন্দ্রিয় শক্তি মানুষের নেই। ক্ষমতালোভী ধর্মগুরু, পুরোহিত, ওঝা-গুণিন সম্প্রদায় সরল বিশ্বাসী সাধারণ মানুষদের ঠকিয়ে ভক্তি, ভয়, ক্ষমতা, আনুগত্য ও সম্পদ আদায় করার জন্য নিজেদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরে কোনও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেছেন এবং করছেন। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের বাইরের এই ইন্দ্রিয়কে দাবীদারেরা বলেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পাওয়া অতিরিক্ত অস্বাভাবিক ক্ষমতার নাম দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, ইংরেজিতে যাকে বলে Extra-sensory perception বা সংক্ষেপে E.S.P.।

Parapsychology গড়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (E.S.P.), জাতিস্মর ও মৃতব্যক্তির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ (Planchette)-কে আশ্রয় করে।

পরামনোবিদ্যার উপর গত কয়েক বছরে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। সবগুলো পড়ার সুযোগ না হলেও কয়েকটি পড়েছি। তাতে লক্ষ্য করেছি নতুন তথ্যের অভাব এবং পুরানো তথ্যগুলোকেই বিজ্ঞানগ্রাহ্য করে তোলার চেষ্টা। পরামনোবিজ্ঞানীদের একটা প্রচেষ্টা বিশেষভাবে চোখে পড়ার মতো, তা হলো, ওঁরা প্রমাণ করতে চান রাশিয়ার মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী দেশের বিজ্ঞানীরাও পরামনোবিদ্যায় আগ্রহী ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বাসী। কারণ, পরামনোবিজ্ঞানীরা জানেন, তাঁরা এই কথা প্রমাণ করতে পারলে সারা বিশ্বেই পরামনোবিদ্যা সম্পর্কে বিশ্বাস তৈরি করা যাবে এবং স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। Wolman সম্পাদিত "Handbook of Parapsychology", Van Nostrand—New York বইটিতে 'Soviet Institute of Brain Research'-এ গবেষণারতদের পরামনোবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু মন্তব্যের উল্লেখ আছে। যেমন, "Their (the research team of the Soviet Institute of Brain Research) first efforts were directed towards confirming" one... Italian physiologist's claim "that he had discovered brain waves approximately 1 c.m. in length, which could be ideal basis of telepathy, Soviet Scientists failed to confirm this claim" (Page 887)

Wolman-এর Handbook of parapsychology বইটিতে আরও বলা হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে "ন্যাটিলাশ" ডুবোজাহাজে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাহায্যে টেলিপ্যাথি সংক্রান্ত যে সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তা রাশিয়াকেও অনুপ্রাণিত করে। ক্রুশ্চফ-এর শাসনকালে রুশ সরকার পরামনোবিদ্যারচর্চাকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করে। "The Nautilus experiment was later shown to be a hoax of fiction masquerading as science' but it was apparently quite seriously taken up in Russia. From the political point of view the authorities, it appears, were reluctant to ignore parapsychology if there was any likelihood that the American military establishment was conducting successful experiments in U. S.A." (Page-887.)

আর এক পরামনোবিজ্ঞানী Hans Hozer তাঁর "Truth About E.S.P" বইটিতে জানান, "রাশিয়ায় অন্তত ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্মী নিয়োগ করে পরামনোবিদ্যার গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আরো কথা হলো, ওখানে গবেষকদের কাজ-কর্মের উপর কোনও রকম বাধানিষেধ আরোপ করা হয় না (সরকারী তরফ থেকে) এবং স্বাধীনভাবে যে কোনও কিছু ছেপে প্রকাশ করতে দেওয়া হয়, এমন কী তা মার্কসবাদকে সমর্থন করুক বা না করুক।" (পৃষ্ঠা-১৮)

"At this time there are at least 8 Universities in the Soviet Union with full Time, full-staffed research centres in Parapsychology. What is more, there is no restrictians placed upon those Working in the field and they were free to publish anything they like, whether or not they confirm to dialectical Marxism" (Page 18)

ঐ বইয়েই Holzer বলছেন, "E.S.P. is no way interferes with their political philosophy; dialectical Marxism may be opposed to the existence of soul in man, but it seems quite compatible with telepathy and communication

between minds,... Although the Russians cling to the nation that there is a physical basis for E.S.P. faculties. (ibid. Page 40)

বইগুলোর এই লেখাগুলি পুরোপুরি সত্যি হলে শুধুমাত্র এইটুকুই ধরে নেওয়া যায় রাশিয়াতেও পরামনোবিদ্যা নিয়ে গবেষণা চলছে, এবং তার ভিতর রয়েছে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, পরামনোবিদ্যাকে রাশিয়ার 'বিজ্ঞান অ্যাকাদেমি' স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই গবেষণার ফলে পরামনোবিদ্যার যথার্থতা বা অসারতা দুইয়ের যে কোনটিই প্রমাণ হতে পারে। আমি প্রবীর ঘোষ অতীন্দ্রিয় শক্তি নিয়ে অনুসন্ধান করছি বলে এই নয় যে আমি এর যথার্থতা স্বীকার করে নিয়েছি। অনুসন্ধান বা গবেষণা কোনও কিছুর স্বীকৃতি নয়।

যতদিন না অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, জাতিস্মর ও প্ল্যানচেট সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য 'বিজ্ঞানসম্মত তথ্য' পরামনোবিজ্ঞানীরা হাজির করতে পারছেন, ততদিন কোনও বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী ব্যক্তি এই তথ্যকে সত্য বলে স্বীকার করে নেবেন না। 'বিজ্ঞানসম্মত তথ্য' বলতে বোঝাচ্ছি সেই সব তথ্যকেই যা অন্য পরীক্ষাকেন্দ্রেও একই শর্তাধীন অবস্থায় অন্য পরীক্ষকদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং সমর্থিত।

Hans Holzer রাশিয়ায় ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা চলার কথা বলেছেন, কিন্তু তাদের নাম উল্লেখ করেন নি, ফলে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা বিষয়ে বেশ কিছুটা সন্দেহ থেকে যায়। রাশিয়ায় পরামনোবিদ্যা চর্চার সত্যতা জানতে ১৯৫৫ সালে 'সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাদেমি'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন ভারতের কিছু প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও শারীরবিজ্ঞানী। উত্তরে বিজ্ঞান অ্যাকাদেমির সাইন্টিফিক সেক্রেটারী আর· এল· গলিনোভা ১৯৫৫ এর ১৭ এপ্রিল যে চিঠি পাঠান, তা পড়লেই বোঝা যায় এই বিষয়ে রাশিয়ার উচ্চতম বিজ্ঞান চর্চার সংস্থা 'বিজ্ঞান অ্যাকাদেমি' খুব একটা আগ্রহী বা ওয়াকিবহাল নন, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে তাঁদের আগ্রহ নেই।

বিখ্যাত রুশ মনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক আসরেটিয়ান রাশিয়ায় পরামনোবিদ্যা বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার চর্চা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে একটি চিঠিতে লেখেন, "... there is no Special Institute in our country on investigations in the field of "mystic process."but there are some scientists, and particularly, Dr. Yu. A. Kholodov, in our institute, who works on the problems, which are closed to that you are interested in. And under separate cover I am sending to you some reprints of Dr. Yu. A. Kholodov's works."

(মানবমন : সম্পাদক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ; ১৯৫৫ সাল)

ডঃ খোলোজেভ্-এর গবেষণার যে বিবরণ চিঠির সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল, তা পড়লে স্পষ্টতই বোঝা যায়, তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়—তড়িৎ চুম্বক শক্তি কী ভাবে অনেক সময় ইন্দ্রিয় মাধ্যম ছাড়াই মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর লেখায় এমন কিছুই ছিল না যার দ্বারা মনে হতে পারে তিনি পরামনোবিদ্যাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বা কোনও অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পেয়েছেন।

আসুন, এবার দেখা যাক পরামনোবিজ্ঞানীদের পীঠস্থান আমেরিকায় পরামনোবিদ্যা নিয়ে কী ধরনের কাজ চলছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরামনোবিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছে জোর কদমে। ডঃ জে· বি· রাইন, ডঃ মিসেস লুইসা রাইন, ওয়াল্টার লেভি ইত্যাদি পরামনোবিজ্ঞানীরা প্যারাসাইকোলজির পক্ষে

নানা ধরনের সফল পরীক্ষা (?) চালিয়ে সারা বিশ্বে দস্তুর মতো ঝড় তুলেছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ-ক্যারোলিনা স্টেটের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরামনোবিদ্যার অধ্যাপক, অধ্যাপিকা শ্রী ও শ্রীমতী রাইন পরামনোবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করে বেশ কিছু বই প্রকাশ করেন। ডঃ জে· বি· রাইন পরবর্তীকালে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। অবশ্য এক সময় ডঃ রাইন-এর অবৈজ্ঞানিক কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর 'গবেষণা' বন্ধ করে দেন। তাতে অবশ্য রাইনের মতো করিৎকর্মা লোক দমে না গিয়ে তাঁর স্ত্রী লুইসা ই. রাইনের সহযোগিতায় নর্থ ক্যারোলিনা স্টেটেই ডারহাম-এ Institute of Parapsychology প্রতিষ্ঠা করেন। ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর হন আর এক পরামনোবিজ্ঞানী ওয়াল্টার লেভি।

১৯৫৪-এর আগস্ট পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে 'কালা দিবস' হিসেবে পরিচিত। এই বিশেষ দিনটিতে ওয়াল্টার লেভি সফল পরামনোবিদ্যার পরীক্ষা দিতে গিয়ে তাঁরই প্রতিষ্ঠানের সহকর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যান। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা পরামনোবিদ্যার সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে অথবা সত্যতা অনুসন্ধানের জন্য এই ইনস্টিটিউটে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাই এই অতীন্দ্রিয় পরীক্ষার সফলতার পিছনে যে লৌকিক যান্ত্রিক কলা-কৌশল আছে তা ফাঁস করে দেন। একান্ত বাধ্য হয়ে ওয়াল্টার লেভি শ্রী ও শ্রীমতী রাইনেকে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখে পালিয়ে যান।

ভারতবর্ষেও পরামনোবিদ্যার নামক অবিজ্ঞানের ঢেউ এসে লেগেছে। ১৯৫৪'র ২১ ও ২২ এপ্রিল নয়াদিল্লির গান্ধী মেমোরিয়াল হলে পরামনোবিদ্যার এক আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র হয়ে গেল। আমন্ত্রিত ছিলেন দেশ-বিদেশের প্রচার মাধ্যমগুলো ও কিছু ভি· আই· পি· ব্যক্তি। আর উপস্থিত ছিলেন পরামনোবিজ্ঞানী এবং সর্বোপরি পরামনোবিদ্যার অধিকারী অবতারেরা।

ঈশ্বরের অবতারেরা প্রথম দিনেই বক্তব্য রাখলেন—যে বিদ্যা আয়ত্ত করা দুনিয়ার সব থেকে কঠিন, তা হলো পরাবিদ্যা। পরামনোবিদ্যাই হলো ব্রহ্ম বিদ্যা। পরাবিদ্যার সাহায্যে নিজেকে জানা যায়, নিজের আত্মাকে (?) জানা যায়।

অধিবেশনে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছিলেন লিন ডেভিড মার্টিন, দুবাই থেকে ঈশ্বর বাবা, কানাডা থেকে ফ্লাইংবাবা। আরো যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম, যেমন, আত্মা বাবা, পাইলট বাবা, লাল বাবা, বালতি বাবা, তৎ বাবা, আরো কত কী। এ-ছাড়াও ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ, সাধক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। বাবাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার খবর আমাদের দেশের প্রায় সব-ভাষাভাষির প্রধান পত্র-পত্রিকাগুলোতেই প্রকাশিত হয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিবেদনটির কিছুটা এখানে তুলে দিচ্ছি। এই প্রতিবেদনটি পড়লে বাবাদের ক্ষমতার কিছুটা আঁচ আপনারা পাবেন বই কী।

এক একজন এক এক ধাঁচের অলৌকিক শক্তির অধিকারী। কেউ নাকি মাসের পর মাস সমাধিস্থ থাকতে পারেন প্রাণ স্পন্দনকেও থামিয়ে দিয়ে। কেউ আবার কার কী জিজ্ঞাসা আছে এবং তাঁর নাম, ধাম পরিচয়ই বা কী, তাও আগে ভাগে বলে দিতে পারেন।

তাঁদের কেউ কেউ অধীত শক্তির পরিচয় দিলেন। সঠিক উত্তর না পেয়ে দর্শকদের মধ্যে থেকে অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করতেও ছাড়লেন না। বাবারা অবশ্য নির্বিকার। সন্দেহকারীদের দিকে কৃপার দৃষ্টি হেনেছেন শুধু। ভাবখানা যেন, আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ ?

অবিশ্বাসের গোড়াপত্তন কিন্তু আলোচনাচক্রের শুরু থেকেই। কৃষি দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা ভগবান বিষ্ণুর ছবিতে মালা দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধনী ভাষণ শুরু

করলেন এভাবে—"অবিশ্বাসী হলেও খোলা মন নিয়ে আমি এসেছি, কারণ দেশের অনেক ঋষি-মহর্ষিই এক সময় আমাকে ভগবান দর্শনের জন্য মন্দিরে ঢুকতে দেননি। আমি নাকি অচ্ছুৎ। ঈশ্বর দর্শন করতে তাই আমি মন্দিরে যাই না। যে সব বাবা এখানে এসেছেন, তাঁরা নাকি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে গিয়েছেন। তাঁরা নাকি অতীন্দ্রিয় শক্তির অধিকারী। বিশ্বাস আমি করি না, তবে মন খোলা রেখেছি। বিশ্বাস করলে বলে যাব। আমি বিজ্ঞানে বিশ্বাসী, বুজরুকিতে নই।"

মাকোয়ানার এই কথায় যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প ড়ল। মঞ্চে বসা পাইলট বাবা, বালতি বাবার চোখ জ্বলে উঠল। বিচারপতি ভি কৃষ্ণ আয়ার পাক্কা সাতান্ন মিনিট ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন, পবাবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় শক্তি নিয়ে শুধু ভারতেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে আজ চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা চলছে রাশিয়া-আমেরিকার মত বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতেও। তিনি জানালেন, অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রয়োগেই জর্জিয়ার এক মহিলা অসুস্থ রুশ প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভকে দীর্ঘ স্বস্তি দিয়েছিলেন। রুশরা এই পরাবিদ্যাকে বলছে বায়ো-এনার্জি। এটা শুধু বিজ্ঞান নির্ভর নয়, পুরোপুরি বিজ্ঞান।

বক্তৃতায় আর মন ভরছে না। সুবেশী মহিলারা আসনে এগিয়ে বসেছেন আগ্রহে ; বাবাদের কৃপাপ্রার্থী তাঁরাই বেশি। অতঃপর বালতিবাবার ক্ষমতা দেখানো শুরু হল। পাঁচজন সাংবাদিক, পাঁচজন মহিলা ও পাঁচজন সাধারণ দর্শক নির্দিষ্ট হলে একটি করে প্রশ্ন মনে মনে তাঁরা ভাববেন। উনি বলে দেবেন কে কী ভেবেছে। কীভাবে ?

মঞ্চে একটা বালতি এল। তাতে পরিমাণ মতো জল ও দুধ ঢাললেন তিনি। সাদা কাগজ ফেলে দিলেন তাতে। বালতির মুখ চাপা দিলেন খবরের কাগজ দিয়ে। অল্পক্ষণ মুদ্রিত নেত্রে ধ্যান।,তারপর হাত ঢুকিয়ে সেই সাদা কাগজ বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবে প্রশ্নকর্তার নাম ও উত্তর।

নির্দিষ্ট সাংবাদিকদের মধ্যে আমিও ছিলাম। প্রশ্ন ছিল মেহতা ও ইদ্রিস হত্যার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন হবে কিনা। বালতিবাবা কোন উত্তর কিন্তু দেননি। পাশে বসা এক মহিলা সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল লোকসভার নির্বাচন হবে না পিছোবে। তার কোন জবাবও তিনি দিলেন না। ১৫ জনের মধ্যে জবাব পেলেন পাঁচজন। তাঁরা অবশ্য জানালেন জবাবে সন্তুষ্ট।

এইভাবে ক্যালির্ফোনিয়ার 'সাধক' লিন ডেভিড মার্টিনও তাঁর অধীত শক্তির পরীক্ষা দিলেন। ভাঁজ করা প্রশ্ন চোখ বন্ধ করে কপালে ঘষে তিনি জবাব দেন। চারজন প্রশ্নকর্তা বললেন, উত্তরটা কেমন যেন ভাসা ভাসা হল। আর একজন মঞ্চে উঠে গিয়ে তাঁকে স্পষ্ট বলে এলেন, এই প্রশ্ন আমি করিনি। জবাবটাও আমার নয়। আমি জানতে চেয়েছিলাম আমাব বন্ধুর হারিয়ে-যাওয়া ছেলেটি ফিরবে কিনা। লিন কড়া চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে পড়েন। আর কোন প্রশ্নকর্তার জবাব তিনি দেননি। আমারটাও নয়।

সেমিনারের কনভেনার এম সি ভাণ্ডারি কলকাতার মানুষ। তাঁর ভাষায়, বিজ্ঞান ও অলৌকিকতার পার্থক্য, প্রকৃত সাধক ও জোচ্চোরদের পার্থক্য দেখতেই এই আলোচনা সভার আয়োজন। আর বিশ্বশান্তির জন্য যোগীরা কী অসাধ্য সাধন করতে পারেন সাধারণ মানুষকে তা জানানোই সম্মেলনেব লক্ষ্য। সুযোগ দিলে এই যোগীরা নাকি মহাশূন্যের হাঁড়ির খবর দিয়ে দিতে পারেন। পাইলট বাবা সে কথাই সগর্বে ঘোষণা করলেন, "এই সরকার এত অর্থ ব্যয় করে রাকেশ শর্মাকে মহাকাশে পাঠালো। কী তথ্য সে জানিয়েছে ? দিক আমায় দায়িত্ব, হাজার গুণ বেশি খবর আমি জানিয়ে দেবো।"

তাই শুনে কলকাতার যোগী ও দিল্লিতে আশ্রম তৈরি করে সমাজসেবায় ব্যস্ত 'মাধবী মা'

বললেন, "যত সব বুজরুকি। জানাক না যা উনি জানাতে পারেন। কেউ বারণ করেছে ?"

পাইলট বাবাকে এই কথা জানাই। বিহারের সাসারামের এই যোগী তা শুনে করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন। শুধু বল্লেন, '৫৬ থেকে ৭১ সাল পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান এয়ারফোর্সে ন্যাট ও হান্টার চালিয়েছি। ৬৫-তে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। তারপর আত্মসন্ধানে সংসারত্যাগী হই। ব্রহ্মের দেখা পাই মহাকাশে বিমান চালানোর সময়। একাধিকবার। ৭৩ থেকে হিমালয়ে সাধনা। সিদ্ধি পেয়ে চলে এসেছি ৮০ সালে। এখন বিশ্বশান্তির জন্য কাজ করছি। সারা পৃথিবীতে ১০ কোটি শিষ্য। এই মহাশূন্য, এই ব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে জানি না এমন কিছুই নেই। সরকার দায়িত্ব দিক, সব সন্দেহ দূর করে দেবো।

দুদিন ধরে বাবাদের এই কাণ্ড চলবে। তৎবাবা চোখ বন্ধ করিয়ে কুণ্ডলিনীর স্পর্শ দেবেন। পাইলট বাবা সমাধিস্থ হয়ে থাকবেন। তাঁর আত্মা ত্যাগ করবে শরীর, বন্ধ হবে প্রাণের স্পন্দন। সেই অবকাশে তিনি বিচরণ করবেন মহাশূন্যে। কানাডার ফ্লাইং স্বামী সমাধিস্থ অবস্থায় ভেসে থাকবেন দীর্ঘ সময়।

কলকাতা থেকে সম্মেলনে আমন্ত্রিত সাধক সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়। "অতীন্দ্রিয় শক্তি সাধনায় অর্জন করা সম্ভব"—বললেন তিনি। "তেমন সাধক বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ঠাকুর অষ্ট অনিষ দান করেছিলেন স্বামীজীকে। স্বামীজীই পেরেছিলেন তা প্রত্যাহার করতে। কারণ এই শক্তি মানুষকে লোভী করে তোলে, করে ধাপ্পাবাজ। সাধক শঙ্করাচার্য রাজা আমরূপের দেহে প্রবেশ করেছিলেন কামশাস্ত্র জানতে। যোগ সাধনায় সিদ্ধ না হলে এ অসম্ভব। আর অনেক সিদ্ধ পুরুষই ধর্মান্ধতার সুযোগ নিয়ে অনাচারী হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী হয়। দেখতে হবে এখানে কতজন প্রকৃত, কতজন জাল।"

হিমালয় সিদ্ধ স্বামী আত্মানন্দের আগমনও এই এক উদ্দেশ্যে। আমন্ত্রিত নন উনি। বললেন, হিমালয়ে থাকি। নির্দেশ পেয়ে চলে এসেছি। সুবেশী দুই তন্বীর সঙ্গে একান্তে আলাপচারী স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করি—কী বুঝছেন ? কতটা দুধ, কতটা জল ? প্রশ্ন শুনে উনি গম্ভীর হন এবং স্থান ত্যাগ করেন সঙ্গীদের বিমূঢ় রেখে। সম্মেলনে নিন্দুকের অভাব ছিল না। প্রকাশ্যেই আলোচনা শোনা গিয়েছে, রাজনীতিবিদদের ওপর যোগীদের প্রভাবের কথা। স্থানীয় এক সাংবাদিক চেপে ধরেছিলেন সম্মেলনের কনভেনার ভাণ্ডারিকে। উনি বললেন, যোগীরা বলেছেন, ওঁর হাতে নাকি বড় রাজনীতিক হবার রেখা আছে।

Extra-sensory perception বা E.S.P. (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি)

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা E.S.P. মোটামুটিভাবে সাধারণত : ৪ রকমের। (১) Telepathy (দূরচিন্তা) (২) Precognition (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি) (৩) Clairvoyance (অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি) (৪) Psycho-Kinesis বা Pk (জড় পদার্থে মানসিক শক্তি) আগেই স্পষ্ট বলে রাখা ভাল, এই ধরনের ভাগগুলো করা হয়েছে পরামনোবিদ্যারই সূত্র ধরে। বিজ্ঞানের কাছে এইসব ভাগ একান্তই মূল্যহীন, কারণ বিজ্ঞানে অতীন্দ্রিয় রহস্যময়তার স্থান নেই।

Telepathy (দূরচিন্তা)

পরামনোবিজ্ঞানীদের তুরুপের তাস হল 'টেলিপ্যাথি', যার সাহায্যে তাঁদের অলৌকিক বিশ্বাসকে (নেহাৎই অন্ধ বিশ্বাস) তাঁরা বিজ্ঞানের লেবেল এঁটে বার বারই চালাবার চেষ্টা করে চলেছেন।

পরামনোবিজ্ঞানীদের ধারণায় চিন্তার সময় মস্তিষ্ক থেকে রেডিও ওয়েভের মতো এক ধরনের

তরঙ্গ তার প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রবাহিত হতে থাকে। দূরের কোনও লোকের পক্ষে তার মস্তিষ্কের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে এই তরঙ্গকে ধরে প্রেরকের চিন্তার হদিস পাওয়া কঠিন হলেও অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

পরামনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোনও চিন্তা তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারেননি, যেমনটি প্রমাণ করা যায় শব্দ বা আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে। শব্দ বা আলোক তরঙ্গ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক, গতি ও মাত্রায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এটা প্রমাণিত। রেডিও এবং টেলিভিশন এই শব্দ তরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গকে ধরে শব্দ ও দৃশ্যকে আমাদের সামনে হাজির করে। যেহেতু 'চিন্তা তরঙ্গ' বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব শুধু কল্পনাতেই রয়ে গেছে, বাস্তবে প্রমাণিত হয়নি, তাই এই অস্তিত্বহীন চিন্তা তরঙ্গকে ধরা নেহাৎই অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

বিজ্ঞান স্বীকার করে ও জানে শব্দ শক্তি বা আলোক শক্তির মতো চিন্তা কোনও শক্তি নয়। চিন্তা স্নায়ু ক্রিয়ারই একটি ফল। টেলিপ্যাথির কোনও ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে বলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হয়নি। অতএব শুধুমাত্র অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং অন্যের কথায় ও ধারণায় আস্থা স্থাপন করে টেলিপ্যাথির অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া কোনও বিজ্ঞানমনস্কদের পক্ষেই আদৌ সম্ভব নয়।

আসুন, পরামনোবিজ্ঞানীরা টেলিপ্যাথির অস্তিত্বের সপক্ষে যেসব ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেগুলোই এখন একটু নেড়েচেড়ে দেখি।

১৯৫৯ সালে বিখ্যাত পরামনোবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডঃ জে· বি· রাইন টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা (?) চালিয়ে সবচেয়ে সারা বিশ্বে দস্তুর মতো একটা ঝড় তুলেছিলেন। তাঁর পরীক্ষার এই অভাবনীয় সাফল্যের খবর বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলোর দ্বারা প্রচারিত হতেই বিভিন্ন দেশের পরামনোবিজ্ঞনীরা নতুন শক্তি পেলেন। এলো পরামনোবিদ্যা বা Parapsychology-র জোয়ার। টেলিপ্যাথির সপক্ষে তাঁরা প্রত্যেকেই হাজির করতে লাগলেন ডঃ রাইনের ন্যাটিলাশ ডুবোজাহাজে চালানো সফল পরীক্ষার খবর।

'ন্যাটিলাশ' ডুবোজাহাজে টেলিপ্যাথির পরীক্ষা :

ডঃ জে· বি· রাইন দাবী করেন, ১৯৫৯ সালের ২৫ জুলাই তিনি টেলিপ্যাথির সাহায্যে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন 'ন্যাটিলাশ'-এ খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। আরও বলা হয়, এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর উইলিয়াম বাওয়ার। পরীক্ষা চালাবার সময় ন্যাটিলাশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২০০ মাইল দূরে এবং জলের তলায়। বিশ্বের বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমগুলো প্রচণ্ড গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর এই দাবীগুলোকে প্রচার করে। প্রচার মাধ্যমগুলো ডঃ রাইনের দাবীর সত্যতার অনুসন্ধানে সময় নষ্ট না করে পড়ি-মরি করে সাধারণ মানুষদের 'স্টাণ্ট নিউজ' গেলাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেল। ফলে একটা অপরীক্ষিত দাবী ব্যাপক প্রচারে মানুষের মনে একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করলো। প্রচারমাধ্যমগুলো যে নিজেদের ব্যবসা দেখতে গিয়ে লক্ষ-কোটি লোকের মধ্যে

অ-বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিহীন কুসংস্কারের বীজ বপন করলো এ-কথা একবারও চিন্তা করলো না।

এই অসাধারণ আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটার চার বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'দিস উইক' পত্রিকার তরফ থেকে ঘটনাটির উপর একটি বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল টেলিপ্যাথি পরীক্ষাটির উপর একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করা। আর, তাইতেই বেরিয়ে আসে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ'। ন্যাটিলাশ আণবিক সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্ অ্যাণ্ডারসন জানান '৫৯-এর ২৫ জুলাই ন্যাটিলাশ ছিল ডকে। কিছু সারাইয়ের কাজ চলছিল। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম পরিষ্কার ভাবে এও জানান যে, আজ পর্যন্ত টেলিপ্যাথির কোনও পরীক্ষাই ন্যাটিলাশে চালানো হয়নি।

টেলিপ্যাথির পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত বলে কথিত মার্কিন বিমান বাহিনীর উইলিয়ম বাওয়ার পত্রিকার অনুসন্ধানকারীদের জানান—টেলিপ্যাথির কোনও পরীক্ষার সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন না এবং ১৯৫৯-এর ২৫ জুলাই তিনি আদৌ ন্যাটিলাশে ছিলেন না। ছিলেন আলাবামা বিমান বাহিনীর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

টেলিপ্যাথির সাহায্যে নোটের নম্বর বলা :

শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত র‍্যাসানালিস্ট বা যুক্তিবাদী নেতা ডঃ আব্রাহাম থোমা কোভুর ১৯৫৩ সালে টেলিপ্যাথি ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ২৫ হাজার সিলোনিজ টাকা পর্যন্ত বাজি রাখেন। কোভুর ঘোষণায় বলেছিলেন—একটি ঘরে টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি থাকবেন। পাশের ঘরে একটি খামে থাকবে একটি কাগুজে টাকা। খাম খুলে নম্বরটি দেখবেন শুধু একজন, তিনি একজন চিন্তাতরঙ্গ প্রেরণে সক্ষম ব্যক্তিও হতে পারেন। তারপর, যে মোটের নম্বর দেখেছেন, তাকে দেখে কাগুজে টাকাটির নম্বর বলতে হবে।

এই ধরনের একটা টেলিপ্যাথি পরীক্ষা দেখাবার জন্য ডঃ কোভুর আমন্ত্রণ জানান বিখ্যাত সেই ডঃ রাইনকে যাঁর ন্যাটিলাশে টেলিপ্যাথি পরীক্ষার গল্প আগেই বলেছি।

ডঃ কোভুর যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তার উত্তর দিতে ডঃ রাইন আসেননি। ডঃ কোভুর ১৯৫৩ সালেই ওই চ্যালেঞ্জের অঙ্ক বাড়িয়ে করেন ১ লক্ষ শ্রীলঙ্কার টাকা। অবশ্য এই ধরনের পরীক্ষায় কেউ সফলতা লাভ করলেই সেটাকে টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা বলে মেনে নিতে আমি রাজি নই, কারণ ওর মধ্যেও অনেক সময়ই থেকে যায় কিছু ফাঁক-ফোকর, সেখান দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকে পড়তে পারে কিছু কৌশল। আমি আমার ১১ বছরের ছেলে পিংকীর সহায়তায় বহুবার এই ধরণের টেলিপ্যাথির খেলা বিভিন্ন সেমিনার ও অনুষ্ঠানে দেখিয়েছি। চোখে পড়ার মত কোনও স্থূল কৌশল না থাকায় অনেকে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছেন। আমাদের এই খেলার মধ্যে কোনও কৌশল নেই বললে অনেকেই এটাকে খাঁটি টেলিপ্যাথি বলেই যে ধরে নেবেন তাও বুঝতে অসুবিধে য় না।

আমার এক বন্ধুর বাড়িতে সপরিবারে বেড়াতে গিয়ে আড্ডায় বেশ জমে উঠেছিলাম। কথা হচ্ছিল এবার পুজোয় কোথায় বেড়ানো যায় তাই নিয়ে। কিন্তু 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর মতোই বন্ধু বলল, "তুই তো পত্র-পত্রিকায়, রেডিওতে অনেক সাধু-সন্ত আর জ্যোতিষীদের বুজরুকি ধরে তাদের মুখোস খুলে দিচ্ছিস। আমাদের ওই ধরনের একটা তথাকথিত অলৌকিক কিছু দেখা না।"

বললাম, "বেশ তো, তোদের একটা টেলিপ্যাথির খেলা দেখাচ্ছি। কৌশল একটা রয়েছে,

কলকাতায় "মানসিক ব্যাধি ও আমাদের কর্তব্য" সেমিনারে লেখক পুত্র পিনাকী

কিন্তু কৌশলটা ধরতে পারিস কিনা দেখ তো।

"পিংকী (আমার একমাত্র ছেলে এবং বয়েস মাত্র এগার হলেও আমার যুক্তিবাদী কাজকর্মের সঙ্গী) এই ঘরেই থাকুক। আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে পাশের ঘরে। তুই যে কোনও একটা কাগুজে টাকা আমাকে দেখাবি। নোটের নম্বরটা দেখে আমি টেলিপ্যাথির সাহায্যে পিংকীর মস্তিষ্কে চিন্তাটা পাঠাব। পিংকী নোটের নম্বর বলে দেবে।"

পাশের ঘরে বন্ধুর দেওয়া নোটের নম্বরটা দেখলাম ১০৯৬৩৬। বন্ধুকে বললাম, "এবার পিংকী ঠিক আমার চিন্তা ধরে নেবে। তারপর বল, এবার পুজোয় তুই কোথায় যাচ্ছিস ?"

বন্ধু বলল, "কিছুই ঠিক করিনি।"

বললাম, "এবার আমার রাজস্থান, দিল্লি, আগ্রা সাইডটা দেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বোধহয় যাওয়া হবে না। আগামী পুজোর আগে হবে বলে মনে হচ্ছে না। দুই প্রকাশকের দুটো বড়-সড় কাজ রয়েছে হাতে। অতএব পুজোটা খাতা-কলম নিয়েই কাটাতে হবে মনে হচ্ছে।"

ও ঘর থেকে পিংকী জবাব দিল, "নোটের নম্বর ১০৯৬৩৬।"

১৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রে মনোবিজ্ঞানী, মনোরোগ চিকিৎসক এবং সমাজবিজ্ঞানীদের নিয়ে "মানসিক ব্যাধি ও আমাদের কর্তব্য" শিরোনামে দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজক ছিলেন "মানব মন রজত জয়ন্তী উৎসব কমিটি"। ব্যয় বহন করেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু মহাশয়।

প্রথমদিনের অধিবেশনে আমি বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অবতার এবং প্যারাসাইকোলজিস্টরা অলৌকিক বলে যা দেখিয়েছেন তার কিছু কিছু আমি করে দেখাই এবং বলি, "এগুলো সবই দেখালাম লৌকিক কৌশলের সাহায্যে।" শেষে টেলিপ্যাথির আলোচনায় এলাম। দেখলাম নানা ধরনের টেলিপ্যাথির কৌশল। শেষে একজন দর্শককে একটা কাগুজে টাকা দিতে অনুরোধ করলাম। মঞ্চে এলেন দুইজন দর্শক। একজন দিয়েছিলেন এক টাকার নোট। আর একজন পাঁচ টাকার।

চোখ বাঁধা অবস্থায় পিংকী বসেছিল স্টেজে। আমি প্রথম দর্শকের নোটটি নিয়ে পিংকীকে বলতে বলেছিলাম, কত টাকার নোট এবং নম্বর কত।

পিংকী উত্তর দিয়েছিল, "এক টাকার নোট, নম্বর ২৩৩২৭৯।"

দ্বিতীয় দর্শকের দেওয়া নোটটির ক্ষেত্রেও সঠিকভাবে বলে দিয়েছিল, "পাঁচ টাকার নোট নম্বর ৭৭১৩২০।

সাপ্তাহিক পত্রিকা "পরিবর্তন" আয়োজিত "অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনী'তে (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৫) টেলিপ্যাথির কিছু খেলা ছিল অন্যতম আকর্ষণ। আমি যা দেখতে পাচ্ছিলাম, চোখ বাঁধা পিংকীর কাছেও যেন তা দৃশ্যমান হয়ে উঠছিল। নোটের নম্বর বলা দিয়ে প্রদর্শনী শেষ করে বসলাম সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পাশের চেয়ারে। আমার পাশে বসল পিংকী। পার্থদা একটা কয়েন (coin) বার করে বললেন, "এই কয়েনটার সাল পিংকী বলতে পারবে ?

বললাম, "কেন পারবে না ? আপনি কী ভেবেছেন, যিনি টাকা দিয়েছিলেন, তিনি আমার দলের কেউ ?"

পার্থদা সালটা আমাকে দেখিয়ে কয়েনটা মুঠিবন্ধ করলেন।

আমি পিংকীকে প্রশ্ন কবতেই ও সালটা বলে দিল। স্বভাবতই পার্থদা অবাক।

টেলিফোনে টেলিপ্যাথি : আয়োজক লণ্ডনের 'সানডে মিরার' :

লণ্ডনের 'সানডে মিরার' পত্রিকা ১৯৫৩'এর ১০ ডিসেম্বর এক টেলিপ্যাথি যোগাযোগের পরীক্ষা গ্রহণ করে। না, এরা কেউই পাশাপাশি ঘরে ছিলেন না, বা ছিলেন না কেউ একই হলের ভিতর। একজন পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন লণ্ডনে অন্য পরামনোবিদ্যাবিশারদ ছিলেন নিউইর্ক-এ। দু'ঘণ্টা ধরে ফোনের মাধ্যমে চলেছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তারপর সানডে মিরারে প্রকাশিত হলো টেলিফোন টেলিপ্যাথির অসাধারণ সাফল্যের কাহিনী। ছ-সাত মাস ধরে বহুবার তাদের এই টেলিপ্যাথি পরীক্ষার খবর প্রকাশ করেছে, খবরটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই যথেষ্ট প্রচার পেয়েছে। ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলোও এই বিষয়ে পিছিয়ে ছিল না। পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে এই সফল (?) পরীক্ষাটি বিরাট একটা 'প্লাস পয়েন্ট।'

আমাদের দেশেরই কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী, বিজ্ঞানী ও ডাক্তারকে জানি যাঁদের এক সময় যুক্তিবাদী হিসেবে ও কুসংস্কার বিরোধী হিসেবে যথেষ্ট পরিচিতি ছিল, কিন্তু তাঁরাও প্রধানতঃ 'সানডে মিরার' আয়োজিত টেলিপ্যাথি পরীক্ষার সাফল্য দেখে তাঁদের প্রাচীন বিশ্বাস থেকে যথেষ্ট টলে গিয়েছেন। যে পরীক্ষায় এই অসাধারণরাও টলেন সেই পরীক্ষার সাফল্যের খবর পড়ে সাধারণের কী অবস্থা হবে, তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না।

পরীক্ষক হিসেবে কারা ছিলেন :

সানডে মিরার আয়োজিত টেলিফোন টেলিপ্যাথির এই পরীক্ষায় লণ্ডনের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত ছিলেন চিন্তা প্রেরক হিসেবে টেলিফোন যোগাযোগকারীর ভূমিকায় সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অর্থার এলিসন। অর্থার এলিসনের আর এক পরিচয়, তিনি 'সোসাইটি ফর সাইকিক্যাল রিসার্চ'এর সভাপতি। এই সোসাইটির প্রধান কাজ হল প্যারাসাইকোলজি ও অতীন্দ্রিয়বাদের প্রচার।

আর যাঁরা লণ্ডন অফিসে সেদিনের পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, মিরারের বিজ্ঞান সম্পাদক রোনি বেডফোর্ড, মিরারের দূরদর্শন সম্পাদক ক্লিফোর্ড ডেভিস, 'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকার পক্ষে ডঃ ক্রিস্টোফার ইভান্স এবং ডঃ যোশেফ হ্যানলন্, সেইসঙ্গে কয়েকজন বিজ্ঞানী, পরামনোবিজ্ঞানী, সাংবাদিক ও কিছু বিশিষ্ট দর্শক।

নিউইয়র্ক অফিসে ছিলেন টেলিপ্যাথি ক্ষমতার অধিকারী বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় শক্তিধর ব্যক্তিটি তাঁর এক সহকর্মী, সানডে মিরারের প্রতিনিধি এবং 'নিউ সাইন্টিস্ট'-এর প্রতিনিধি সিড্‌নী ইয়াং।

পরীক্ষা কেমন হলো :

লণ্ডনের পরীক্ষাকেন্দ্রে 'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকার তরফ থেকে এক গোছা বন্ধ খাম রাখা হয় টেবিলের উপর। খামের ভিতরে কী আছে তা নিউ সাইন্টিস্ট পত্রিকার ডঃ ক্রিস্টোফার ইভান্স এবং ডঃ যোশেফ্ হ্যানলন্ ছাড়া আর কেউ জানতেন না। এই খামের ভীড়ের থেকে একটা খাম তুলে এগিয়ে দেওয়া হল অধ্যাপক অর্থার এলিসন-এর হাতে। খাম খুলতেই বেরিয়ে এলো একটা ফটোগ্রাফ। ফটোগ্রাফটা একটা পুলিসের গাড়ির, গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পুলিশ।

ছবিটি টেবিলের উপর রাখা হলো। সকলেই ছবি দেখলেন। নিউইয়র্ক পরীক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে সরাসরি টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করলেন অধ্যাপক অর্থার এলিসন। তারপর ইংলণ্ডে বসে থাকা এলিসনের সঙ্গে নিউইয়র্কে বসে থাকা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির শুরু হলো কথোপকথন। মাঝে মাঝে কথা, মাঝে মাঝে নীরবতা। এমনি করে কেটে গেল ঘণ্টা দুয়েক। শেষ পর্যন্ত নিউইয়র্ক থেকে টেলিফোনে ভেসে এলো—"গাড়ি গাড়ি গাড়ি। গাড়ির কথাটাই সবার আগে মনে এসেছে আমার। একটা চক্‌চকে লম্বা গাড়ি।"

পরামনোবিদ্ অধ্যাপক অর্থার এলিসন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। জানালেন, "পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য লক্ষ্য করা গেছে।"

প্রচারমাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হলো আটলান্টিক সাগর পেরিয়ে আশ্চর্য টেলিপ্যাথি যোগাযোগের বিস্ফোরক সংবাদ, তবে সংক্ষিপ্ত আকারে। পত্র-পত্রিকাগুলোতে বেশ কিছুদিন ধরেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টেলিফোন-টেলিপ্যাথির অসাধারণ সাফল্যের কথা প্রচারিত হলেও সর্বত্রই প্রচারিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত সংবাদ। না, সর্বত্র বলে একটু ভুল করলাম। 'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকায় ডঃ যোশেফ হ্যানলন তাঁর লেখা প্রতিবেদনে পুরো ঘটনাটার খুঁটিনাটি বিবরণ দিলেন। দিলেন টেলিফোনে কথোপকথনের বর্ণনা। সেই সঙ্গে তাঁদের পত্রিকার নিউইয়র্ক প্রতিনিধি সিডনী ইয়াং কী দেখেছেন, তারও বিবরণ। ফলে গোটা ব্যাপারটার যে ছবি নিখুঁত ফুটে উঠলো, সেটা আপনাদের সামনে পর্যালোচনার জন্য তুলে ধরছি।

'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকা কী বলছে :

অধ্যাপক অর্থার এলিসন-এর সঙ্গে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির সরাসরি

টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপনের পর নিউইয়র্কের তরফ থেকে দীর্ঘ নীরবতা। সম্ভবতঃ নিউইয়র্কের পরামনোবিদ মনসংযোগ করছেন। দীর্ঘ নীরবতায় শেষ পর্যন্ত এলিসনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। তিনি এ- প্রান্ত থেকে চেঁচালেন—"এখন তুমি তোমার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় কী দেখতে পাচ্ছ?" পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের আগেই জানানো হয়েছিল, এলিসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে একটি বন্ধ খাম, যাতে থাকবে কোন কিছুর ছবি। নিউইয়র্ক থেকে বলতে হবে লণ্ডনে এলিসনের সামনের টেবিলে কিসের ছবি রাখা হয়েছে।

—"আমি তিনটে জিনিসের ছবি দেখতে পাচ্ছি।" নিউইয়র্ক থেকে খবর ভেসে এলো।

—"ঠিক কী ধরনের ছবি তুমি দেখতে পাচ্ছ, বলো। আমাদের ছবির সঙ্গে তার মিল কতখানি দেখি।"

অন্যপ্রান্ত কোন উত্তর দিল না। দীর্ঘ কুড়ি মিনিটের নীরবতার পর ভেসে এলো একটি ক্লান্ত কণ্ঠস্বর, "আমি ক্লান্ত।"

এলিসন উৎসাহ যোগালেন, "এত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হচ্ছ কেন আজকাল? মনস্থির করে বসো। বসে ভাবতে থাক। বলো, আমরা এখানে যে ছবিটার দিকে মনসংযোগ করেছি, সেটা তোমার মনে কী ভাবে ভেসে উঠেছে?"

—"একটা সাদা কোন কিছুর ওপর তিনটে মানুষের ছবি।"

এলিসন কোনও উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে নিউইয়র্ক থেকে ভেসে এলো, "একটা লম্বা মতো..."

ও প্রান্ত কথা শেষ করার আগেই উত্তেজিত এলিসন চেঁচিয়ে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক, লম্বাটে ধরনেরই কিছু বলে যাও।"

এলিসনের এই সাহায্যে কোন কাজ হলো না। লম্বাটে ধরনেরই একটা কিছুর ছবি বলে জানানো সত্ত্বেও ওপ্রান্ত থেকে যা বললো তা এলিসনের পক্ষে যথেষ্ট হতাশজনক।

—"হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি একটা লম্বা কুকুর, একটা ঘোড়া আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে।"

এলিসন কোনও উৎসাহ দেখালেন না ফলে ও-প্রান্ত বুঝে নিল, উত্তর ঠিক হয়নি। আবার নতুন করে শুরু করলো, "আমি দেখতে পাচ্ছি একটা তিনকোণা মতো—একটা অর্ধবৃত্ত—একটা পাহাড়—"

এলিসন কোন সাড়া দিলেন না।

ওপ্রান্ত হঠাৎই উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ..."ঘোড়া কুকুর—কুকুর।"

ছবিটির কোথাও কুকুর নেই। এলিসন তাই নীরব।

ওপ্রান্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললো, "দেখুন তো ঘরে কোনও কুকুরের ছবি আছে কিনা?"

না, অনেক খোঁজখুঁজি করেও ঘরে কোনও কুকুরের ছবি দেখা গেল না। এলিসন তাঁর প্যারাসাইকোলজিকে এমনভাবে মার খেতে দেখে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করলেন, "লম্বা কোন কিছুর কথা বলছিলে না তুমি?"

ওপ্রান্ত বললে, "একটা ছবি আমি খুব স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি।"

—"তার কথাই বলো।"

"একটা চওড়া মতন লম্বা বস্তু, উজ্জ্বল রঙের।"

—বাঃ, খুব ভাল বলছ। বলে যাও।"

"টেবিল-ফুল—"

এলিসন কোনও উত্তর দিলেন না।

নিউইয়র্কের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবানেরও গলা নীরব হলো। মিনিট পাঁচেক পরে নিউইয়র্ক থেকে ভেসে এলো আর একটি কণ্ঠস্বর। এটি নিউ সাইন্টিস্ট পত্রিকার সিডনী ইয়ং-এর।

ইয়ং বললেন, "ও টেলিপ্যাথির সাহায্য নিয়ে একটা ছবি আঁকছে। ছবিটা গাড়ির বা শুয়োরছানার।"

এলিসন উৎসাহ দিলেন, "ওকে চালিয়ে যেতে বলুন।"

—ছবিটা এখন দাঁড়িয়েছে একটা কাঠের খেলনার মতো।"গাড়ি বা শুয়োরছানার মতো ওপরটা। নীচে চাকা বা পা নেই, গোল মতো।

—"ও অনেকটা সফল হয়েছে। আপনি ছবি দেখে বলে যেতে থাকুন।"

—"ছবিটা এবার থালার আকার নিয়েছে। সেটার দিকে হাতির পায়ের মতো কিছু একটা নেমে আসছে। এবার মনে হচ্ছে একটা স্তনের মতো কিছু।"

ছবি আঁকা শেষ হতে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মানুষটি নিজেই ফোন ধরলেন। জানতে চাইলেন, "কিসের ছবি তোমরা দেখছো ?"

—"এটা পুলিশের গাড়ির ছবি।" এলিসন জানালেন।

—গাড়ি-গাড়ি। এই ছবিটাই তো কতবার এঁকেছি। একটা চক্‌চকে লম্বা গাড়ি। "নিউইয়র্ক চেঁচালো।"

এলিসন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "ঠিক ধরেছ, একটা চক্‌চকে লম্বা গাড়ি।"

ওপ্রান্ত থেকেও উচ্ছ্বাস ভেসে এলো—"আমি এত দূরে থেকেও ছবিটা দেখতে সফল হয়েছি। সত্যিই আমি খুশি।"

এতেই পরামনোবিদ্‌ অধ্যাপক এলিসন পরামনোবিদ্যার 'অভাবনীয় সাফল্য' খুঁজে পেলেন।

যেহেতু বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ অলৌকিক কোনও কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাই যে ঘটনায় যত বেশি অলৌকিকের ছোঁয়া থাকে সে-ঘটনা তত বেশি জনপ্রিয়তা পায়। জনপ্রিয় পত্রিকাগুলো তাই পত্রিকার স্বার্থ দেখতে প্রকৃত ঘটনায় কাঁচি চালিয়ে ছাঁটকাট করে অলৌকিকের মোড়কে মুড়িয়ে লোভনীয় চাটনির মতোই পরিবেশন করছে, যেমন আর দশটা ক্ষেত্রেও তারা করে থাকে।

'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকার প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে, "সে যে ছবি এঁকেছে, সেটা জন্তুর, টেবিলের, পাহাড়ের অথবা বিশ্বের যে কোনও বস্তুর বলে দাবি করা যেতে পারে।"

মুখেও সে ছবির বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবু প্রচার-মাধ্যমগুলোর পূর্ণ সহযোগিতায় একটা মামুলি ব্যাপার অলৌকিকের চেহারা পেলো।

'নিউ সায়েনটিস্ট' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটির বিরুদ্ধে যদিও কোন প্রতিবাদ 'সানডে মিরার' পত্রিকার তরফ থেকে ওঠেনি, তবু সত্য ঘটনাটা প্রচারে প্রচার-মাধ্যমগুলো আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিল, তার কারণ বোধহয়, খবরটি জনসাধারণের কাছে তেমন জনপ্রিয় হবে না।

টেলিফোন টেলিপ্যাথির আর এক আকর্ষণীয় ঘটনা :

এবারের ঘটনায় এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবানের সামনে বাহান্নটা তাস মেলে ধরে সাজিয়ে রাখা হলো। বিছিয়ে রাখা তাস থেকে একটা তাস তুলে দেওয়া হল যিনি টেলিপ্যাথি করবেন, তাঁর
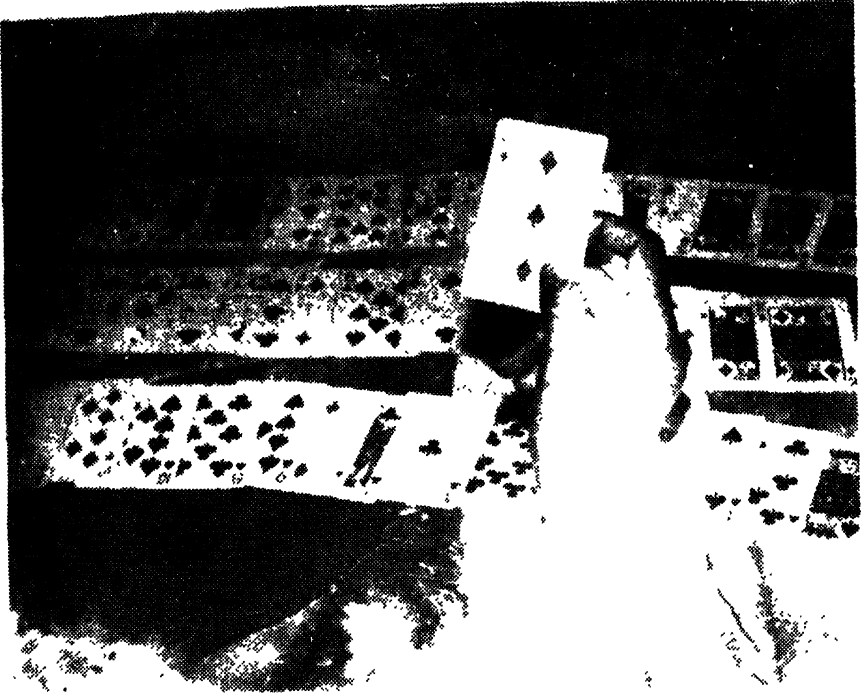
তাসের টেলিপ্যাথি দেখাচ্ছেন লেখক

হাতে। লোকটি তাঁর বন্ধুর ফোন নম্বর ও নাম জানালেন পরীক্ষকদের। ফোনে যোগাযোগ করা হলো বন্ধুটির সঙ্গে। তিনিও এক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী, চিন্তা গ্রহণ ও প্রেরণে সক্ষম। তাঁকে বলা হলো, "এখানে আপনার বন্ধুর হাতে আমরা একটা তাস তুলে দিয়েছি। আপনি বলুন তো কী তাস?"

কয়েক মিনিটের নীরবতা, দু'জনে দু-প্রান্তে মনসংযোগে ব্যস্ত। একসময় জবাব পাওয়া গেল। ফোনের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় উত্তরটা লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ল দর্শক ও শ্রোতাদের কাছে। দেখা গেল উত্তর সঠিক।

এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। (১) ফোনে যোগাযোগকারী কোনও প্যারাসাইকোলজিস্ট অথবা টেলিপ্যাথি ক্ষমতাধারী ব্যক্তিটি নন। (২) উত্তর 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানী'র মতো নয়, স্পষ্ট।

এই ধরনের টেলিফোন টেলিপ্যাথির সফল পরীক্ষা নিজের চোখে দেখার পর কী বলবেন? নিশ্চয়ই টেলিপ্যাথির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেবেন? কিন্তু আরো অবাক হওয়ায় মতো খবর দিচ্ছি, এর মধ্যেও একটা ফাঁকি রয়ে গেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? না হওয়ারই কথা অবশ্য। তবু সবিনয়ে জানাই এই একই খেলা আমি নিজেই বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েছি।

ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার এই টেলিফোন টেলিপ্যাথির গুপ্ত কৌশল শুনে আমাকে বলেছিলেন, "তুমি কৌশলটা না বললে এটা কিন্তু টেলিপ্যাথির আশ্চর্য সফল পরীক্ষা বলে মনে হয়। এই খেলাই তোমাকে রাতারাতি বিখ্যাত Psychic (অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী) করে দিত।"

আসল রহস্যটা নিশ্চয়ই জানার আগ্রহ হচ্ছে। ভাবছেন এই ধরনের ঘটনায় বন্ধুকে সংকেত পাঠাবার সুযোগ আমার কোথায় ? না, আমার কোনও চেনা লোক আগের থেকে ঠিক করে রাখা তাস তুলে দেন না। সেই সুযোগ ঠিক এই ধরনের খেলায় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় সাধারণত সবচেয়ে প্রবীণ বা সবচেয়ে নামী-দামী ব্যক্তিই সকলের অনুরোধে তাস নির্বাচন করেন।

তাস পাওয়ার পর আমি পরীক্ষকদের বন্ধুর ফোন নম্বর ও নাম বলি। যিনি ফোন করেন, তিনি নিজের অজান্তেই সংকেত বহন করেন।

ফোন নম্বরটা সঠিক দিতেই হয়। এখানে কৌশলের কোনও সুযোগ নেই। কৌশল যা কিছু, তা ওই বন্ধুর নামটুকুর মধ্যে। বাহান্নটা তাসের জন্য বাহান্নটা নাম আমি ও আমার টেলিপ্যাথি-পার্টনার দীপ্তেন মুখস্থ করে রেখেছি। তাস পাওয়ার পর সেই তাসের 'কোড' নামটাই বন্ধুর নাম হিসেবে বলি। দীপ্তেন ফোন করলে অবশ্যই বলে, দীপ্তেন বলছি।" অন্য প্রান্ত থেকে যখন বলা হয়, "অমুকবাবুকে ডেকে দিন তো ?" দীপ্তেন প্রশ্ন করে, "আপনি কে বলছেন ? কী দরকার বলুন।"

টেলিপ্যাথির প্রয়োজনে ফোন করা হয়েছে শুনলে দীপ্তেন বলে, "ধরুন, ওকে ডেকে দিচ্ছি। তারপর একটু সময় নিয়ে ও নিজেই আবার ফোন ধরে। ফোনে অন্যপ্রান্তের কথাগুলো শুনে বলে, "আচ্ছা চেষ্টা করছি।"

ফোন যিনি করছেন তিনি কোন্ নামের লোকটিকে চাইছেন, সেই লোকটির নাম শুনলেই দীপ্তেন বুঝতে পারে আমার হাতে কী তাস আছে। যেমন ধরুন, বন্ধুর নাম অনিন্দ্য বললে 'থ্রি ডায়মণ্ড', 'সুপ্রিয়'-র নামে ফোন এলে দীপ্তেন উত্তর দেয় 'টু হার্টস' বা 'পুলক'কে ডাকলে দীপ্তেন বুঝে নেয় আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে 'ফোর হার্টস'। দীপ্তেনের বদলে ফোন বাড়ির অন্য কেউ ধরলেও কোনও অসুবিধে হয় না। ফোনে উল্টো-পাল্টা নাম শুনলে প্রয়োজনটুকু শুনে নেয়। 'টেলিপ্যাথির জন্য ডাকা হচ্ছে শুনলে বলে, "ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।" তারপর দীপ্তেনই আমার ওই নামের বন্ধু হিসেবে ফোন ধরে।

'ডেইলি মেল' ও 'রিভিউ অফ রিভিউজ' যে টেলিপ্যাথি দেখে বিস্মিত হয়েছিল।

'৫৫-র আগস্ট মাসে 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলোচনা হচ্ছিল 'র‍্যাশানালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া' এবং র‍্যাশানালিস্ট আন্দোলন নিয়ে। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় কথা প্রসঙ্গে আমাকে জানালেন, এবার রাশিয়ায় তিনি যে ধরনের অদ্ভুত টেলিপ্যাথি দেখেছেন, তার কাছে অমুকের (এক বিখ্যাত জাদুকরের নাম বললেন) এক্স-রে আইয়ের খেলাকেও জোলো মনে হয়। একটি মেয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেয়েটির সহকারী হিসেবে একজন লোক দর্শকদের মধ্যে নেমে এসে দর্শকদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন করেছিলেন। মেয়েটি প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশ্নগুলো ছিল এই ধরনের—

—ইনি পুরুষ না মহিলা ?

—এঁর কোটের রঙ কী ?

—কী রঙের প্যান্ট পরেছেন ?

—এঁর পকেটে কী ?

—এঁর হাতে কী রয়েছে ?

দর্শকদের পকেট থেকে পাসপোর্ট তুলে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কী নিলাম ?

"এই ধরনের নানা রকম প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়েটি। লোকটা যা দেখছে

চিন্তার ওয়েভ ছুঁড়ে তাই জানিয়ে দিচ্ছে মেয়েটিকে। এটাকে এ-ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা দেবে তুমি?" ডঃ চট্টোপাধ্যায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

আমি বলেছিলাম, "এই খেলাটা আমি আর পিংকী দেখাতে পারি এবং অবশ্যই তা লৌকিক উপায়ে।"

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লণ্ডনের আলহামব্রা হল-এ জ্যাগনিস দম্পতি এই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলা দেখিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলকে তাক লাগিয়ে দিলেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'ডেইলি মেল' পত্রিকার মালিক লর্ড নর্থক্লিফ এবং আর এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'রিভিউ অফ রিভিউজ'-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড।

মিস্টার জুলিয়াস দর্শকদের দেওয়া এক একটি জিনিস হাতে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তার তরঙ্গ ছড়িয়ে দেন। দূরে চোখ বাঁধা অবস্থায় মিসেস অ্যাগ্নিস গভীর মনসংযোগের সাহায্যে ধরে নেন জুলিয়াসের চিন্তা তরঙ্গ। ফলে প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি জিনিসের নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে চলেন অ্যাগ্নিস।

জ্যাগনিস দম্পতির 'টেলিপ্যাথি' ক্ষমতা পরীক্ষা করে ডেইলি মেল-এর মালিক লর্ড নর্থক্লিফ ও রিভিউ অফ রিভিউজ-এর সম্পাদক উইকহ্যাম স্টেড নিশ্চিত হলেন, এর মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। জুলিয়াস ও অ্যাগ্নিস সত্যিই 'Psychic' অর্থাৎ 'অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী'। এঁরা অলৌকিক ক্ষমতা বলে একজনের চিন্তা আর একজন ধরে ফেলছেন।

দুটি পত্রিকাতেই ফলাও করে জ্যাগনিস দম্পতির টেলিপ্যাথির খবর প্রচারিত হতে ওরা রাতারাতি বিশ্বখ্যাতি পেয়ে গেলেন। মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যে জ্যাগনিস দম্পতি হয়ে উঠলেন প্রচণ্ড ধনী। আমেরিকার ছেলে জুলিয়ান ও ডেনমার্কের বিকলাঙ্গ মেয়ে অ্যাগ্নিস বিয়ের পর 'জ্যাগনিস দম্পতি' নামেই বিখ্যাত হয়েছিলেন।

এমিল উদঁ্যা ও রবেয়ার উদঁ্যা'র টেলিপ্যাথি :

জ্যাগনিস দম্পতিরও অনেক আগে একই ধরনের টেলিপ্যাথি দেখিয়ে বিশ্বকে বিস্মিত করেছিলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত জাদুকর রবেয়ার উদঁ্যা ও তাঁর ছেলে এমিল উদঁ্যা।

রবেয়ার উদঁ্যা যদিও জাদুকর, কিন্তু এই টেলিপ্যাথির খেলা দেখাবার সময় এটা জাদুর খেলা বলে দেখাননি। দেখিয়েছেন, অলৌকিক ক্ষমতার বিস্ময়কর প্রকাশ হিসেবে।

১৮৪৫-এর জুলাইতে এর ১৮৪৬-এর ১২ ফেব্রুয়ারি বাপ-ছেলেতে দেখালেন টেলিপ্যাথির বিস্ময়কর ক্ষমতা। রবেয়ার উদঁ্যার ছাপানো অনুষ্ঠান সূচীতে যা লেখা ছিল তা হলো—

"রবেয়ার উদঁ্যার পুত্র তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও বিস্ময়কর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা চোখে পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় দর্শকদের পছন্দ করা যে কোনও জিনিসের বর্ণনা করবে।"

রবেয়ার যখন এই টেলিপ্যাথি দেখান তখন ছেলে এমিল-এর বয়েস বছর পনের মাত্র।

এই খেলা আমাদের দেশে :

আমাদের দেশের কিছু ভবঘুরে সম্প্রদায় এই ধরনের খেলা রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-বাজারে সুন্দরভাবে দেখায়। তবে, ওরাও এটাকে জাদুর খেলা বা কৌশলের খেলা হিসেবে স্বীকার করতে নারাজ। ওরাও এটাকে সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারাই ঘটে থাকে বলে জানায়।

ওদের একজন চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকে। তার বুকের উপর রাখা হয় একটা সত্য

সাঁইয়ের তাবিজ। প্রশ্ন করে তার সঙ্গী। নিখুঁত উত্তর দিয়ে চলে শুয়ে থাকা মানুষটি। এই বিষয়ে ওদের সাফ জবাব—এটা শুধু সত্য সাঁইয়ের তাবিজের গুণে হয়। দর্শক বিশ্বাসও করেন সে-কথা। প্রতিটি খেলার শেষেই বেশ কিছু তাবিজও ওরা বিক্রি করে।

এই ধরনের টেলিপ্যাথির আসল রহস্য :

এই একই ধরনের টেলিপ্যাথির খেলা কোন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার সাহায্য ছাড়াই আমি আর আমার পুত্র পিংকী বহু অনুষ্ঠানে ও সেমিনারে সুন্দরভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছি।

একদিনের ঘটনা ১৯৫৫-র ২২শে সেপ্টেম্বর রবিবারের সকাল। ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে জনা বারো বিশিষ্ট যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিদের সামনে ঠিক এই ধরনের টেলিপ্যাথির লেখাই আমরা দু'জনে দেখিয়েছিলাম। সেদিনের প্রদর্শনীতে যদিও আমি সোজাসুজি বলে নিয়েছিলাম যে, আমাদের এই খেলাগুলোর মধ্যে কোনও অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার নেই, অতএব অতীন্দ্রিয় বিশ্বাস নিয়ে দেখার মধ্যে যে নাটকীয়তা, উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ আছে তা আমাদের খেলার মধ্যে পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তবু চোখ বাঁধা পিংকী ওর স্মৃতিশক্তিকে ঠিক মতো কাজে লাগিয়ে আমার অতি সূক্ষ্ম সংকেতগুলোকে ধরে প্রতিটি প্রশ্নের নিখুঁত উত্তর দিয়ে দর্শকদের বিস্মিত করেছিল।

৩ ডিসেম্বর '৮৫ 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকা আয়োজিত 'অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনী'তে টেলিপ্যাথির সাহায্যে নোটের নম্বর বলার কৌশল দেখাচ্ছেন লেখক ও তাঁর পুত্র পিনাকী

—সেদিন আমার প্রশ্ন আর ওর উত্তরগুলো ছিল এই ধরনের—
—"এটা কী ?"
—"ফ্যান।"
—"এটা কী ?"
—"ক্যালেণ্ডার।"
—"উনি কী পোশাক পরে আছেন ?"
—"প্যান্ট-সার্ট।"
—"এই ভদ্রলোকের প্যান্টের রঙ কী ?"
—"নীল।"
—"এটা কী ?"
—"চশমা।"
—"এই ভদ্রলোক পায়ে কী পরেছেন ?"
—"চটি।"
—"এই ভদ্রলোক কী পোশাক পরে আছেন ?"
—"উনি ভদ্রলোক নন, মহিলা। পরে আছেন নীল ছাপা শাড়ি।"
—"আমার হাতে এটা কী ?"
—"কলম।"

৩ ডিসেম্বর '৮৫ 'পরিবর্তন' সাপ্তাহিক পত্রিকা আয়োজিত 'অলৌকিক বিরোধী প্রদর্শনী'তে লেখকের নাড়ী বন্ধ পরীক্ষা করে দেখছেন ডাঃ স্বপনকুমার গোস্বামী

—“এবার হাতে কী নিয়েছি ?”
—“ডট পেন।”
—“আমার হাতে কী ?”
—“একটা বই।”
—“এটা ?”
—“একটা ব্যাগ।”

একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, আমি একাধিকবার প্রশ্ন করে বিভিন্ন ধরনের উত্তর পেয়েছি। যেমন—“এটা কী ?” এই একই প্রশ্ন করে এক একবার এক এক ধরনের উত্তর পেয়েছি। ‘কখনও উত্তর ছিল “ফ্যান”, কখনও “ক্যালেণ্ডার”, কখনও “চশমা”। অর্থাৎ সাধারণভাবে কেউ যদি ভেবে থাকেন, প্রশ্নের মধ্যে শব্দ সাজানোর হেরফেরেই শুধু সংকেত পাঠানো হয় তবে তাঁরা ভুল করবেন। একই শব্দের উচ্চারণের সামান্য পার্থক্যও ভিন্নতর সংকেত বহন করে, যেটা বাইরের কারো পক্ষে অনেক সময় বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

টেলিপ্যাথিতে ইউরি গেলারের অসামান্য সাফল্য :

পৃথিবীর তাবৎ পরামনোবিজ্ঞানীই মনে করেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিটির নাম ইউরি গেলার। গেলারের সঙ্গে আর কারোরই তুলনাই হয় না। গেলার কী না ঘটাতে পারেন ? গেলারের টেলিপ্যাথি ছাড়া সেই সব অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার বিবরণ পরে Psycho-Kinesis বা Pk নিয়ে আলোচনার সময় দেব, কারণ সেটাই হবে প্রাসঙ্গিক।

ইউরি গেলার ইজরাইলের লোক। তাঁকে আমেরিকায় নিয়ে আসেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও ডাক্তার ডক্টর অ্যানড্রিজা পাহাড়িক। ডঃ পাহাড়িক অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। তাঁর পেটেন্ট আবিষ্কারের সংখ্যা ৬০ পেরিয়ে গেছে।

ডঃ পাহাড়িকের সহায়তায় গেলারের যশ যখন গগনচুম্বি তখন ১৯৫৪-এ ‘Nature’-এর মতো বিশ্ব-খ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হলো গেলার টেলিপ্যাথির অসাধারণ সাফল্যের বিবরণ।

আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপ বিজয় করে কোটি-কোটি মানুষের মনে গেলার যে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন ‘Nature’ পত্রিকায় খবরটি প্রকাশিত হবার পর তা যেন বিশ্ব বিজয়ে পরিণত হলো। পরামনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক প্রচারের সুযোগ পেলেন, যেহেতু গেলারের বিষয়ে প্রবন্ধটি ‘নেচার’-এর মতো একটি বিশ্ব-খ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকা ছেপেছে, অতএব গেলারের এই টেলিপ্যাথি বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি পেয়েছে।

পরীক্ষা হয়েছিল স্ট্যাণ্ডফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এ :

স্ট্যাণ্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল স্ট্যাণ্ডফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট। ইনস্টিটিউটের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধসংক্রান্ত গবেষণা। পরবর্তীকালে ইনস্টিটিউট অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সংস্থার হয়ে গবেষণার কাজ করতে থাকে বা গবেষণা কাজে সাহায্য করতে থাকে।

স্ট্যাণ্ডফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট কিছু পরামনোবিজ্ঞানীদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তিবদ্ধ পরামনোবিজ্ঞানীদের অন্যতম ছিলেন ডঃ হ্যারল্ড পুট্‌হফ্ এবং রাসেল টার্‌গ্। গবেষণার বিষয় ছিল ‘অতীন্দ্রিয় অনুভূতি’ বা ‘Extra-sensory perception’।

অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে বিজ্ঞানের মোড়কে মুড়তে ডঃ পুটহফ্‌, রাসেল টারগ এবং ডঃ অ্যানড্রিজা পাহাড়িক হাজির করলেন বিখ্যাত ইউরি গেলারকে। সম্ভবত এই প্রথম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিজ্ঞান গবেষণাগার ব্যবহৃত হলো। প্যারাসাইকোলজিকে বিজ্ঞানের ছাপ মারার পক্ষে ব্যবস্থাটা ভালই নিয়েছিলেন ওঁরা।

পরীক্ষা গ্রহণের সময় ইনস্টিটিউটের একটা শব্দনিরোধক ঘরে ছিলেন ইউরি গেলার। আর একটা শব্দনিরোধক ঘরে ছিলেন কয়েকজন পরীক্ষক। পরীক্ষকদের ঘর থেকে এক একটি ছবির বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক একজন পরীক্ষক। গেলার তাঁর ঘরে বসে এক এক করে এঁকে যাচ্ছিলেন ছবিগুলো। আঁকা যেমনই হোক না কেন, পরীক্ষকদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, তাঁদের দেওয়া বর্ণনাই এঁকেছেন ইউরি গেলার।

একজন পরীক্ষক পরীক্ষা গ্রহণের আগে ইউরি গেলারের তল্লাসী নিতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটিই, গেলার তাঁর শরীরের কোথাও রেডিও রিসিভার বা বেতার গ্রাহকযন্ত্র লুকিয়ে রেখেছেন কিনা। পরীক্ষকদের মধ্যে কেউ যদি বেতার প্রেরক যন্ত্র বা ট্রান্সমিটার লুকিয়ে বহন করেন তবে, গেলারের পক্ষে যান্ত্রিক উপায়ে অতি সহজেই পরীক্ষকদের বর্ণনা শোনা সম্ভব। যাঁরা পরীক্ষাটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁরা গেলারের তল্লাসী নেওয়ার প্রস্তাব এক কথায় নাকচ করে দেন। অতএব পরীক্ষাটি আদৌ নিখুঁত এবং সর্বজনগ্রাহ্য ছিল না। যেখানে কৌশল গ্রহণ করার সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে তল্লাসী করতে না দিলে তাকে আদৌ সফল পরীক্ষা বলা যায় কী?

Nature পত্রিকাও আগেই ঘোষণা করে রেখেছিলেন, কোনও বিজ্ঞান পত্রিকায় কোনও কিছু প্রকাশিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে বিজ্ঞানের স্বীকৃতি পাওয়া।

বধিরদের শোনার একটি ছোট্ট যন্ত্রের পেটেন্ট করানো আছে ইউরি গেলারের গডফাদার ডঃ অ্যানড্রিজা পাহাড়িক-এর নামে। একটি দাঁত তুলে সেই জায়গায় যন্ত্রটি বসানো হয়। যন্ত্রটি বাইরে থেকে পাঠানো তড়িৎ চুম্বকীয় সংকেত ধরে শ্রবণযোগ্য তরঙ্গে পরিণত করে দাঁতের প্রান্তভাগের স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের উদ্দেশ্যে তড়িৎ সংকেত পাঠাবে। ফলে কানের সাহায্য ছাড়াই বিজ্ঞানের সাহায্যে শোনা যাবে। এমন এক ধুরন্ধর গড-ফাদারের বিরুদ্ধে লড়তে গেলারের তল্লাসী নেওয়া খুবই জরুরী বই কী। কারণ, গেলারের দুই প্রাক্তন সহকারী 'শিপি শট্রাং' 'ইয়াসা কাজ' জানিয়েছিলেন ; ইউরির দাঁতেই নাকি রয়েছে বেতার গ্রাহক যন্ত্র।

তবু প্রমাণ করা যায় টেলিপ্যাথি আছে :

টেলিপ্যাথি যে সত্যিই আছে তারই এক উদাহরণ দিয়েছিলাম আমার অগ্রজপ্রতিম এক বিখ্যাত ডাক্তারের কাছে। তাঁকে বলেছিলাম, "দেখুন, আমরা টেলিপ্যাথির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। অথচ পরামনোবিদ্‌রা বলেন—একজন যদি কোনও কিছু গভীরভাবে ভাবতে থাকেন এবং আর একজন যদি তাঁর সেই ভাবনার হদিস পেতে নিজে গভীরভাবে মনঃসংযোগ করেন, তবে প্রথম জনের চিন্তার হদিস পাওয়া দ্বিতীয় জনের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়। আসুন, আমরা পরামনোবিজ্ঞানীদের কথাটা এক-কথায় বাতিল না করে এই বিষয়ে একটা পরীক্ষা করি।"

—"কী ভাবে করবে?" শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বললেন।

—"এক কাজ করি। সূর্যের রশ্মির তো সাতটা রঙ, বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল, আমি এগুলোর মধ্যেই একটা রঙ ভাবছি। আপনিও গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে অনুভব করার চেষ্টা করুন তো, আমি কোন রঙ ভাবছি?"

—"তার মানে তুমি বলছ, আমি গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি কী ভাবছ, তা ধরে ফেলতে পারব ?"

—"আমি আদৌ তা-বলিনি। আমি বলেছি—পরামনোবিদ্‌রা এই তথ্যে বিশ্বাসী। আমরা খুব সিরিয়াসলি এটা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে চাই। দেখতে চাই এর মধ্যে সত্যিই কোন সত্য আছে কিনা।" আমি বললাম।

—"কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে যদি একজন মিথ্যে বলি, তাহলেই তো রঙ মিলে যাবে। অতএব রঙ মিললেই প্রমাণ হবে না টেলিপ্যাথি হচ্ছে।"

আমি বললাম, "বেশ তো, আমি এক টুকরো কাগজে যে রঙটা ভাববো তার নাম লিখে পকেটে রেখে দিচ্ছি। আপনি একাগ্রভাবে চিন্তা করার পর যে রঙটা অনুভব করবেন সেই রঙটার নাম বলবেন। আমি পকেট থেকে কাগজটা বের করব। দুটোতে একই কথা লেখা থাকলে টেলিপ্যাথি নিয়ে আরও কিছু পরীক্ষা চালানো যাবে।"

এক টুকরো কাগজে রঙের নাম লিখে বুকপকেটে রেখে দুজনে এবার চোখ বুজে মনঃসংযোগের চেষ্টা করতে লাগলাম। এক সময় শ্রদ্ধেয় ডাক্তার বললেন, "হলদে"।

বললাম, "ঠিক বলেছেন, হলদেই ভেবেছিলাম।" পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বার করলাম। লেখা রয়েছে "হলদে"।

পরীক্ষার ফল দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন প্রবীণ ডাক্তার। আরও কয়েকবার আমরা পরীক্ষা চালালাম। প্রতিবারই আমি সূর্যের সাতটা রঙের কোনও একটা রঙ কাগজে লিখে পকেটে রাখছি এবং প্রতিবারই উনি কিছুক্ষণ চিন্তার পর সেই রঙটারই উল্লেখ করছেন। যখন ডাক্তারবাবু সিদ্ধান্তে এলেন যে—টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব বাস্তবে রয়েছে, ঠিক তখনই আমি মুখ খুললাম। বললাম, "আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রতিবারই আপনাকে আমি ঠকিয়েছি।"

এবার কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। স্পষ্টতই বললেন—আমি অলৌকিকের বিরোধিতা করতে চাই বলেই টেলিপ্যাথির এই সফল পরীক্ষাকে এখন বুজরুকি বলে বাতিল করতে চাইছি।

শেষ পর্যন্ত আমার কৌশলটা ওঁর কাছে ফাঁস করতে হলো।

টেলিপ্যাথির এই পরীক্ষা শুরু করার আগেই আমার পকেটে ছ'টুকরো কাগজে বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ ও কমলা এই ছটি রঙ লিখে টুকরো কাগজগুলো ভাঁজ করে পর পর সাজিয়ে বুকপকেটে রেখে দিয়েছিলাম। শেষ কাগজের টুকরো, যেটা ডাক্তারবাবুর সামনে নিলাম, সেটায় লিখেছিলাম লাল। ভাঁজ করে পকেটে রাখলাম। এবার আমার পকেটে সাতটি রঙই লেখা রয়েছে। ডাক্তারবাবু হলুদ বলতে আমি পকেটে আঙুল ঢুকিয়ে পরপর সাজানো অনুসারে হলদে লেখাটা বের করে এনেছিলাম।

পরের বার হলুদ লেখাটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার একটা কাগজের টুকরোতে রঙের নাম লিখে যখন পকেটে ঢুকিয়েছিলাম, তখন 'হলুদ' লিখেছিলাম। সাতটি রঙের নামই পকেটে রাখতে হবে তো। আর রাখার সময় হলুদ-এর খোপেই কাগজটা রেখেছিলাম।

অনেকেই বিশ্বাস করেন তাঁদের মধ্যেও মাঝে মাঝে স্বতস্ফূর্তভাবে টেলিপ্যাথির ক্ষমতা প্রকাশিত হয়।

আমার এক অগ্রজপ্রতিম শুভানুধ্যায়ী একবার বিশেষ কাজে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন। সেখানে থাকাকালীন হঠাৎ তাঁর ছেলের কথা ভেবে মনটা অস্থির হলো। ট্রাঙ্ক কলে কলকাতার বাড়িতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও পারলেন না। তার দিন দু'য়েক পর কলকাতার বাড়ির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলেন। খবর পেলেন, ছেলেটি অসুস্থ।

বিদেশ-বিভূই-এ গিয়ে সন্তানের এবং ভালোবাসারজনদের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে কোনও মানুষের যে কোনও সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়াও কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ফলে বিদেশে গিয়ে সন্তানকে নিয়ে চিন্তা এবং সন্তানের অসুস্থতার মধ্যে কোনও অসম্ভবতা আমি দেখতে পাইনি। এটা ঠিক, এই ধরনের ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল কম, কিন্তু এই কম সম্ভাবনার ঘটনাই সেদিন ঘটেছিল।

আমার শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিটির জীবনে এই ধরনের চিন্তার সঙ্গে ঘটনার মিল ঘটেছে বার দু'য়েক। মেলেনি কত বার? হিসেব নেই। স্বভাবতই না মেলার সংখ্যাই ছিল অনেক বেশি। তবু না মেলা ঘটনাগুলো ভুলে গিয়ে উনি মাঝে-মাঝে ভাবেন, সেই মিলে যাওয়া ঘটনা দুটো, ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের ফল—যাকে পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেন টেলিপ্যাথি। আমরা যুক্তিবাদীরা একে বলি নেহাৎই চান্স।' না মিলতে মিলতে হঠাৎই মিলে যাওয়ার ঘটনা। একটা লুডোর ছক্কাতে ছ'টা তল বা পিঠ রয়েছে। ছটা গোল দাগ আছে একটা পিঠে, আর পাঁচটা পিঠে আছে এক, দুই, তিন, চার ও পাঁচ। বেশ কয়েকবার ছক্কা চালতে চালতে একবার নিশ্চয়ই ছক্কা পড়বে, তা সে প্রথম বারেও পড়তে পারে দশম বারেও পড়তে পারে। তেমনি আপনি বিভিন্ন সম্ভাব্য ঘটনার কথা চিন্তা করতে থাকলে এক আধ-বার অবশ্যই মিলবে।

আমার এক পরিচিত তরুণ এবং আমার এককালের সহকর্মী, নাম ধরে নেওয়া যাক তরুণ, একবার তার দুর্বলতম মুহূর্তে আমাকে বলল তার স্ত্রীর চরিত্রে একটু গণ্ডগোল আছে। মাত্র বছর তিনেক হল বিয়ে হয়েছে। একটি দেড়বছরের ছোট্ট সুন্দর মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলাম, "এই ধারণার পিছনে কী কারণ রয়েছে?"

তরুণ বললো, "সেদিন অফিসে কাজ করছি, হঠাৎ আমার ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় আমাকে জানিয়ে দিল বাড়িতে আমার স্ত্রী কোনও পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে গল্প-সল্প করছে। শরীর খারাপ লাগার অজুহাতে আমার কাজ পাশের টেবিলের বন্ধুর ওপর চাপিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। বাড়ি গিয়ে দেখি আমার স্ত্রীর দূর সম্পর্কের কোন এক ভাই এসেছে। ওরা দুটিতে গল্প-সল্প করছে।"

তরুণের বিয়ে হয়েছিল ওর চেয়ে যথেষ্ট অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ের সঙ্গে। তরুণের বিয়ের আগে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, বিয়ের পরেও তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। এই ভালোবাসার জন্যে নিজের মনের মধ্যে একটা পাপবোধ জন্মেছিল। অবচেতন মন নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিত, বউও নিশ্চয়ই ধোয়া তুলসী পাতা নয়, হয়তো আমার মতোই লুকিয়ে-চুরিয়ে প্রেম-ট্রেম করে। এর আগেও কয়েকবার তরুণ অসময়ে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে পরীক্ষা করতে চেয়েছে। শেষদিন ও স্ত্রীকে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে গল্প করতে দেখে বাইরে-বাইরে অসুখী হলেও মনের ভিতরে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছে—আমার স্ত্রী'র চরিত্রও তবে আমারই মতো একটু গণ্ডগোল।

স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা করতে এর আগেও কয়েকবার ও অসময়ে বাড়ি ফিরেছে এবং সেই সেই দিনগুলোতে ওর মনে হয়েছিল—আজ গেলে হাতে-নাতে ধরতে পারব। প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। শেষবার ওর ধারণা মতো স্ত্রী'কে প্রেম করার সময় ধরে ফেলে এবং তা নাকি সম্ভব হয়েছিল ওর ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। এইসব কথাই তরুণের কাছ থেকে আমি জেনেছি।

ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের সাড়া পেয়ে বেশ কয়েকবার বাড়ি গিয়ে ব্যর্থতার পর একবার তরুণের সফলতা (?) সত্যিই ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ কী?

আমি তখন স্কুলে পড়ি। দিদিমা এলেন আমাদের খড়গপুরের রেল-কোয়ার্টারে কিছু দিনের জন্যে বেড়াতে। ফর্সা ছোট-খাট চেহারা। রাতে পড়াশুনোর পাঠ চুকলে আমরা ভাই-বোনেরা দিদিমার কাছে গোল হয়ে বসে গল্প শুনতাম। দিবানিদ্রার অভ্যেস ছিল দিদিমার। একদিন

দুপুরে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠলেন তিনি। স্বপ্ন দেখেছিলেন, একজন দীর্ঘদেহী লোক দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিদিমা বার-বারই লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "কে তুমি ? কী চাই ?" লোকটা কোনও উত্তর দেয়নি। লোকটার মুখটাও ভালোমতো দেখতে পাননি দিদিমা।

সেদিন রাতেই বাবা কলকাতা থেকে খবর আনলেন, আমার মামীমার কাকা পূর্ণচন্দ্র দাশ (ত্রিকোণ পার্কে যাঁর একটি মূর্তি ও কলকাতায় যাঁর নামে একটি রাস্তা আছে) খুন হয়েছেন। দিদিমা খবর শুনে কাঁদলেন। বললেন, "ওর আত্মাই আমাকে দেখা দিয়ে গেল।" বাঁড়ির বড়রা বললেন, "কত দূরের ঘটনা এখান থেকেই উনি বুঝতে পেরেছিলেন। একেই বলে টেলিপ্যাথি।"

কিন্তু, দিদিমা কখন পূর্ণ দাশকে দেখলেন ? কখনই বা পূর্ণ দাশের মৃত্যু বুঝতে পারলেন ? স্বপ্নে দেখলেন, একজন দরজাব সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাবার কাছে পূর্ণ দাশের মৃত্যুর খবর শোনার পর সকলেই যা হোক একটা জোড়াতালি দেওয়া যুক্তি খাড়া করে দুটো ঘটনাকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে গোটা ব্যাপারটায় একটা অলৌকিক চেহারা দিতে চাইলেন। আসলে সকলেই সুযোগ পেলে একটা অলৌকিক কিছু দেখতে চান।

এমনি করে, একান্তভাবে অলৌকিক কিছু দেখতে চাওয়ার ইচ্ছে বা নিজেকে ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের অধিকারী বলে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করার জন্যেই অনেক সময় মানুষ জোড়াতালি দিয়ে চিন্তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে।

পর পর দুটি সন্তান মারা যাওয়ার পর রমেনবাবুর তৃতীয় সন্তান এলো মেয়ে। নাম রাখলেন শ্যামলী। রমেনবাবু রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। পেশায় ডাক্তার হলেও তেমন পশাব জমাতে পারেন নি। স্ত্রী সুনেত্রা একটা স্কুলে পড়ান। একমাত্র মেয়ে শ্যামলী এখন ক্লাশ এইটের কিশোরী। কিন্তু পাড়ার আর সব মেয়েদের মতো হৈ-চৈ করে এদিক ওদিক বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ নেই। মাঝে-মধ্যে যদিও বা কারো সঙ্গে কোথাও যায়, যাওয়ার আগে রমেনবাবু শ্যামলীকে নানান রকমের সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেন।

একদিন রমেনবাবু রাতে চেম্বারে রোগী দেখছেন। হঠাৎই তাঁর মন শ্যামলীর কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠলো। শ্যামলীর মেট্রোতে গৌতম ঘোষের 'পার' দেখতে যাওয়ার কথা। সঙ্গে যদিও ওর মা থাকবে। তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলেন। সেদিন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরলেন রমেনবাবু। দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই ! শ্যামলীর একটা বিপদ হয়েছে। তাড়াতাড়ি বাস থেকে নামতে গিয়ে রাস্তার একটা ছোট গর্তে পা পড়ে ডান পা মুচকে গেছে, যথেষ্ট ফুলে রয়েছে। এতেই রমেনবাবু ধরে নিলেন যে, তাঁব টেলিপ্যাথির ক্ষমতা আছে। এর আগেও কয়েকটা ক্ষেত্রে রমেনবাবু তাঁর টেলিপ্যাথি ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছেন। তবে বেশির ভাগই এই বিপদ সংকেত পান মেয়ের ব্যাপারে।

দুই সন্তানের মৃত্যুর পর শ্যামলীকে পেয়ে হারাবার ভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত থাকেন রমেনবাবু। তাই বার-বারই শ্যামলীর বিপদ আশঙ্কায় বিচলিত হন। বার বার ঘুরে ফিরে আসা চিন্তাগুলোর মধ্যে দু-একটা মিলেও যায়। অমনি রমেনবাবু যে চিন্তাটা বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেল সেটার কথাই ভাবতে থাকেন। ভুলে যান যে তাঁর বেশির ভাগ চিন্তাই বাস্তবে মেলেনি।

আমার এক সাংবাদিক বন্ধু বিশেষ কাজে বম্বে যেতে বাধ্য হলেন। স্ত্রী তখন সন্তানসম্ভবা। একদিন হঠাৎই মনটা ছট্‌ফট্ করে উঠলো স্ত্রীর বিপদের আশঙ্কায়। কলকাতার বাড়িতে ফোন করে খবর পেলেন স্ত্রী সন্তান প্রসব করে মারা গেছেন।

ঘটনাটা চিন্তার সঙ্গে মিলেছিল। কিন্তু, আমাদের চিন্তা তো পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভর করে, স্ত্রীর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। এই সময় স্ত্রীর পাশে থাকতে না পারার দরুন একটা

দুশ্চিন্তা সব সময় ছিল বন্ধুর মনে। আর সেই দুশ্চিন্তাটাই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই যে ঘটনাগুলো বললাম, এর কোনটার দ্বারাই টেলিপ্যাথির অস্তিত্ব প্রমাণ হয় না। যিনি নিজের সম্বন্ধে মনে করেন, তাঁর মধ্যে মাঝে মধ্যে টেলিপ্যাথির ক্ষমতা স্বতস্ফূর্তভাবে এসে হাজির হয়, তিনি এবার থেকে একটি পদ্ধতি অবলম্বন করুন, যখন এই ধরনের ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির উদয় হবে, তখনই লিখে রাখুন এবং মিলিয়ে দেখুন, আপনার চিন্তাটাই বাস্তবে ঘটল কিনা। হয় চিন্তাটি মিলবে, অথবা মিলবে না। অর্থাৎ উত্তর হবে 'হ্যাঁ' অথবা 'না', যাই হোক লিখে রাখুন। এমনি করে বেশ কিছু ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি লাভ করার পর, আপনার হিসেব রাখার খাতাটাকে খুলুন, দেখুন তো কতবার মিলেছে? অবশ্যই দেখবেন যে—না মেলা ঘটনার সংখ্যা মেলার চেয়ে বহুগুণ বেশি।

আমি বেশ কিছু পরিচিত ও ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ে বিশ্বাসী মানুষকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলে এবং করিয়ে অভাবনীয় ফল পেয়েছি। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের আগেকার ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

Precognition (ভবিষ্যৎ দৃষ্টি)

বিজ্ঞান বিশ্বাস করে, যে ঘটনা আদৌ ঘটেনি তা কোনও ভাবেই দেখা সম্ভব নয়, অনুমান করা যেতে পারে মাত্র এবং সেই অনুমান যেমন ভুল হতে পারে তেমনি ঠিকও হতে পারে।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রীকগ্‌নিশন্ (Precognition) শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনাকে দেখা যায়। ঠিকুজি-কোষ্ঠী, হাত, কপাল বা কান থেকে মানুষের ভবিষ্যৎ গণনার সঙ্গে প্রীকগ্‌নিশন্ শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতের ঘটনা দেখতে পাওয়ার মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য আছে।

জ্যোতিষীরা যে ভাবে যে পদ্ধতিতেই ভাগ্য গণনা করুন না কেন, তার মধ্যে একটা 'গণনা' বা 'Calculation' কথা রয়েছে। প্রীকগ্‌নিশন শক্তির অধিকারী বা 'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা' কোনও ব্যক্তির সম্বন্ধে কোনও কিছু গণনা বা Calculation করে বলেন না। তাঁরা ভবিষ্যতে যে ঘটনা ঘটবে সেটা বিশেষ অনুভূতি বা ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয়ের ফলে স্পষ্টই দেখতে পান বা অনুভব করতে পারেন।

দেশের কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির কবে মৃত্যু ঘটবে, কোনও লোক কবে একটা বিশেষ ধরনের বিপদে পড়বে, কোন একটা বিশেষ দিনে কোনও একটা বিশেষ রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে, কোন দিন নায়গ্রা জলপ্রপাত ভেঙ্গে পড়বে, কোন্ দিন মেক্সিকো সিটিতে ভয়াবহ ভূমিকম্প ঘটবে ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনাই প্রীকগ্‌নিশন্ শক্তির অধিকারীরা অনুভব করতে পারেন।

আমার প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়-এর শঙ্কু কাহিনীতে নকুড়বাবু এমনি এক চরিত্র, যাঁর প্রীকগ্‌নিশন্ শক্তি রয়েছে। গল্পে লেখকের কলমের আঁচড়ে যা সম্ভব, বাস্তবে তা কিন্তু মোটেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত এই ধরনের কোনও শক্তির পরিচয় পায়নি, পরামনোবিজ্ঞানীরাও হাজির করতে পারেন নি এই ধরনের কোনও শক্তিধর লোককে।

আব্রাহাম লিংকন নিজের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলেন মৃত্যুর আগের দিন :

আব্রাহাম লিংকন সম্বন্ধে একটি প্রচলিত কাহিনী আছে। তিনি একবার স্বপ্ন দেখলেন—একটি কফিন ঘিরে বিশাল ভীড়। কালো পোশাক পরা বহু অভিজাত পুরুষ ও

নারীর ভীড়ে সাদা ফুলে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে কফিনটা। কার কফিন ? কফিনের ভিতরটাও দেখতে পেলেন লিংকন। কফিনের ভিতরে শায়িত রয়েছে তাঁরই মৃতদেহ।

যেদিন লিংকন স্বপ্নটা দেখেন তার পরদিনই আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিলেন লিংকন।

লিংকনের এই স্বপ্নের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁরই ডায়রী থেকে। এইটুকু শোনার পর অনেকেরই মনে হতে পারে লিংকন অন্ততঃ একবারের জন্য প্রীকগ্‌নিশন্ বা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। অন্ততঃ পরামানোবিজ্ঞানীরা তো তাই বলেন।

না। ব্যাপারটার মধ্যে আদৌ সামান্যতম অলৌকিকত্ব বা অতীন্দ্রিয় কিছুই নেই। স্বপ্ন নিয়ে সামান্য দু-একটা কথা বললে বিষয়টা বুঝতে আশা করি অসুবিধে হবে না।

মানুষের স্বপ্নে অনেক সময়ই তার চিন্তা-ভাবনা প্রতিফলিত হয়। আর চিন্তা-ভাবনা সব সময় যে সচেতনভাবে এসে হাজির হয় তাও নয়। অনেক সময় পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থার ছাপও এসে পড়ে মানুষের অবচেতন মনে। এই চেতন বা অবচেতন মনের ভাবই বহু ক্ষেত্রে স্বপ্নে অগভীর ঘুমের মধ্যে হানা দেয়। গভীর ঘুমে মানুষের স্বপ্ন দেখার সম্ভাবনা খুবই কম, প্রায় নেই বললেই চলে। গভীর ঘুমে যদিও বা স্বপ্ন দেখা দেয় তবু, সে-স্বপ্ন সাধারণত আমাদের মনে থাকে না।

শোনা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনও কোনও গল্পের প্লট পেয়েছিলেন স্বপ্নে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেকুলে কার্বনের গঠন-কাঠামোর রূপটি স্বপ্নেই প্রথম দেখেছিলেন। অনেক কবি স্বপ্নে কবিতা লিখে ফেলেন। কোলরিজ তো একটা পুরো কবিতাই স্বপ্নে দেখে লিখে ফেলেন। কেউ স্বপ্নে একটা জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। আর কেউ-বা স্বপ্নে পান ঈশ্বরের দর্শন, ঈশ্বরের মন্ত্র বা ঈশ্বরের আদেশ।

লক্ষ্য করলেই দেখবেন, একজন কবি কিন্তু কোনদিনই তাঁর অজানা এক জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে স্বপ্ন দেখবেন না। একজন কাব্যরসে বঞ্চিত লোক স্বপ্নে কোনদিনই কাব্যগুণ সম্পন্ন কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন না। একজন ঈশ্বরে বিশ্বাসী লোকই শুধু ঈশ্বর নিয়ে স্বপ্ন দেখতে পারেন। আব্রাহাম লিংকন যে কঠিন ও অগ্নিময় পরিস্থিতির মধ্যে দেশ শাসন করছিলেন, তাতে তাঁর খুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল সম সময়ই। আর সেটা লিংকনেরও মোটেই অজানা ছিল না। এই অবস্থায় লিংকনের নিজের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখা এবং সেটা বাস্তবে ঘটে যাওয়ার মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা আসছে কোথা থেকে ? এই প্রসঙ্গে এ-টুকুও জানিয়ে রাখি, নিজের মৃত্যু নিয়ে লিংকন এর আগেও বেশ কয়েকবার স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু মরেছেন ওই একবারই।

ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার রায় সত্যজিৎ রায়ের বেলায় মেলেনি :

১৯৫৫-র ২৩ জুলাই, 'আনন্দমেলা'র দপ্তরে গল্প করছিলাম আমি, শ্যামলকান্তি দাশ ও রতনতনু ঘাটী। শ্যামল বললেন—আজ ভোর রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছেন। অদ্ভুত জীবন্ত স্বপ্ন, সত্যজিৎ রায় মারা গেছেন। কলকাতার প্রতিটি পত্রিকায় বিশাল বিশাল হরফে হেড-লাইন দিয়ে অনেক ছবির সঙ্গে গোটা পত্রিকাটাই প্রায় সত্যজিৎবাবুর খবরে ঠাসা। ২০ হাজার শোকার্ত লোকের বিশাল শব-মিছিল বেরুল 'বিশপ লেফ্রয়' রোডের বাড়ি থেকে। কেওড়াতলায় পোড়ানো হলো মরদেহ।

শ্যামল আরও জানালেন, ওঁর দেখা স্বপ্নগুলো আশ্চর্যজনকভাবে সত্যি হয়। অনেকবার

অনেকের মৃত্যু নিয়ে স্বপ্ন দেখার পর লক্ষ্য করেছেন, দু'একদিনের মধ্যেই তাঁদের মৃত্যু ঘটে। আমার লেখক বন্ধুটিকে বললাম, "দেখাই যাক, তোমার এবারের স্বপ্ন সত্যি হয় কিনা !" কিন্তু, সত্যি হলেও কী এটাকে তোমার ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার শক্তি বলে মেনে নেওয়া যাবে ? সত্যজিৎবাবুর অসুস্থতার খবর কারোরই অজানা নয়। তাঁর যথেষ্ট বয়েসও হয়েছে। এই ক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে এই ধরনের স্বপ্ন দেখা তোমার মতো একজন শিল্প-সাহিত্যের প্রেমিকের পক্ষে কোনই অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তুমি আগের কিছু স্বপ্নের ক্ষেত্রেও সে-গুলিকে সত্যি হতে দেখেছ, কিন্তু, যতগুলো স্বপ্ন আজ পর্যন্ত দেখেছ, তার মধ্যে কতগুলো সত্যি হয়েছে লিখে রেখে হিসেব করে দেখছ কী ?"

শ্যামলের সঙ্গে আলোচনা হলেও, শ্যামল আমার যুক্তিগুলোকে সম্ভবতঃ মেনে নিতে পারেন নি। ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবারের স্বপ্নটাও সত্যি হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি হয়নি। এই লেখাটিতে কলম চালানো পর্যন্ত আমার প্রিয় লেখক ও পরিচালক সত্যজিৎ রায় আমাদের মধ্যেই আছেন।

নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙ্গে পড়ার ভবিষ্যদ্বাণী :

বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই একটা ভবিষ্যদ্বাণী যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। ব্রিজওয়াটার-এর প্যাট সেণ্ট জন ভবিষ্যদ্বাণী করেন ৫৯-এর ২২ জুলাই স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা ৫৬ মিনিটে নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভেঙ্গে পড়বে। সংবাদটিকে গুরুত্ব দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক বাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা এসে হাজির হয়েছিলেন। ঘটনাকে সেলুলয়েডে বন্দী করতে হাজির ছিলেন বিভিন্ন টি·ভি· কোম্পানী। ভবিষ্যৎদ্বাণীর খবরটি টেলিভিশন মারফৎ প্রচারিত হওয়ায় শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যেই যথেষ্ট ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

ঘটনার দিন বিকেলের আগেই নায়াগ্রা নদীর জেটিতে এসে হাজির হলেন 'দি হিউম্যানিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক পল কুরৎজ ও তাঁর বারো-চোদ্দ বছরের ছেলে। তারপর এঁরা যা করলেন তা দেখে উপস্থিত হাজার-হাজার দর্শক, সাংবাদিক ও টি·ভির লোকেরা হতভম্ব। পল কুরৎজ ও তাঁর ছেলে উঠলেন স্টীমারে, ভয়ংকর মুহূর্তে কী ওঁরা 'মেড অফ দ্যা মিস্ট' স্টিমারে চেপে নায়াগ্রা নদীতে ভ্রমণ করতে চান ? এ তো চূড়ান্ত পাগলামো। নায়াগ্রা জলপ্রপাত ভাঙলে নায়াগ্রা নদীর অবস্থা যে কী হবে তা কী বুঝতে পারছেন না একজন বুদ্ধিজীবী দুঁদে সম্পাদক কুরৎজ !

কুরৎজ'র এই কাণ্ড-কারখানার ছবিও উঠে গেল একগাদা। এক সাংবাদিক তো কুরৎজ'-কে স্টিমারে ওঠার আগে জিজ্ঞেসই করে ফেললেন, "আপনার এই ধরনের হঠকারী ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের কারণ কী ?"

কুরৎজ উত্তর দিয়েছিলেন, "সিদ্ধান্তটা হঠকারী নয়, বরং বলতে পারেন যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত। আর বিপজ্জনক বলছেন ? কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারবেন, আপনার এই কথাগুলো কত ভুল।"

কুরৎজ'র সিদ্ধান্ত এবং যুক্তিবাদী বিচার শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়েছিল। সেণ্ট জনের ভবিষ্যদ্বাণী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছিল।

'Clairvoyance' (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) :

পরামনোবিদ্‌দের মতে ক্লেয়ারভয়ান্স (clairvoyance) শক্তির সাহায্যে বহু দূরের ঘটনা দেখা ও শোনা সম্ভব। (বোঝার সুবিধের জন্য উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করছি)। আমাদের কলকাতার এক প্রবীণ সাংবাদিক এক বাঙালী তান্ত্রিকের পরম বিশ্বাসী ভক্ত। যে-সময়ের ঘটনা বলছি তান্ত্রিকবাবা তখন বেঁচে। সাংবাদিক ভদ্রলোক বিদেশে একবার অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন হাসপাতালে ছিলেন। ফিরে এসে ঘটনাটা তান্ত্রিকবাবাকে বলতে তিনি বলেছিলেন, "ওরে, সে আমি দেখেছি। তোর ঘরে যে নার্স মেয়েটি ফুল রেখে যেত, সে বড় ভালরে।"

তান্ত্রিকবাবা ওই এক কথাতেই বাজি মাৎ করে দিয়েছিলেন। প্রবীণ সাংবাদিক সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে ফেললেন তান্ত্রিকবাবার অতীন্দ্রিয় শক্তি (clarivoyance) আছে।

অনেক সভ্যদেশের হাসপাতালের কেবিনে ফুলদানে ফুল থাকে, এটুকু জানা থাকলেই যে এই ধরনের কথা বলা যায় অন্ধ-বিশ্বাসীকে তা কে বোঝাবে?

অ্যাসিলিন-এর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

১৯৫৮-এর ফেব্রুয়ারিতে শ্রী...র পত্রিকায় অ্যাসিলিন নামে একটি মেয়ের অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা প্রকাশিত হয়। কোনও বাক্সে একটি টাকার নোটকে বন্ধ করে রাখলে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে মেয়েটি নাকি সেই নোটের নম্বর বলতে সক্ষম।

অ্যাসিলিন-এর দাবীর সত্যতা পরীক্ষার জন্য ডঃ আব্রাহাম থোমাস কোভুর যোগাযোগ করেন। অ্যাসিলিন তাঁর দাবীর সত্যতা প্রমাণের পরীক্ষায় নামতে রাজি হন। তারিখ ঠিক হয় ১২ মার্চ। কিন্তু, দুঃখের কথা এই যে শেষ পর্যন্ত অ্যাসিলিন পরীক্ষার দিন আর হাজির হননি। অতএব এইটুকু বলতে পারি যে, তাঁর দাবী আদৌ সত্যি বলে প্রমাণিত হয়নি বরং তাঁর এই অনুপস্থিতি দাবীর অসারতারই সাক্ষ্য বহন করে।

সাধু-সন্ন্যাসীর অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি

স্টেট ব্যাঙ্ক কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চের এক ডেপুটি ম্যানেজার পারিবারিক শান্তির আশায় এক বিখ্যাত তান্ত্রিকের দ্বারস্থ হতেন। তাঁর মতে ওই সাধুবাবু যে কোনও কিছু অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা দেখতে পেতেন। ধরুন, একজন কেউ জিজ্ঞেস করলো, "বলুন তো আমার বারান্দার টবে কী ফুলের গাছ লাগিয়েছি?" অথবা, "আমার স্ত্রীকে কেমন দেখতে বলুন তো?" অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাহায্যে তান্ত্রিক প্রশ্নকর্তার বাগানের ফুলের টব বা তাঁর স্ত্রীকে দেখতে পেতেন এবং লিখে ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দিতেন। ডেপুটি ম্যানেজারের এই দেখাকে আমি অবিশ্বাস করিনি, কারণ বর্তমানে পশ্চিম বাংলাতেই পাঁচজন তান্ত্রিকের খোঁজ পেয়েছি, যাঁরা এই ধরনের নানারকম প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম। প্রশ্নগুলো অনেক সময় অদ্ভুত ধরনেরও হতে পারে, যেমন, "বলুন তো আমার বাড়িতে কটা বেড়াল আছে?" বা "আমার পড়ার ঘরে কী ধরনের ফ্যান আছে দেখতে পাচ্ছেন? টেবিল ফ্যান না সিলিং ফ্যান?"

এইসব তান্ত্রিক বা ক্লেয়ারভয়ান্স (অতীন্দ্রিয় অনুভূতি) ক্ষমতার অধিকারীদের নানারকম ছাপানো প্রচারপত্র বা জীবনীর বইতে তাঁদের গুণগ্রাহীদের তালিকায় যেসব বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ডাক্তার লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের নাম দেখেছি, তাতে সত্যিই চমকে গিয়েছি। কৌশলের

সাহায্যে এই খেলা আমিও সফলভাবে দেখাতে সক্ষম। এও জানি কৌশল ব্যবহারের রাস্তা বন্ধ করে দিলে এইসব অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারীরা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হবেন।

১৯৫৫-র ১৮ এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বিজ্ঞান বিভাগের একটি বিশেষ বেতার অনুষ্ঠানে আমি এমনি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারী বলে বহুল প্রচারিত পাগলাবাবার (বারাণসী) মুখোমুখি হয়েছিলাম। তিনি যদিও আকাশবাণী ভবনেই সফলভাবে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছিলেন কয়েকজনের কাছে, কিন্তু, স্টুডিওতে (রেকর্ডিং রুমে) তাঁকে লিখে উত্তর দিতে দিইনি, উত্তর দিতে হয়েছিল মুখে মুখে। আমার তরফ থেকে প্রশ্ন করার জন্যে হাজির করেছিলাম চিত্র-সাংবাদিক কল্যাণ চক্রবর্তী, প্রকাশক ময়ূখ বসু ও একাধারে চার্টার্ড ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকাশক বন্ধু রঞ্জন সেনগুপ্তকে।
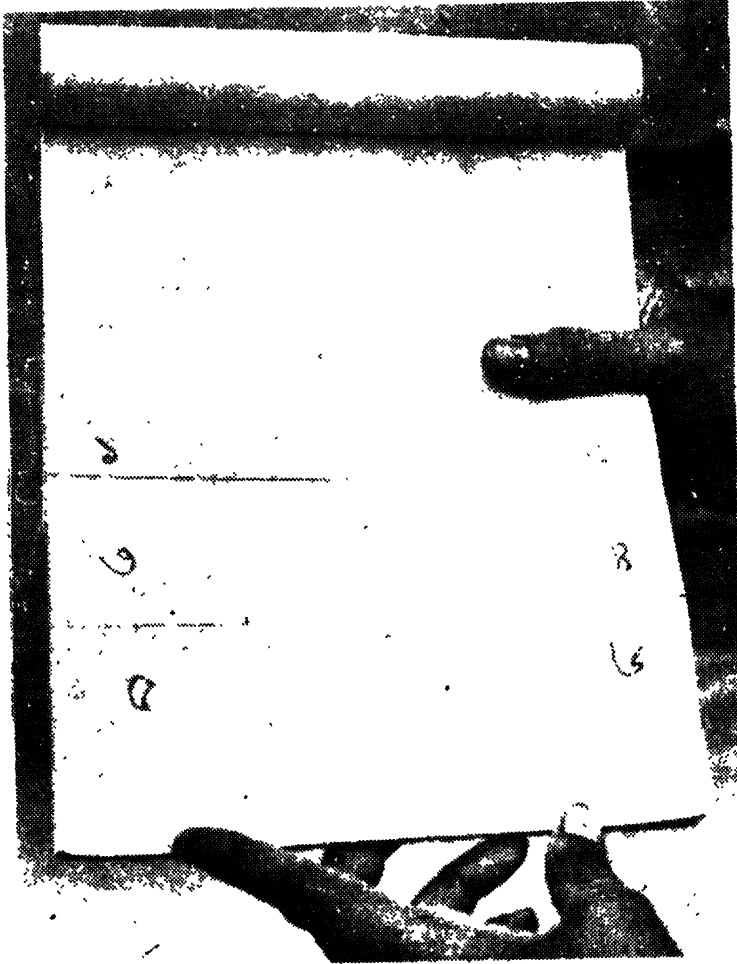
থট-রিডিং-এর আসল রহস্য

কল্যাণ প্রশ্ন করেছিলেন, "আমার সঙ্গের ক্যামেরাটায় কটা ছবি তোলা হয়েছে?"

—"১৬ থেকে ১৭টা।" পাগলাবাবা বলেছিলেন।

ক্যামেরা ইণ্ডিকেটারে দেখা গেল তোলা হয়েছে ৩০টা।

ময়ুখ জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার মানিব্যাগে কত টাকা আছে?"

—"৭৭ টাকা।"

ব্যাগ খুলে দেখা গেল ২৭০ টাকা।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আমার সিগারেটের প্যাকেটে কটা সিগারেট আছে?"

—"৭টা।"

সিগারেটের প্যাকেট খুলে দেখা গেল ৯টা সিগারেট রয়েছে।

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারীকে তিনবার পরীক্ষা করে দেখলাম তিনবারই ফেল করলেন। কেন বলুন তো? কারণ ওই একটিই, তাঁকে লিখে উত্তর দিতে দিইনি।

লিখে উত্তর দেওয়ার সময় সম্ভাব্য সব উত্তর লিখে রেখে তারপর প্রশ্নকর্তার কাছ থেকে উত্তরটা জেনে নিয়ে কাগজ ভাঁজ করে ও আঙুলের কারসাজিতে আসল উত্তরটি ছাড়া বাকি সব উত্তরই ঢেকে দেওয়া হয়। ফলে প্রশ্নকর্তা দেখতে পান খাতাতে সঠিক উত্তরই লিখে রেখেছেন অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির অধিকারী সাধকবাবাজী।

এই লিখে উত্তর দেওয়ার বিষয় নিয়ে আগেই দীর্ঘ আলোচনা করেছি। তাই এখানে সংক্ষেপে সারলাম। এই খেলাই ঠিক মতো দেখাতে পারলে যাঁরা দেখেন তাঁরা প্রত্যেকেই অবাক হয়ে যান। এই বিস্ময় আমি দেখেছি অনেক প্রতিষ্ঠিত চোখেই। যাঁদের দেখিয়ে অবাক করেছিলাম তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, কলকাতা পুলিশের ডি·সি· হেডকোয়ার্টার সুবিমল দাসগুপ্ত, ডাঃ আবীরলাল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রণধীর বসু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামসুন্দর দে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিনের দুই অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল ও ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য, আকাশবাণী কলকাতার বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ অমিত চক্রবর্তী ও ডঃ সুভাষ সান্যাল, প্রাইস ওয়াটার-এর চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট কামাখ্যাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কবি সাধনা মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক শেখর বসু, রঞ্জন ভাদুড়ী, শ্যামলকান্তি দাশ এবং আরো অনেকেই। সুতরাং এই খেলা ঠিক মতো পরিবেশে দেখিয়ে এই সব অতীন্দ্রিয়বাবারা যে বিখ্যাত বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের সার্টিফিকেট পাবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী!

ইউরি গেলারের থট রিডিং

ইউরি গেলারের গড-ফাদার পাহারিখ প্রথম ইউরির যে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সেটি ছিল থট রিডিং। পাহারিখ-কে ইউরি ১ থেকে ১০-এর মধ্যে যে কোনও একটি সংখ্যা ভাবতে বলেছিলেন। পাহারিখ ভেবেছিলেন। ইউরি একটা রাইটিং-প্যাডে একটা সংখ্যা লিখে কলমটি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "বলো, কত ভেবেছ?"

পাহারিখ উত্তর দিতেই তাঁর চোখের সামনে রাইটিং-প্যাডটা মেলে ধরেছিলেন ইউরি। সেই সংখ্যাটিই লেখা রয়েছে।

ঠিক এই খেলাই আগরতলার প্রেস কনফারেন্সে (২৮·২·৫৬) আরো কঠিনভাবে দেখাই। সংখ্যাটা ভাবতে বলেছিলাম ১ থেকে ১০০-র মধ্যে।

ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি

অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির জন্য বিশ্বের সবচেয়ে নামী দামী ব্যক্তিটি হলেন ইউরি গেলার। গেলার

হলেন পরামনোবিজ্ঞানীদের মাথার মণি। গেলারের গড-ফাদার ডক্টর অ্যানড্রিজা পাহাড়িক-এর ব্যবস্থাপনায় অনেক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে গেলার তাঁর এই ক্লেয়ারভয়ান্স বা অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি প্রমাণ করেছেন। একটা মোটা খামের ভিতরে একটা ছবি রেখে খামটা সীল বন্ধ করে গেলারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে গেলার প্রতিবারই ভিতরের ছবির সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। খামটিকে এমন পুরু রাখা হয়েছিল যাতে তীব্র আলোর সামনে খামটিকে ধরলেও ছবিটা ফুটে না ওঠে।

গেলারের পদ্ধতিতেই আমি একইভাবে আমার অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির (?) প্রমাণ রাখতে পেরেছি একাধিকবার। চমকে যাওয়ার মতোই ঘটনা, তবে সবিনয়ে স্বীকার করছি আমার কোনও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নেই, কারণ যে জিনিসের অস্তিত্বই নেই, তা আমারই বা থাকবে কী করে? আমি যে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির খেলা দেখাই তার পিছনে অবশ্যই রয়েছে কৌশল। দর্শকদের দৃষ্টির আড়ালে সীল করা খামটা ডুবিয়ে নিই অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইণ্ড স্পিরিটে। সামান্য সময়ের জন্য খামটা স্বচ্ছ হয়ে যায়, অতএব ভিতরের ছবিটা একটুক্ষণের জন্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দর্শকদের চোখের আড়ালে চোখ বুলিয়ে নিই খামের ওপরে। তারপর একটু সময় কাটিয়ে যখন ছবির বর্ণনা দিই তখন অ্যাবসলিউট অ্যালকোহল বা রিফাইণ্ড স্পিরিট উবে গিয়ে আবার অস্বচ্ছ হয়ে যায়।

Psycho-Kinesis বা Pk (মানসিক শক্তি)

বিজ্ঞানের পরিচিত শক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে বিদ্যুৎ শক্তি, আলোক শক্তি, চৌম্বক শক্তি, শব্দ শক্তি ইত্যাদি। মানসিক শক্তি বা চিন্তাশক্তির খোঁজ বিজ্ঞানের জানা নেই। চিন্তা হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ, চিন্তার দ্বারা মানুষের শারীরিক কিছু পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব, কিন্তু এমন কোনও শক্তি সৃষ্টি সম্ভব নয় যার দ্বারা টেবিলে শুইয়ে রাখা একটি সিগারেটকে দাঁড় করানো যেতে পারে, অথবা সম্ভব নয় মানসিক শক্তির প্রভাবে একটি চামচকে বাঁকিয়ে ফেলা বা একটি গাড়িকে শূন্যে কিছুক্ষণের জন্যে তুলে রাখা অথবা কোনও ট্রেণকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া। এই ধরনের প্রতিটি ঘটনা ঘটাতে প্রয়োজন অন্য ধরনের শক্তি প্রয়োগ। কৌশলে অন্য ধরনের শক্তি প্রয়োগ করে কোনও ঘটনা ঘটিয়ে মানসিক শক্তি হিসেবে তাকে হাজির করার চেষ্টা পরামনোবিদরা বহুবারই করেছেন। পরামনোবিজ্ঞানীরা যা পারেননি তা হলো সত্যিকারের মানসিক শক্তির কোনও প্রমাণ হাজির করতে।

মানসিক চিন্তার ফলে যে দেহের নানা ধরনের পরিবর্তন ও অনুভূতি হয় সে-বিষয়ে আগে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। চিন্তার ফলে রক্তচাপ কমতে পারে বাড়তে পারে, চিন্তার প্রভাবে মাথার চাঁদি উত্তপ্ত হতে পারে, হজমে গোলমাল হতে পারে, আলসার হতে পারে, দাঁতে ব্যথা হতে পারে, এমনি হতে পারের তালিকা আরো দিতে থাকলে বিরাট হয়ে যাবে, তাই থামছি। হতে পারে অনেক কিছুই, কিন্তু তা সবই চিন্তাকারীর শরীরকে ঘিরে। শরীরের বাইরের কোন কিছুকেই এই চিন্তা শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

মানসিক শক্তিতে রেলগাড়ি থামানো

মানসিক শক্তি দিয়ে রেল রোখার কাহিনী অনেকের কাছেই বোধহয় নতুন নয়। বিভিন্ন পরিচিত, অপরিচিত সাধু-সন্ন্যাসী-পীরদের ঘিরে এই ধরনের কিছু কাহিনী প্রচলিত রয়েছে।

কয়েক মাস আগে আমার প্রিয় সহকর্মী অগ্রজ প্রতিম রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গল্প-সল্প করছিলাম, সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত তান্ত্রিক, সিদ্ধপুরুষ, আদ্যামার ভক্ত, আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অন্নদাঠাকুরের শ্যালক শ্রীপরেশ চক্রবর্তী। শ্রীচক্রবর্তী জানালেন, একবার তান্ত্রিক ও আদ্যামার পরমভক্ত সিদ্ধপুরুষ শ্রীসুদীনকুমার মিত্র তাঁর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে একটা ট্রেণকে স্টেশনে আটকে রেখেছিলেন। ঘটনাটি নাকি ঘটেছিল এই ধরনের : সুদীনকুমার মিত্র কোথায় যেন যাবেন বলে ট্রেণ ধরতে শিয়ালদহ যাচ্ছিলেন। পথে গাড়ির ভীড়ে তাঁর গাড়ি যায় আটকে। জ্যামে আটকে পড়ে শ্রীমিত্রের সঙ্গীরা উদ্‌বিগ্নভাবে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন। ট্রেণ
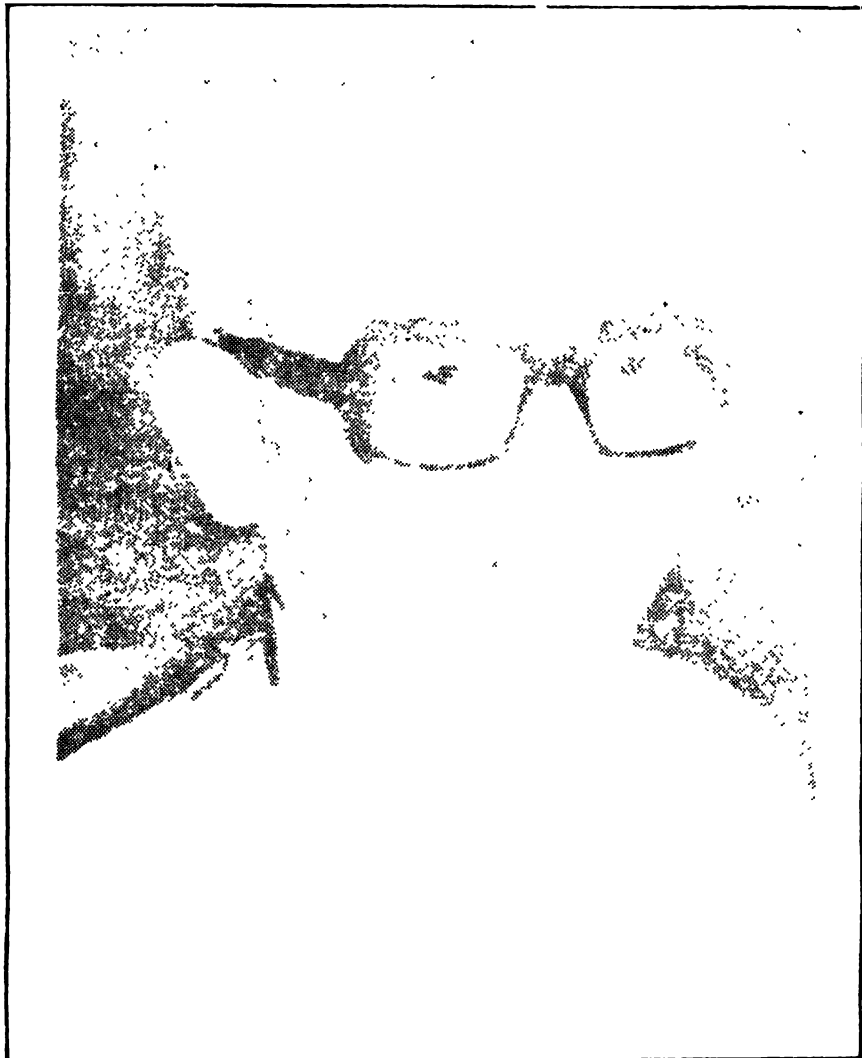
সুদীনকুমার মিত্র

ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছল তার কিছু আগেই ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তবে, সুদীনকুমার মিত্রের ইচ্ছেয় তাঁর সঙ্গীরা মালপত্র নিয়ে হাজির হলেন প্লাটফর্মে। অবাক কাণ্ড! ট্রেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে!

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "ট্রেনটা এমনিতেও তো লেট থাকতে পারতো। আপনি কী করে ধরে নিলেন ট্রেন থাকার কারণ সুদীন মিত্রের ইচ্ছা শক্তি?"

"আমাদের অনেকেরই বোধহয় এই ধরনের দেরি করে স্টেশনে পৌঁছেও ট্রেন পাওয়ার অভিজ্ঞতা অল্প-বিস্তর আছে। আমাদের দেশে ট্রেন সময় মেনে চলে না, সুতরাং এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটা আদৌ অলৌকিক বা অসম্ভব পর্যায়ে পড়ে না।"

আমার মন্তব্যে শ্রীপরেশ চক্রবর্তী বলেছিলেন, তিনিই তাঁর অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় দিতে পারেন চলন্ত ট্রেন আটকে দিয়ে।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "চলন্ত ট্রেন আটকাতে হবে না, আমি একটা সাইকেল চালাবো। আপনি আপনার অতীন্দ্রিয় শক্তিতে সাইকেলটা থামাতে পারবেন?"

—"না, সাইকেল নয়, তোমাদের ট্রেন থামিয়েই আমি দেখাব।" শ্রীচক্রবর্তী বলেছিলেন।"

আমি বলেছিলাম, "আপনি যে পদ্ধতিতে ট্রেন থামাবেন, আমিও সেই পদ্ধতিতেই ট্রেন থামাবো। কারণ, জানেনই তো, আমার একটা বিশ্রী অভ্যেস আছে, কেউ অলৌকিক কিছু দেখালে আমিও সেটা দেখাবার চেষ্টা করি।"

না; আজ পর্যন্ত পরেশ চক্রবর্তী ট্রেন বা সাইকেল কোনটারই গতি ইচ্ছা শক্তিতে রুদ্ধ করে দেখাননি। তবে আমি কিন্তু একবার ছোট্ট একটা কৌশলে ট্রেন থামিয়ে অলৌকিক বিশ্বাসী বন্ধুদের চমকে দিয়েছিলাম। কৌশলটা হলো, পরীক্ষক বন্ধুদের অপরিচিত আমার এক বন্ধু ট্রেনের কম্পার্টমেন্ট থেকে একটা সুটকেশ বাইরে ফেলে দিয়ে চেন টেনেছিল।

আর একবার কলকাতার বুকে আমার ইচ্ছা শক্তিতে! মোটর গাড়ি থামিয়ে বন্ধুদের বিস্মিত করছিলাম . কেউ বুঝতেই পারেন নি, চালকের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া ছিল।

খড়গপুরের সেই পীর

এবার যে ঘটনাটার কথা বলছি, সেটা ঘটেছিল খড়গপুর স্টেশনে। তখন আমি নেহাৎই বালক। ইন্দার কৃষ্ণলাল শিক্ষানিকেতনে পড়ি। রাম নবমীতে ট্রাফিক সেটেলমেন্টের লাগোয়া "বড়া লাইট কা নীচে" জি· ভি· রাওয়ের ম্যাজিক দেখি। ক্লাশে টিচার শুভেন্দু রায়ের কাছে গল্প শুনি শোষক আর শোষিতদের। পাঁচ ভাই-বোনের সংসারে বেড়ে উঠছি আগাছার মতোই। খেলা বলতে ছিল সুশীল রায়চৌধুরীর ওখানে বক্সিং শেখা আর নেশা বলতে অলৌকিক শক্তির খোঁজে সাধু-সন্ত-পীরদের পিছনে দৌড়নো। তখন এই সব অলৌকিক-বাবাদের ভীড়ও থাকতো বটে খড়গপুরে। জানি না এখন কেমন। গুরুজী বাবাজী আর পীরদের রমরমা এবং অন্ধ সংস্কারে পাক খাওয়া মানুষের ভীড়ে বহু-জাতি বহু ভাষা-ভাষীদের শহর খড়গপুর সব-সময় যেন ভাবাবেগে ভেসে যেত। কখনও শুনতাম কাকে মা শীতলা ভর করেছে, কখনও শুনতাম পাড়ার কোন মহিলা মা মনসার আশীর্বাদ পেয়ে স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ দিচ্ছে। কখনও বা কারো বাড়ির গুরুদেব শূন্যে হাত ঘুরিয়ে পেঁড়া এনে আমাকে খাইয়েছেন। ওই বয়েসেই আমিও শূন্যে হাত ঘুরিয়ে পেঁড়া এনে বন্ধুদের খাওয়াতাম। পনেরোই আগষ্ট বন্ধুরা মিলে নিজেরাই ত্রিপল টাঙিয়ে ম্যাজিক দেখাতাম। ম্যাজিক দেখে কেউ কেউ মেডেল দেওয়ার মিথ্যে প্রতিশ্রুতিও ঘোষণা করতেন স্টেজে। এমনি একটা সময় হঠাৎই পীরের অলৌকিক ঘটনা ঘটে গেল খড়গপুরে। ঘটনাটা নিজের চোখে দেখিনি, শুনেছিলাম।

এক পীর ট্রেনে উঠেছিলেন টিকিট ছাড়াই। পরনে বহু রঙিন তালিতে রঙচঙে আলখাল্লা

আর গলায় নানা ধরনের পাথর ও পুঁতির মালা। মাথা ভর্তি বড় বড় চুল আর মুখ ভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান টিকিট চেকার বিনা-টিকিটের ফকিরটিকে পাকড়াও করে নামিয়ে দিলেন। ফকির রাগে ফুঁসতে লাগলেন। বিড়বিড় করে কী সব বলে শূন্যে হাত তুলে ট্রেনের ইঞ্জিন লক্ষ্য করে অদৃশ্য কিছু একটা ছুঁড়ে মারতে লাগলেন।

খড়গপুর খুবই বড় জংশন স্টেশন। ট্রেন এলে প্লাটফর্মের ভীড় যেন উপচে পড়ে। ভীড়ের একাংশ ফকিরের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা দেখে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টি পড়লো, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান গার্ড সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়াতে নাড়াতে হুইসিল্ বাজালেন। ইঞ্জিন সিটি দিল, কিন্তু আশ্চর্য, ট্রেন নড়লো না। ইঞ্জিন ঘন ঘন সিটি বাজায় কিন্তু ট্রেন আর এগোয় না। গার্ড সাহেব ব্যাপার কী দেখতে নিজেই এগিয়ে এলেন ড্রাইভারের কাছে। দেখলেন ড্রাইভার খুটখাট করে ইঞ্জিনের মেশিন-পত্তর নাড়াচাড়া করছে, সাহায্য করছে খালাসি। গার্ড সাহেব হিন্দীতেই প্রশ্ন করলেন, "কী হলো? ইঞ্জিন বিগড়েছে?"

খড়গপুরেরই দক্ষিণ ভারতীয় ড্রাইভার উত্তর দিলেন, "ইঞ্জিন তো ঠিকই আছে, কিন্তু গাড়ি চলছে না।"

লোকো-শেড থেকে মিস্ত্রি এলেন, কিন্তু কিছুতেই ইঞ্জিন থামার রহস্য খুঁজে পাওয়া গেল না।

কয়েক মুহূর্তে গোটা স্টেশন চত্বরে রটে গেল ফকির সাহেব ট্রেন আটকে দিয়েছেন। অন্য প্লাটফর্ম থেকেও লোক আসছে এই অলৌকিক ঘটনা ও ফকিরকে দেখতে। খবরটা ড্রাইভার ও খালাসির কানেও গেছে। তাঁরাই শেষ পর্যন্ত ফকিরের কাছে নতজানু হয়ে ক্ষমা চাইলেন। ফকির একটিসর্তে রাজি হলেন তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে তুলে নিতে, সেই টিকিট-চেকারকে এসে ক্ষমা চাইতে হবে।

জনতার চাপে এবং ফকিরের অলৌকিক ক্ষমতা দেখে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান টিকিট-চেকার সুড়সুড় করে এসে ক্ষমা চেয়ে ট্রেনে বসিয়ে দিলেন। ফকির প্রসন্ন হলেন। এবার গাড়ি চললো। ঘটনাটা জনপ্রিয়তা পেল। কিছুদিন সর্বত্রই ওই আলোচনা। আমি কিন্তু অন্য কথা ভেবেছিলাম সেদিন। ড্রাইভার ফকিরের চেনা লোক নন তো? সেই সঙ্গে লোকো-শেডের মিস্ত্রিও! যেমনটি ম্যাজিক দেখাবার সময় আমার বন্ধুরাও দর্শক সেজে বসে থাকে।

স্টিমার বন্ধ করেছিলেন পি· সি· সরকার

জাদুকর দীপক রায়ের একটা লেখায় একবার পড়েছিলাম জাদু সম্রাট পি· সি· সরকার একবার স্টিমার বন্ধ করেছিলেন। শ্রীসরকার কয়েকজন সঙ্গীর সঙ্গে স্টিমারে গোয়ালন্দ আসছিলেন নারায়ণগঞ্জ থেকে। তখন তিনি জাদুচর্চার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তত নাম ছড়ায়নি।

রেলিং-এর ধারে ডেকে বসে শ্রীসরকার তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে নানা রকমের হাত সাফাইয়ের খেলা দেখাতে মেতে উঠলেন। ম্যাজিক দেখতে ডেকে ভীড় জমে উঠলো একটুক্ষণের মধ্যেই। শ্রীসরকারের হাতের কৌশলে সকলেই অবাক্, ঘন-ঘন হাততালি পড়ছে, বাহবা দিচ্ছে। এরই মধ্যে একজন দর্শক ফুট কাটলেন, "এ আর কী এমন দেখালেন? এসব হাতসাফাই তো রাস্তার বেদেরাও দেখায়। অন্য কিছু দেখান না।"

"সব কিছু কী আর সব জায়গায় দেখানো যায়? তারও একটা পরিবেশ আছে! এখানে এই পরিবেশে দেখানো সম্ভব এমন কোনও কিছু দেখাতে বললে নিশ্চয়ই দেখাব।"

"বেশ তো, আমরা যে স্টিমারে যাচ্ছি, সেটাকেই এই মাঝনদীতে বন্ধ করে দিন না! দেখি আপনার কেরামতি।"

শ্রীসরকার কিন্তু এতে দমলেন না, বললেন, "যোগের সাহায্যে মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে এটা অবশ্য করা সম্ভব। আমি একবার কুম্ভক যোগ করে চেষ্টা করে দেখতে পারি, তবে পারব

কী না জানি না। আপনারা কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আমার মনসংযোগে সাহায্য করুন।

সমস্ত দর্শক রুদ্ধশ্বাসে শ্রীসরকারের কুম্ভক যোগের প্রয়োগ দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। পি· সি· সরকার চোখ বুজে বসলেন যোগে। তার পরে যা ঘটে গেল বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা মেলা ভার। স্টিমারের গতি কমল, তারপর পুরোপুরি থেমে গেল। সারেঙ, খালাসিদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল, মাঝনদীতে স্টিমার থামল কেন?

ইতিমধ্যে সারা স্টিমারে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, এক জাদুকর যোগের শক্তিতে স্টিমার চলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

সারেঙের অনুরোধে পি· সি· সরকার আবার স্টিমার চলার আদেশ দিতেই, বাধ্য ছেলের মতোই স্টিমার আবার চলতে শুরু করলো।

পি· সি· সরকারের এই অতীন্দ্রিয় শক্তি দেখে দর্শকদের চক্ষু চড়কগাছ হলেও, তাঁর এই ক্ষমতার চাবিকাঠিটি ছিল সারেঙের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। জাদুকর আগেই স্টিমারে উঠে নিজের পরিচয় দিয়ে সারেঙের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছিলেন। যাত্রীদের সঙ্গে একটু মজা করতে জাদুকরের সঙ্গে সারেঙও রাজি হয়ে গিয়েছিল। কী ধরনের ইশারা পেলে স্টিমার থামবে এবং কী ধরনের ইশারা পেলে স্টিমার ফের চালু হবে, সব দু'জনে মিলে ঠিক করে ফেলার পর জাদুকরেরই এক নিজের লোক জাদুকরকে উসকে দিয়ে মাঝনদীতে স্টিমার বন্ধ করে কেরামতি দেখাতে বলেছিলেন।

সাধুজীর স্টিমার খাওয়া

গল্পটা শুনেছিলাম শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক বনফুলের মুখে। তিনি আবার এটা শুনেছিলেন শরৎচন্দ্রের মুখে।

শরৎচন্দ্র তখন স্কুলে পড়েন। সেই সময় ভাগলপুরের আজমপুর ঘাটে এলেন এক আশ্চর্য সাধু। অসাধারণ নাকি তাঁর ক্ষমতা। পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, সারা গায়ে ছাই মাখা, ভাগলপুরময় দ্রুত খবরটা ছড়িয়ে পড়লো, কয়েক দিনের মধ্যেই আজমপুরের ঘাট দর্শনার্থীদের ভীড়ে জমজমাট হয়ে উঠলো।

শোনা গেল, সাধুজী অনেকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিচ্ছেন, শূন্য থেকে খাবার বের করছেন, ঝোলা থেকে বের করছেন অসময়ের আম। সাধুজীর কাণ্ডকারখানা দেখে অনেকেই টপাটপ্ দীক্ষাও নিয়ে নিচ্ছিলেন।

একদিন সাধুজীর গঙ্গা পুজো করার ইচ্ছে হলো। তাঁর ইচ্ছের কথা শিষ্যদের বলতেই শিষ্যরা পুজোর সব উপকরণ নিয়ে হাজির হলো আদমপুর ঘাটে। সাধুজীর নির্দেশে গঙ্গাতীরে পবিত্র জলের ধারে সাজানো হলো ফল, ফুল, বাতাসা, পেঁড়া।

বেলা বারোটার সময় সাধুজী সবে পুজোয় বসবেন, এমন সময় একটা দারুণ কাণ্ড ঘটে গেল। কার কোম্পানির একটা বিরাট স্টিমার তখন রোজই ঐ সময় আদমপুর ঘাটের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড গর্জনে বিরাট বিরাট ঢেউ তুলে যেত। এ-দিন সেই প্রচণ্ড ঢেউগুলো এসে হঠাৎই আছড়ে পড়লো গঙ্গামায়ের পুজোর নৈবেদ্যর ওপর। মুহূর্তে নৈবেদ্য ভেসে গেল গঙ্গায়।

সাধুজী গেলেন ক্ষেপে—এত বড় স্পর্ধা! আমার গঙ্গামায়ের পুজো নষ্ট করা—ঠিক আছে কাল তুই ব্যাটা স্টিমার পালাবি কোথায়? এদিক দিয়েই তো যেতে হবে, তখন তোকে আস্তো গিলে খাব। হ্যাঁ, আজ আমি আমার এই সমস্ত ভক্তদের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, কাল সত্যিই তোকে গিলে খাব।

একজন শিষ্যের কাছে গুরুজীর প্রতিজ্ঞাটা বোধহয় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। সে জিজ্ঞেস করলো, "গুরুজী, এ যে জাহাজের মতো পেল্লাই স্টিমার, খাবেন কী করে?"

গুরুজী এ-হেন সন্দেহে গর্জে উঠলেন, "কালকেই তা দেখতে পাবি বেটা। আমার প্রতিজ্ঞার কোনও নড়চড় হবে না।"

পুজো দেখতে আসা ভক্ত শিষ্যেরা পরম ভক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলো, "গুরুজী কী জয়।"

দেখতে দেখতে গুরুজীর স্টিমার গেলার প্রতিজ্ঞার খবরটা ছড়িয়ে পড়লো ভাগলপুর ও তার আশেপাশে। পরদিন সকাল থেকেই আদমপুর গঙ্গার ঘাটে মেলা বসে গেল। বেলাও বাড়ে, লোকও বাড়ে।

সাধুজী ঘাটের কাছে ধুনি জ্বেলে গভীর ধ্যানে মগ্ন। বেলা বারোটা যখন বাজে-বাজে তখন জনতা চিৎকার করে উঠলো, "স্টিমার আসছে, স্টিমার আসছে।"

সাধুজীর ধ্যান ভাঙলো এবার। চোখে মেলে তাকালেন। গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে চললেন গঙ্গার দিকে। কোমর জলে নেমে থামলেন সাধুজী। তারপর বাজখাঁই গলায় চেঁচালেন, "আয় বেটা জাহাজ, আজ তোকে গিলে খাব।"

সাধুজী যত চেঁচান দর্শকদের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বুক টিপ্‌টিপ্ করে। কী বিরাট অঘটন ঘটে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে আর থই পান না।

প্রচণ্ড গর্জন তুলে স্টিমার এসে পড়লো। স্টিমারের ঢেউ আছড়ে পড়লো ঘাটে। সাধুজী হাঁ করে আবার যেই স্টিমারের দিকে এগুচ্ছেন অমনি জনা কয়েক শিষ্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাধুজীকে ঘিরে কেঁদে পড়লো, "গুরুজী, জাহাজের কয়েক'শ নিরীহ যাত্রীদের আপনি বাঁচান। ওরা তো কোনও অপরাধ করেনি। জাহাজের দোষে ওদের কেন প্রাণ নেবেন?"

শিষ্যদের কান্নাভেজা অনুরোধে গুরুজীর মন নরম হলো। ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোদের জন্যেই জাহাজটা বেঁচে গেল।"

এ-ক্ষেত্রেও কিন্তু সাধুজীর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা প্রমাণিত হলো না তাঁরই শিষ্যদের জন্যে। অথবা এ-ও বলা যায়, গুরুজীর বুজরুকি ধরা পড়লো না তাঁরই শিষ্যদের অভিনয়ে।

লিফ্‌ট ও কেব্‌ল-কার দাঁড় করিয়েছিলেন ইউরি গেলার

অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার নানা চমক দেখিয়ে ইউরি গেলার ইউরোপের দেশগুলোতে যথেষ্ট হুলুস্থুলু ফেলে দিয়েছিলেন। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা দেখাতে জার্মান থেকেও প্রস্তাব এলো। যিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তিনি ব্যবসা ভালোই বোঝেন, পাবলিসিটির জন্য বিস্তর খরচ করলেন। ইউরি মিউনিখে পা দিতেই সেখানকার পত্র-পত্রিকা ও টেলিভিশনের সাংবাদিকেরা ছেঁকে ধরলেন! তাকে। কয়েক দিন ধরে ইউরি, কয়েক জায়গায় চামচ ভাঙা, চামচ বাঁকানোর ঘটনা ঘটালেন, দেখালেন থট রিডিং-এর খেলা। কয়েক দিন পরে ম্যানেজার গেলারকে নতুন ধরনের শক্তি প্রয়োগের জন্য হাজির করলেন। পাহাড়ের গা থেকে রোপওয়ে ধরে এগিয়ে আসা কেব্‌ল-কার দাঁড় করিয়ে দিলেন গেলার, তারপর একটা ডিপার্টমেন্টাল সেন্টারের লিফ্‌টকে থামিয়ে দিলেন। প্রচারের বন্যায় ভেসে চললেন গেলার। তারই মাঝে কয়েকজন গেলারের এই ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কয়েক শো বা কয়েক হাজার মার্কের বিনিময়ে লিফ্‌টম্যান ও কেব্‌ল-কারের চালক গেলারের পক্ষে হেলে পড়েছিলেন কিনা কে বলতে পারে? কয়েকজন তাঁদের মোটরকার ও মোটরবাইক আটকে ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য আহ্বান জানালেন। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী ইউরি গেলারের জ্বরে সারা দেশ যখন থরথর তখন কোন্ পত্রিকাই বা আহাম্মকের

মতো ইউরির প্রচারে পিছিয়ে থাকবে ? যে যত ইউরির খবর ছাপতে পারে তার কাটতিও তত বাড়ে। না, ইউর বোকা নন। আল-পট্‌কা চ্যালেঞ্জকে গ্রাহ্যই করলেন না, তাতে ইউরির ক্ষতি যত হয়েছে, লাভ হয়েছে তার চেয়ে বেশি।

মিউনিখে কেবল-কার থামিয়ে দিচ্ছেন গেলার

কলকাতার বুকে মোটর গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছেন লেখক

মানসিক শক্তি দিয়ে গেলারের চামচ বাঁকানো

পরামনোবিজ্ঞানীদের কাছে ইউরি গেলারই বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম মানসিক শক্তি প্রয়োগকারী, বা গেলারের সাইকো-কিনেসিস (Psycho-kinesis) বা মানসিক শক্তির পরীক্ষা আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। একাধিকবার সাইকো-কিনেসিস শক্তির দ্বারা একটা টেবিলের উপর সোজা দাঁড় করানো ছুরি বা চামচকে টেবিলের অপর প্রান্তে বসে না ছুঁয়েই বাঁকিয়ে দিয়েছেন গেলার। আবার, কখনও বা দু-আঙুলের চাপে চামচ বা ছুরিকে ভেঙে ফেলেছেন অতি অবহেলে।

এই ধরনের ঘটনা ঘটার পিছনে পরামনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা হলো—মানুষের শক্তিকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নত করা সম্ভব যখন মানসিক শক্তি শরীরের অণুগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে এবং মানসিক শক্তিকে সঞ্চারিত করে শরীরের বাইরের কোনও বস্তুর অণুকেও প্রভাবিত করা সম্ভব। গেলার এমনিভাবেই মানসিক শক্তিকে প্রয়োগসক্ষম একজন ব্যক্তি।

ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠিত চিত্র-শিল্পী শক্তি বর্মন বছর তিন-চারেক আগে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা নিয়ে একাধিকবার দীর্ঘ আলোচনা হয় আমার। শক্তি বর্মন টি· ভি· তে গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষাগুলো যে-ভাবে দেখেছিলেন ঠিক তেমনি ভাবেই নিখুত বর্ণনা আমার সামনে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। পরে ফ্রান্স থেকে ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার উপর আমি একটি ভি ডি ও ক্যাসেট সংগ্রহ করি। তাতে লক্ষ্য করেছিলাম, টেবিলের এক প্রান্তে টেবিল না ছুঁয়ে বসেন ইউরি গেলাব। টেবিসের অপর প্রান্তে একটা ছোট বেদী বা স্ট্যাণ্ড রাখা হয়। মিউজিয়ামে ছোটখাট মূর্তিগুলো যে ধরনের বেদীর উপর রাখা হয় এও সেই ধরনেরই বেদী। দেখে আমার মনে হয়েছে বেদীটা সম্ভবত ফাইবার গ্লাসে তৈরি। বেদীর মাঝখানে লম্বা একটা ছিদ্র বা খাঁজ থাকে, যেই ছিদ্র বা খাঁজে একটা চামচের তলার দিকটা ঢুকিয়ে সেটা খাড়া রাখা যায়। চামচটা রাখা হয় টেবিলের অন্য প্রান্তে এবং তার উপরে তীব্র আলো ফেলা হয়। এই আলোগুলো এমনভাবে সাজানো হয় যাতে গেলারের চোখে প্রতিফলিত হয়ে মনসংযোগে বাধার সৃষ্টি না করে। চামচের উপরে খুব কাছ থেকে এবং চারপাশ থেকে তীব্র আলো রিফ্লেক্টারে প্রতিফলিত করে ফেলা হয়।

গভীরভাবে মনঃসংযোগ করে মানসিক শক্তিকে অপর প্রান্তের চামচে প্রয়োগ করতে থাকেন গেলার। দীর্ঘ সময় কেটে যায়, ঘণ্টার কাটা ঘোরে। একসময় দেখা যায় চামচটা বেঁকছে, একটু একটু করে চামচের হাতলটা বেঁকে যাচ্ছে।

ধাতু বাঁকার আসল রহস্য

১৯৫৮-এর ১৬ এপ্রিল 'সানডে' পত্রিকায় জাদুকর পি· সি· সরকার (জুনিয়ার)-এর একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল। সাক্ষাৎকারটিতে জাদুকর বলেছিলেন, ইউরি গেলারের চামচ বাঁকানোর মূলে রয়েছে দৃষ্টি-বিভ্রম (Optical illusion)। অবশ্য, এই দৃষ্টিবিভ্রম ঠিক কেমন ভাবে ঘটানো হয়ে থাকে তার উল্লেখ ছিল না। স্বভাবতই অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসী অনেকেই প্রশ্ন তুলেছিলেন—ইউরি গেলারকে কেউ একজন ভণ্ড বললেই তিনি ভণ্ড হয়ে যাবেন না। হয় শ্রীসরকার একটা চামচ বাঁকিয়ে দেখান, অথবা কৌশলটা জানান, যাতে যে কেউ পরীক্ষা করে তাঁর কথার সত্যতার প্রমাণ পেতে পারে।
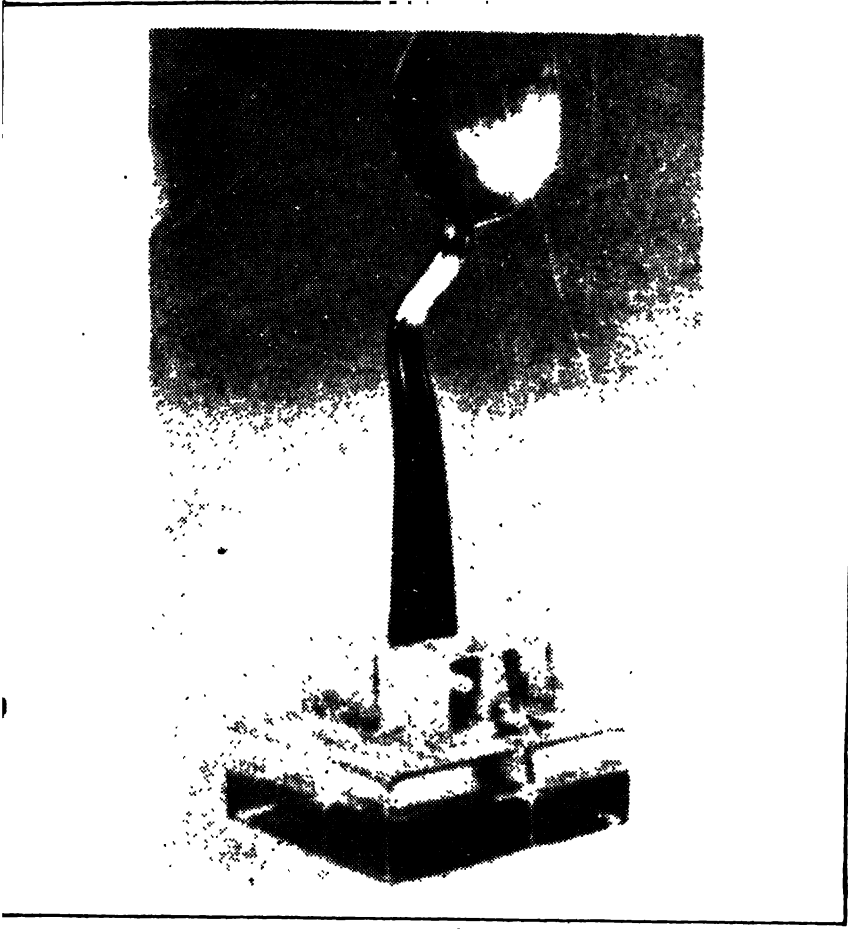
গেলার চামচ বাঁকিয়েছেন

আমি অবশ্য যে ভিডিও ক্যাসেট দেখেছি, তাতে চামচে বেঁকে যাওয়াটাকে আমার Optical illusion বলে মনে হয় নি।

আমি এখন যে নিয়মে চামচ বাঁকানোর কথা বলছি, তাতে দৃষ্টিবিভ্রমের ব্যাপার নেই। একটা টেবিলের এক প্রান্তে থাকব আমি, অন্য প্রান্তে একটা বেদীর মতো স্ট্যাণ্ডের উপরে দাঁড় করানো থাকবে একটা ছুরি বা চামচ। টেবিল কোনও ভাবে স্পর্শ না করেই আমি বসবো। টেবিলে কোনও কৌশল নেই। সেটা থাকবে অতি সাদা-মাটা। ঠিক মতো মনঃসংযোগের জন্যে ছুরি বা চামচে তীব্র আলো ফেলা হবে, এতে দর্শকদেরও দেখতে সুবিধে হবে। আলো আমার বা দর্শকদের চোখকে যাতে পীড়া না দেয় তাই, আলোগুলো ছুরি বা চামচের উপর খুব কাছ থেকে ফেলা হবে। অর্থাৎ, ইউরি গেলারের কায়দাতেই দেখবে।

একসময় দেখবেন, ছুরি বা চামচটা বেঁকে গেছে। নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, সত্যিই বেঁকেছে, আলোর সাহায্যে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয় নি।

লেখক চামচ বাঁকিয়ে দেওয়ার পর পরীক্ষা করছেন জনৈক দর্শক

এখানে কৌশলটা কিন্তু টেবিল, রঙিন আলোর কারসাজিতে নেই, রয়েছে এই ছুরি বা চামচেতে। ছুরির ফলা বা চামচের হাতলটা তৈরি করতে হবে দুটো ভিন্ন-ভিন্ন ধাতুর পাতলা পাত জুড়ে। ধরুন, লোহা ও তামার দুটো পাতলা পাত জুড়ে তৈরি করালেন একটা ছুরি। এবার দুটো জোড়া দেওয়া পাত যেন দেখা না যায় তাই প্রয়োজন গ্যালভানাইজ করে নেওয়া অর্থাৎ একটা নিকেল কোটিং দিয়ে নেওয়া।

তীব্র আলোর খুব কাছে ছুরিটা দাঁড় করিয়ে রাখলে আলোগুলোর তাপ ছুরিকে উত্তপ্ত করবে। উত্তাপে বস্তু মাত্রেই প্রসারিত হয়। ছুরির ফলার লোহার পাত এবং তামার পাত প্রসারিত হতে থাকবে। একই তাপে ভিন্ন-ভিন্ন পদার্থের প্রসারণ ভিন্ন-ভিন্ন রকমের। তামার প্রসারণ ক্ষমতা লোহার চেয়ে বেশি। অতএব লোহার পাতের সঙ্গে জুড়ে থাকা তামার পাত লোহার আগে বাড়তে গিয়ে লোহার পাতকে বাঁকিয়ে দেয়, ফলে ছুরি ধনুকের মতো বেঁকে যায় বা হ্যাণ্ডেল ও মাথার জোড়ার কাছটা মুচড়ে যায়।

James Randi-র FLIM FLAM ? বইতে আমি অবশ্য চামচ বাঁকার যে ছবি দেখেছি তাতে চামচের হাতল এঁকে-এঁকে উঠেছে। তাতেও কিন্তু স্ট্যাণ্ডে রেখেই চামচ বাঁকাতে দেখি।

জেমস্ র‍্যাণ্ডি

গেলারের চামচ ভাঙার খেলা :

গেলার তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় শুধুমাত্র দু'আঙুলে ছুঁয়ে চামচ ভেঙেছেন, এই ধরনের ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত খবর চোখে পড়ছে আমার, কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ জানার বা ঘটনাটা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি।

ভাঙার মুহূর্তে ঠিক কেমন ভাবে চামচ ধরতেন ও ভাঙতেন সেটা আমার জানা না থাকায় বেশ একটু অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। অনেক সময় সাধারণ দর্শকদের চোখে (যাঁরা বিভিন্ন কৌশলের খুঁটি-নাটি বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন) পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ছোটো-খাট ঘটনা এড়িয়ে যায়, ফলে তাঁদের বর্ণনায় এমন কিছু ফাঁক থেকে যায়, যার ফলে আসল ঘটনাটা ধরা মুশকিল হয়ে পড়ে। দু'একটা উদাহরণ দিলে জিনিসটা বোধহয় আরো পরিস্কার হয়।

একবার ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য বললেন, তাঁর বন্ধুর পকেটে একটা নোট ছিল, চোখ ঢেকে শুয়ে থাকা একজন লোক নোটটার নম্বর বলে দিয়েছিলেন।

আমি অবশ্য যথেষ্ট চেষ্টার পর বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলাম যে, ঠিক এমনিভাবে নোটের নম্বর বলা অসম্ভব। শুয়ে থাকা লোকটির সহকর্মী অবশ্যই নোটের নম্বরটা দেখতে পেয়েছিল, তাই শুয়ে থাকা লোকটির পক্ষেও নম্বর বলা সম্ভব হয়েছিল।

আর একবার ডঃ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, তিনি দেখেছেন মাদারি খেলওয়ালা একটি ছেলেকে চাদরে ঢেকে দেওয়া হলো। মাথাটা শুধু রইলো বেরিয়ে। তারপর দেখা গেল ছেলেটা একটু একটু করে শূন্যে দশ ফুট উঁচুতে উঠে গেল।

ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে উনি যে উচ্চতায় ভেসে থাকতে দেখছেন বলছেন, অর্থাৎ যা দেখেছেন বলে ভাবছেন, আদৌ ততটা উচ্চতায় ভাসা ঐক্ষেত্রে সম্ভব নয়। ভাসার উচ্চতা হবে ফুট তিনেক থেকে সাড়ে পাঁচ ফুটের মতো, অর্থাৎ একটা লোক মাটিতে বসে বা দাঁড়িয়ে মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে দিলে উচ্চতা যতখানি হতে পারে ঠিক ততখানি। শেষ পর্যন্ত ওঁকে ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে টলানো যাবে না বুঝে আমাকেই চুপ করে যেতে হয়েছিল, কারণ, যুক্তি যেখানে অচল সেখানে আলোচনা অহেতুক শক্তিক্ষয়। এইক্ষেত্রে হয় তাঁর স্মৃতি তাঁকে ভ্রান্ত করছে অথবা তাঁর ভ্রান্ত অহমিকা বোধ ভুল স্বীকার করতে বাধা দিচ্ছিল।

হাতের ছোঁয়ায় চামচ ভাঙার নেপথ্য কৌশল ১

'৫৪-র জুলাইয়ে প্রখ্যাত জাদুকর পি·সি· সরকার (জুনিয়র)-এর সঙ্গে কথা বলছিলাম তাঁরই বাড়িতে। আলোচ্য বিষয় ছিল ইউরি গেলার। শুনেছিলাম স্পেনের মাদ্রিদে ইউরি গেলারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। একটি টি· ভি· প্রোগ্রামও দু'জনে করেছিলেন। গেলার একটা চামচ বাঁকিয়েছিলেন এবং শ্রীসরকার সেটা আবার সোজা করেছিলেন। গেলার এবং সরকার দুজনেই নাকি Optical illusion বা দৃষ্টি বিভ্রমের কৌশল গ্রহণ করে চামচটা বাঁকিয়েছিলেন এবং সোজা করেছিলেন।

দৃষ্টি বিভ্রমের প্রসঙ্গ তুলে জানতে চেয়েছিলাম ঠিক কী কৌশলে গেলার শ্রীসরকারের সামনে খেলাটি দেখিয়েছিলেন। শ্রীসরকার দৃষ্টি বিভ্রমের প্রসঙ্গ না তুলে আমাকে চামচ ভাঙার বিষয়ে বললেন, খেলা দেখাবার আগে যে চামচটি ভাঙা হবে সেটার হাতলের দু'পাশটা ধরে বারবার সামনে পিছনে এমনভাবে বাঁকানো হতে থাকে যাতে প্রয়োজনের সময় চামচের দু'-প্রান্ত ধরে চাপ দিলেই মাঝখানটা ভেঙে যায়।

যুক্তি শুনে খুবই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। '৫৫-র ফেব্রুয়ারিতে আমার বাড়িতে কয়েকজন যুক্তিবাদী বন্ধুর সামনে হাজির করেছিলাম একটি ট্রেতে পাঁচটি চামচ। চামচগুলোর মধ্যে একটি চামচ ছিল আগে থেকেই ভেঙে যাওয়ার পূর্বাবস্থায় নিয়ে আসা। চামচগুলোকে একসঙ্গে আবার গ্যালভানাইজড্ করে নেওয়ায় কৌশল করা চামচের মাঝখানে কোনও দাগ ছিল না। বন্ধুরা আমার হাতে একটা চামচ তুলে দিলেন। ট্রেটা নিয়ে ঘোরার সময় নির্বাচিত চামচের সঙ্গে আমি কৌশল করা চামচটা বদলে নিলাম(চামচটায় আগে থেকেই সামান্য চিহ্ন দেওয়া ছিল)।এবার চামচের দু'প্রান্তে আঙুল ঠেকিয়ে একটা চাপে সম্পূর্ণ বাঁকাবার চেষ্টা করতেই চামচটা ভেঙে গেল

হাতের ছোঁয়ায় চামচ ভাঙার নেপথ্য কৌশল ২

হাতের ছোঁয়ায় চামচ ভাঙছেন লেখক

বন্ধুদের আমি আহ্বান জানালাম, তারাও পরীক্ষা করে দেখতে পারে, এইভাবে চামচ ভাঙা সম্ভব কিনা। এগিয়ে এলো যোগব্যায়ামের জাতীয় বিচারক শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শান্তি একটা চামচে তুলে নিয়ে দু'আঙুলে প্রচণ্ড চাপ দেওয়ায় চামচটা বেঁকে গেল, কিন্তু ভাঙলো না।

'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকা পরীক্ষা নিতে চেয়েছিল, ইউরি গেলার আসেন নি।

'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকার ১৯৫৪-এর ১৭ অক্টোবরের সংখ্যা থেকে জানতে পারি, পত্রিকাটির তরফ থেকে ইউরি গেলারের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবীর সত্যতা পরীক্ষার জন্য চেষ্টা চালানো হয়েছিল। একটি সৎ, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-মনস্ক পত্রিকা হিসেবে গেলারের প্রচারের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে জনসাধারণের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পত্রিকার বিক্রি বাড়াতে চায় নি। আবার, 'গেলারের অতীন্দ্রিয় স্রেফ বুজরুকি', শুধু এ-কথাটা বলেই ব্যাপারটা উড়িয়েও দিতে চায় নি। পত্রিকাটির তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল ইউরির সঙ্গে। এই ধরনের পরীক্ষায় সহযোগিতা করতে রাজি হলেন ইউরি। পরীক্ষার দিন স্থান সবই ঠিক হয়ে গেল। পরীক্ষার দিন ইউরি এলেন না, বললেন, "আমি বিজ্ঞানীদের সামনে বহু কঠিন পরীক্ষায় সফল হয়েছি। নতুন করে পরীক্ষায় নামার কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।"

'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কিন্তু আশা ছাড়লেন না। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে ইউরি গেলারকে পরীক্ষায় হাজির হতে রাজি করালেন। কিন্তু এবারও এলেন না ইউরি। পরিবর্তে জানালেন, তিনি একটা ভয় দেখানো চিঠি পেয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে, এই পরীক্ষায় অংশ নিলে ইউরিকে খতম করা হবে। তাই বাধ্য হয়েই তিনি মত পরিবর্তন করেছেন।

যোগব্যায়ামের জাতীয় বিচারক শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের দু'আঙুলের চাপে চামচ বাঁকল, কিন্তু ভাঙল না।

এক ঝলকে ইউরি

১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে তেল আভিভ-এ ইউরি গেলারের জন্ম। শৈশবেই ইউরির বাবা ইটজ্যাক, মা মার্গারেটকে ত্যাগ করেন। এক সময় ইউরি যোগ দেন ইজরাইলের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে গুপ্তচর হিসেবে। পরে ছত্রী বাহিনীতে যোগ দেন। এই সময় একবার নাকি ব্যারল অথবা ফায়ারিং পিন ছাড়াই গুলিবর্ষণ করেন। প্রমাণ হিসেবে সঠিক কোনও তথ্য হাতে নেই। এইক্ষেত্রে ডাঃ অ্যানড্রিডা পাহাড়িক-এর লেখা এবং ইউরি গেলারের কথাই একমাত্র প্রমাণ।

১৯৫৮-তে সেনাবাহিনী ছেড়ে জাদুর খেলাকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে লণ্ডন ম্যাজিক সার্কেলেরও সদস্য হন। যদিও এক সময় তাঁর সদস্যপদ জাদুর অপব্যবহারের জন্য কেড়ে নেওয়া হয়।

প্রখ্যাত অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেনের সঙ্গে ইউরি একবার দেখা করেন। ইউরির অনুরোধ সত্ত্বেও সোফিয়া লোরেন তাঁর সঙ্গে ছবি তুলতে অসম্মত হন। ইউরির ছবির সঙ্গে সোফিয়ার একটি ছবি কেটে জুড়ে একসঙ্গে করে তারপর আবার তুলে ইউরি প্রচার চালাতে গিয়ে প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে পড়ে যান, সোফিয়ার ম্যানেজারের হস্তক্ষেপে ইউরির প্রতারণা ধরা পড়ে।

ইউরি গেলারের এই ক্ষমতার উৎস হিসেবে ডঃ পাহাড়িক যে গল্প তাঁর বিখ্যাত 'ইউরি' বইটিতে লিখেছেন, তাতে বলা হয়েছে—ইউরির বয়েস যখন তিন বছর সেই সময় চক্‌চকে মুখের একটা অদ্ভুত মূর্তি এসে হাজির হয় ইউরির মুখোমুখি। মূর্তিটার মাথা থেকে একটা তীব্র রশ্মি এসে পড়ে ইউরির উপর। ইউরি জ্ঞান হারান। তারপর থেকেই ইউরি নানা-রকম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠেন। ওই অদ্ভুত মূর্তিগুলো নাকি অন্য কোনো মহাকাশের অধিবাসী।

পোস্ট শুইয়ে দিচ্ছেন লেখক

সিগনাল-পোস্ট বাঁকিয়ে দিচ্ছেন গেলার.

ইউরি গেলার তাঁর নিজের আত্মজীবনী 'মাই স্টোরি'তে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা পাওয়ার যে গল্প বলেছেন, তা কিন্তু পাহাড়িকের গল্পের সঙ্গে মেলে না। 'মাই স্টোরি'তে আছে ওর সামনে এসে হাজির হয়েছিল বাটির মতো একটি বস্তু। তারই আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল, সেই সঙ্গে অনুভব করেছিলেন একটা ধাক্কা। ইউরিও অবশ্য বলেছেন, তার এই অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা পেয়েছেন অন্য গ্রহবাসীর কাছ থেকে।

ডক্টর অ্যানড্রিজা পাহাড়িকের সঙ্গে ইউরির প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৫১-এ এক নাচগানের আসরে। নানা ধরনের নাচগানের পর ছিল ইউরির ম্যাজিক। ইউরি তখন পঁচিশ বছরের ঝকঝকে তরুণ। ইউরির কথা-বার্তা শো-ম্যানশীপে মুগ্ধ হলেন পাহাড়িক। তারপরই ঘটে গেল ইউরি গেলার ও কোটিপতি বিজ্ঞানী অ্যানড্রিজা পাহাড়িকের মণি-কাঞ্চন যোগ। পাহাড়িকের অর্থ, প্রচার ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইউরিকে রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত করলো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান হিসেবে।

যোগ-সমাধিতে নাড়ি বন্ধ

গত বছর আন্তর্জাতিক পরামনোবিদ্‌দের সম্মেলন হয়েছিল নয়া-দিল্লিতে, সেই বিষয়ে আগেই আপনাদের অবহিত করেছি। ওই সম্মেলনে উপস্থিত পাইলট বাবা নাকি এক অদ্ভুত ধরনের ক্ষমতার অধিকারী। তিনি দাবী করেন অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যোগ-সমাধিতে বসে এক মিনিট থেকে দেড়-মিনিটের মতো বন্ধ করে দিতে পারেন তাঁর নাড়ির স্পন্দন, অর্থাৎ জীবন স্পন্দন।

যতক্ষণ মানুষের হৃদপিণ্ড চালু থাকে, ততক্ষণ হৃদপিণ্ডের সঙ্কোচন প্রসারণের তালে তাল রেখে হাতের বুড়ো আঙুলের নীচে কব্জির রেডিয়াল ধমনীও সঙ্কোচিত প্রসারিত হতে থাকে। চলতি কথায় একেই বলি, নাড়ির স্পন্দন। নাড়ির এই স্পন্দন বন্ধ হওয়া মানেই মৃত্যু। সাধারণভাবে নাড়ি প্রতি সেকেণ্ডে অন্তত একবার স্পন্দিত হয়। কোনও মানুষ কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে সাধারণভাবে ইচ্ছেমতো নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করতে পারে এবং চালু করতে পারে, এটা বিজ্ঞান স্বীকার করে না। কারণ, বিজ্ঞানের যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা নেই। এই ব্যাখ্যাহীন ঘটনাই নাকি এর আগেও ভারতের দু-একজন যোগী সন্ন্যাসী ঘটিয়ে দেখিয়েছেন। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধের সঙ্গে কিন্তু নাড়ি বন্ধের কোনও যোগ নেই। আপনি পাঁচ মিনিট শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ রাখলেও হৃদপিণ্ড তার কাজ বন্ধ রাখবে না, সেই সঙ্গে নাড়িও তার সঙ্কোচন-প্রসারণের কাজ চালিয়ে যাবে।

আচার্য মহেশ যোগীর এই ধরনের ক্ষমতা ছিল বলে শুনেছি। অনুকূলচন্দ্রের জনৈক ভক্তের মুখে শুনেছি তিনি নিজে অনুকূলচন্দ্রের নাড়ি পরীক্ষা করে এই অলৌকিক লীলা দেখেছেন। আদ্যামা'র স্নেহধন্য তান্ত্রিক পরেশ চক্রবর্তীও নাড়ি বন্ধ করতে সক্ষম বলে দাবী করেন।

জনৈক প্রখ্যাত যুক্তিবাদী নেতা এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করলে নাড়ি বন্ধ করা বা জলে ভেসে থাকার মতো ক্ষমতা আয়ত্ব করা সম্ভব।

ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এক আধ্যাত্মিক নেতাকে কিছু চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখেন, এবং একমত হন যে তিনি ১ মিনিটের মতো নাড়ি বন্ধ করেছিলেন। প্রচুর অনুশীলনের ফলে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো অসম্ভব নয়, তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

ডঃ কোভুরও চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, কেউ পাঁচ মিনিট নাড়ি বন্ধ রাখলে ১ লক্ষ শ্রীলঙ্কার মুদ্রা দেবেন। অবশ্য এই নাড়ি বন্ধের ক্ষেত্রে কোনও কৌশল গ্রহণ করা চলবে না।

ডঃ কোভুরের ১ লক্ষ টাকা খরচ হয় নি, কারণ, কেউই পাঁচ মিনিট নাড়ি বন্ধ রাখার পরীক্ষা দিতে এগিয়ে আসেন নি।

আমি অবশ্য এই নাড়ি বন্ধ করে রাখার বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করি। আমার সিদ্ধান্ত এই যে, কৌশল ছাড়া কোনও ভাবেই ১ বা ১½ মিনিটের জন্যও নাড়ির গতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তবে কী কেউই নাড়ির গতি বন্ধ করেন নি ? সমস্তটাই মিথ্যে প্রচার ? নাড়ির গতি নিশ্চয়ই বন্ধ করা সম্ভব, তবে তার পিছনে থাকে কৌশল। আপাতদৃষ্টিতে কৌশল ধরা যায় না বলেই মানুষ ভ্রান্ত ধারণার শিকার হন, এবং সাধারণ লোক একেই যোগ-সাধনা বা অলৌকিক ক্ষমতার ফল বলে ধরে নেন।

আমি বিভিন্ন সময় বহু জায়গায় বহুজনকে আমার নাড়ির গতি-স্তব্ধ করিয়ে দেখিয়েছি। এই নাড়ির গতি-স্তব্ধতা চিকিৎসক বা বিজ্ঞানীদের যতটা বিস্মিত করেছে, ততটা হয়তো সাধারণ লোকদের করে নি। কারণ, নাড়ির স্পন্দন বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও একজন মানুষের স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা মানুষের শারীরবৃত্তিতে সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব, শারীরবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব ও সত্য বিষয়ে চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা যতখানি ওয়াকিবহাল, সাধারণ মানুষ ততখানি নন। তাই, সাধারণ মানুষ কোনও সন্ন্যাসী নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করেছেন শুনলেই টপ্ করে বিশ্বাস করে ফেলেন এবং ভেবে নেন যে যোগের সাহায্যে এই ধরনের ঘটনা ঘটানো সম্ভব সাধারণের এই অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে কোনও যুক্তি বা বাস্তব অভিজ্ঞতা কাজ করে না তাঁরা কারো কাছ থেকে শুনে বা সাধুসন্তদের অলৌকিক কাহিনীতে ভরা নানা ধরনের বই-টই পড়ে এই ভুল ধারণা পোষণ করে থাকেন। তাই, আমি এই ঘটনা ঘটিয়ে দেখালে তাঁরা সম্ভবত আশ্চর্য হন কম, ভাবেন যোগের ফলে আমিও এই ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হয়েছি। অর্থাৎ, এই ধরনের ঘটনা ঘটানো

এই মুহূর্তে লেখকের নাড়ীর গতি স্তব্ধ। লেখকের বাঁয়ে ভারত বিখ্যাত চোখ-কান ও গলার বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায় ও ডাইনে ডাঃ কোনার

অসাধারণতার লক্ষণ হলেও অসম্ভব নয়।

আমার এই নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করার খেলা যে সব প্রখ্যাত চিকিৎসক পরীক্ষা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ভারত বিখ্যাত E. & N. T বিশেষজ্ঞ ডাঃ আবিরলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর সহকারী চিকিৎসক ডাঃ প্রসেনজিৎ কোনার, প্রখ্যাত মনোরোগ চিকিৎসক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিসিনের অধ্যাপক ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল।

ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়কে যেদিন আমি নাড়ি বন্ধ করে দেখিয়েছিলাম, সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায়ের বড় জামাতা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কামাক্ষাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। প্রথমে ডাঃ গঙ্গোপাধ্যায় ও পরে শ্রীসেনগুপ্ত আমার দু'হাতের নাড়ি পরীক্ষা করে দেখেন। আমি দু'মিনিটের মতো নাড়ির স্পন্দন বন্ধ করে রেখেছিলাম। ডাক্তার গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে খুবই স্নেহ করেন, তাই আমার বিপদের কথা চিন্তা করে কিছুটা শঙ্কিত হয়েছিলেন। আমাকে অনুরোধ করলেন, "নাও, আর দেখাতে হবে না, এবার তাড়াতাড়ি 'পালস্ বিট ঠিক করে নাও।"

আমার এই নাড়ি বন্ধের ঘটনা দেখে যাঁরা অবাক হয়েছেন, তাঁরা সম্ভবত আরো বেশি অবাক হয়েছেন আমার কাছে নাড়ি বন্ধের গোপন রহস্য শুনে।

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৫২-তে এক অবতারের নাড়ি বন্ধকে অবলম্বন করে একটি গল্প লিখেছিলাম 'গোয়ার গোলমাল'। গল্পটায় নাড়ি বন্ধ রাখার কৌশলও বর্ণনা করেছিলাম।

দু'বগলের তলায় দুটো কাপড়ের ছোট পুঁটলি রেখে বাহুদুটিকে বুকের পাশে চেপে রাখলেই

লেখকের নাড়ীর গতি বন্ধ। পরীক্ষা করছেন প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বগলের তলার অ্যাক্সিলারি ধমনীতে চাপ পড়ে এবং কব্জির রেডিয়াল ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ চলতি কথায় নাড়ির স্পন্দন যায় বন্ধ হয়ে।

জলে হাঁটা

জলের উপর কেউ হাঁটতে পারলে ডঃ কোভুর এক লক্ষ শ্রীলঙ্কার অর্থ দেবেন বলে চ্যালেঞ্জ করার পর সুইডেনের Kjell Eide (জেল আইড) এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। জেল আইড ইতিমধ্যেই ইউরোপের বিভিন্ন শহরে অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা জলে হেঁটে দেখিয়েছেন। আমেরিকার পত্রিকায় কোভুরের চ্যালেঞ্জের খবর প্রকাশিত হওয়ায় নিজের অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য আইড চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বাধ্য হন। আইড চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ১০০০ শ্রীলঙ্কার টাকা জমা দেন। আইড বলেন, তাঁর শ্রীলঙ্কায় থাকার যাবতীয় খরচ ও শ্রীলঙ্কা থেকে সুইডেনে ফেরার খরচ কোভুরকে বহন করতে হবে। কোভুরের সাহায্যে এগিয়ে আসেন এক ধনী ব্যক্তি। অলৌকিক-বিশ্বাসের পিছনে অর্থব্যয়ের পরিবর্তে অলৌকিক-বিরোধী কাজে অর্থ ব্যয় একজন ধনীর পক্ষে অভাবনীয় ঘটনা বই কী! তিনি আইড-এর শ্রীলঙ্কায় থাকা-খাওয়া ও সুইডেনে ফিরে যাওয়ার সমস্ত খরচ বহন করতে রাজী হন। আইড জানান ১৯৫৭-এর ১ ফেব্রুয়ারি তিনি কলম্বো পৌঁছবেন। ঠিক হয় ১২ ফেব্রুয়ারি তিনি সেন্ট জোসেফ কলেজের পুকুরে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা দেবেন। চ্যালেঞ্জ গ্রহণের খবরটা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে প্রচারের ব্যবস্থাও করেন। শেষ পর্যন্ত আইড আর আসেন নি, তাই এমন এক ক্ষমতার দাবীদারের ক্ষমতার পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নি।

এর পরে ভারতেও এক সন্ন্যাসীর জলে হাঁটার দাবীর কথা শোনা যায়, কিন্তু নিরপেক্ষ জায়গায় পরীক্ষা দিতে সন্ন্যাসী ব্যর্থ হয়।

ধর্ম-গ্রন্থের লেখা পড়ে বা অন্ধ ভক্তের কাছে গল্প শুনে অনেকেরই মনে এই ধরনের একটা ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে—বুঝিবা অলৌকিক ক্ষমতার বলে জলে হাঁটা যায়। কিন্তু, বাস্তবে কৌশল ছাড়া কখনই জলে হাঁটা সম্ভব নয়। যাঁরা জলে হেঁটে দেখান তাঁরা সাধারণত শরীরের আড়ালে লুকানো একটি দণ্ডের সহায়তায় শূন্যে ভেসে জলে পা ফেলেন।

জলের তলায় বারো ঘণ্টা

১৯৫৩-সালের ২৪ জুন 'সত্যযুগ' পত্রিকা এবং ২৫ জুন 'যুগান্তর' পত্রিকা একটা দারুণ চাঞ্চল্যকর খবর ছাপলো—জলের তলায় বারো ঘণ্টা। খবরের বিবরণে জানা গেল কৃষ্ণনগর ষষ্ঠীতলার ২১ বছরের তরুণ প্রদীপ রায় কোনও যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া জলের তলায় একনাগাড়ে বারো ঘণ্টা থাকতে পারে। অবশ্যই এটা একটি বিশ্ব রেকর্ড, কারণ জলের তলায় থাকার আগেকার বিশ্ব রেকর্ড ক্যালিফোর্নিয়ার রবার্ট ফস্টারের। তিনি কোনও কিছুর যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া ১৩ মিনিট ১৫ সেকেণ্ডের মতো জলের তলায় ছিলেন।

প্রদীপ রায় জানিয়েছিলেন—বছর সাতেক আগে আগরতলায় দাদার কাছে থাকার সময় জলে ঝাঁপাতে গিয়ে বুকে আঘাত পান। তারপর থেকেই তাঁর এই-অলৌকিক ক্ষমতা এসে গেছে। মাছের মতোই জলের তলায় থাকতে আর অসুবিধে হয় না।

প্রদীপ রায় পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দেখালেন নিজের অলৌকিক ক্ষমতার স্বপক্ষে একগাদা সার্টিফিকেট। এগুলো নাকি দিয়েছেন পশ্চিম দিনাজপুরের

জেলা শাসক, কাটোয়ার মহকুমা শাসক এবং আরো অনেক হোমরা-চোমরারা।

সমস্ত ঘটনা শুনে এবং নথিপত্র দেখে সুভাষ চক্রবর্তী ঠিক করলেন প্রদীপ রায়ের অলৌকিক ক্ষমতার পরীক্ষা নেবেন। পরীক্ষার দিন ঠিক হলো ১৬ জুলাই। ১৬ জুলাই সরকারি পরীক্ষকদের চোখকে যাতে প্রদীপবাবু ফাঁকি না দিতে পারেন, তার জন্যে এই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সহযোগিতা করার জন্য বেসরকারিভাবে নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি প্রস্তুত হই। আমাকে সহযোগিতা করার জন্যে আমার দুই বন্ধুকেও তৈরি রাখি। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত প্রদীপ রায় ১৬ জুলাই-এর পরীক্ষায় হাজির হন নি। পরিবর্তে ১৫ জুলাই প্রদীপবাবুর পক্ষ থেকে জানানো হয় ১৬ জুলাই প্রদীপ রায়ের জন্মদিন, অতএব সেই দিনের পরীক্ষায় হাজির হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

জানি না পরবর্তীকালে 'সত্যযুগ' ও 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত খবরটি নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে কত জায়গায় হাজির করেছিলেন প্রদীপ রায়।

শরীর থেকে বিদ্যুৎ

১৯৫৫ সালের ২৫ মে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি 'অলৌকিক' (?) খবর প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত পুরো খবরটাই আপনাদের আগ্রহ মেটাবার জন্য তুলে দিচ্ছি।

অলৌকিক !

নয়াদিল্লি ২৪ মে—জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র তাঁর শরীর থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ করতে পারেন। "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক" বিষয়ে গবেষণারত এই ছাত্রের নাম সত্যপ্রকাশ। তার শরীরে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে তিনি ৬০ থেকে ২০০ ওয়াটের ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বালাতে পারেন। অবশ্যই অতি মৃদু আলো। এমন কী মাথা দিয়েও ওই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারেন তিনি। ২৮ বছরের সত্যপ্রকাশ তাঁর এই বিস্ময়কর ক্ষমতাটি লোকের সামনে দেখানোর আগে মিনিট দুই ঘরবন্দী থাকেন। প্রাণায়াম ধরনের ব্যায়াম করেন এবং ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তখনই তার ওই "শক্তি সঞ্চয়" ঘটে। সত্যপ্রকাশ বলেছেন, বাতাস আর্দ্র না হলে এবং ঝোড়ো বাতাস না থাকলেই এই ক্ষমতা দেখাতে তাঁর সুবিধা হয়। ৪৮ ঘণ্টা অনশন করে থাকতে পারলে আরও ভালো। বছর দুয়েক আগে সত্যপ্রকাশ হঠাৎ একদিন এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি তখন হস্টেলে প্রাণায়াম ব্যায়াম করছিলেন। হঠাৎ বোধ করেন যে তাঁর শরীর থেকে বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণ হচ্ছে। —পি· টি· আই

পি· টি· আই-এর দেওয়া এবং আনন্দবাজারে প্রকাশিত খবরটার উপর ভিত্তি করে আমি সত্যপ্রকাশকে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানায় চিঠি দিই ২৭· ৫· ৫৫-তে। তাতে লিখেছিলাম—পত্রিকায় আপনার অলৌকিক ক্ষমতা বিষয়ে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটিতে বলা হয়েছে আপনি অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা আপনার শরীরে বিদ্যুৎ তৈরি করতে পারেন এবং সেই তৈরি বিদ্যুৎ দিয়ে মৃদু আলো জ্বালাতেও সক্ষম। আমি একজন যুক্তিবাদী এবং আপনার অলৌকিক ক্ষমতার দাবীর বিষয়ে অনুসন্ধানে আগ্রহী। আশা করি আমার এই সত্যানুসন্ধানে আপনি সহযোগিতা করবেন। আপনার সুবিধা মতো একটা তারিখ দিলে আমি সেই তারিখে দিল্লি গিয়ে একটি নিরপেক্ষ স্থানে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে

আপনার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে পারি। অনুগ্রহ করে তারিখটা এমনভাবে ফেলবেন যাতে আপনার চিঠি পাওয়ার পর আমি একমাসের মতো হাতে সময় পাই।

আমাদের পশ্চিম বাংলার শহর, শহরতলী ও গ্রামে-গঞ্জে বিভিন্ন পুজো উপলক্ষে বসা মেলাতে বিদ্যুৎ-কন্যার প্রদর্শনী হয়। একটি মেয়ের শরীরে বাল্ব ছুঁইয়ে আলো জ্বালানো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপক বেশি পয়সা রোজগারের জন্য বিদ্যুৎ কন্যাকে-অলৌকিক ক্ষমতাধারী বলে প্রচার করলেও প্রতিটি ক্ষেত্রেই এঁরা বিজ্ঞান এবং বিদ্যুৎ-এর ধর্মকে কৌশল হিসেবে কাজে লাগিয়ে আলো জ্বালান। এই ধরনের বিদ্যুৎ তৈরিকে খেলা হিসেবে আমিও দর্শকদের সামনে দেখিয়েছি। তাই আপনার দাবীর খবরটি পড়ে খবরের সত্যতা সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে জানতে একান্তভাবে আগ্রহী। আমার সন্দেহ হচ্ছে, আপনার গৃহীত একটা সাধারণ বৈদ্যুতিক কৌশলকে বোঝার ভুলে প্রচার মাধ্যমগুলো এইভাবে প্রচার করেছে। এই বিষয়ে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়াকে আপনি একটি চিঠি দিয়ে ভুল ভাঙিয়ে দিলে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটি দেশের বহু লোকের মধ্যে গড়ে ওঠা আপনার সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণার অবসান হবে।

আপনি যদি সত্যিই এই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করেন, তবে সেইক্ষেত্রে আপনার দাবীকে আরো জোরালো করার জন্য আমাকে পরীক্ষা করতে দেওয়ার সুযোগ দিন।

চিঠির উত্তর আজ পর্যন্ত পাই নি।

ভূ-সমাধি

১৯৫৩ সালে ভারতের একটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান—সংক্রান্ত পত্রিকায় ডাঃ কোঠারি, ডাঃ গুপ্ত প্রমুখ তিনজন ডাক্তারের একটি পরীক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে বলা হয়, একজন যোগীকে মাটির নীচে ছোট একটি আধারে ৮০ দিন রেখে দেওয়া হয়েছিল। যোগী সমাধিস্থ অবস্থায় ৮০ দিন শ্বাস না নিয়েও বেঁচে ছিলেন। সমাধিস্থ যোগীর হৃদপিণ্ড কেমন কাজ করে দেখার জন্য ডাক্তাররা যোগীর হৃদপিণ্ডের সঙ্গে E. C. G. যোগাযোগ ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় দিনেই দেখা যায় E. C. G. কাজ করছে না। ফলে, ডাক্তাররা ধরে নেন যে, দ্বিতীয় দিন থেকে যোগীর হৃদপিণ্ডের কাজ বন্ধ ছিল।

ডাক্তার তিনজন যেমন দেখেছেন, তেমনই লিখেছেন, কিন্তু দেখার ও বোঝার মধ্যে কিছু ফাঁক ছিল, যেখান দিয়ে ফাঁকিও ঢুকে পড়া সম্ভব। চোখের আড়ালে ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে অনেক ফাঁকিই থাকতে পারে। থাকতে পারে বায়ু সরবরাহের এমন কী খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থাও। হৃদপিণ্ডের উপর বসানো E. C. G.-র যন্ত্রাংশটিকে সরিয়ে দিলেই E. C. G. কাজ করবে না অথচ হৃদপিণ্ড কাজ করে যাবে। চোখের আড়ালে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে শুধুমাত্র বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে অতীন্দ্রিয় বলা যায় কী?

এই একই পরীক্ষাকে বিজ্ঞান-গ্রাহ্য করতে হলে যোগীকে আগা-গোড়া প্রতিটি তল কাচের তৈরি একটি ঘরে রাখতে হবে, যেখানে সকলে প্রতি মুহূর্তে যোগীকে দেখতে পাবে। কাচের ঘরে একটি মাত্র ছিদ্র থাকবে, যেটা দিয়ে ঘরকে বায়ুশূন্য করা হবে। এই অবস্থায় E. C. G. গ্রহণের ব্যবস্থা রাখলে যোগীর কোনও কৌশল গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

কোনও অতীন্দ্রিয় পরীক্ষা গ্রহণের সময় প্রতিযোগিকে সম্ভাব্য সমস্ত কৌশল গ্রহণের সুযোগ থেকে দূরে রাখতে হবে। যেখানে সুযোগ গ্রহণের অবকাশ রয়েছে সেখানে পরীক্ষাটিকে কখনই যুক্তিগ্রাহ্য ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য বলা যাবে না।

আমার কথায় আপনারা অনেকেই আপত্তি তুলতে পারেন। জানি, আপনাদের অনেকেই বলবেন—আপনি নিজের চোখে কোনও সন্ন্যাসী বা যোগীকে মাটির নীচে মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে শীর্ষাসনে থাকতে দেখেছেন। অনেকে এও দেখেছেন, বড় গর্ত খুঁড়ে গর্তের ভিতর পদ্মাসনে বসে থাকেন যোগী বা সন্ন্যাসী। তারপর তার সারা শরীরটাকেই মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থায় তাঁরা বেশ কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। হ্যাঁ, আপনারা যা দেখেছেন আমিও তা দেখেছি। ঘটনাটা দেখলে যেমন যোগের অলৌকিক ফল বলে মনে হয়, বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু আদৌ তা নয়। ভূ-সমাধির আগে সন্ন্যাসী বা যোগী মহারাজ তাঁর মাথাটা একটা পাতলা কাপড়ে ঢেকে নেন, যাতে চোখে মুখে বা নাকে মাটি ঢুকে না যায়। ভূ-সমাধির গর্তটা বেশ কিছুটা বড় করা হয় এবং উপর থেকে আলগা মাটি ঢেলে শরীর বা মাথাটার ভূ-সমাধি ঘটানো হয়। আলগা মাটির ফাঁক দিয়ে অনায়াসেই বায়ু চলাচল করে এবং নাক পাতলা কাপড়ের ছাঁকনি ভেদ করে এই বায়ুর সাহায্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালিয়ে যায়। দীর্ঘ অধ্যবসায় ও অনুশীলনের ফলে শরীরে অক্সিজেনের প্রয়োজন কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। এই অনুশীলনকেই সাধু-সন্ন্যাসী-যোগীরা যোগের অলৌকিক শক্তি বলে প্রচারে লেগে পড়েন।

কলকাতার রাজভবনের কাছে একটি যোগীকে দেখেছিলাম যে ভূ-সমাধির গর্তে বায়ু আসার জন্য একটি নলের ব্যবস্থা রেখেছিল। নলটা মাটির তলা দিয়ে গিয়েছিল দূরে বসে থাকা তারই কয়েকজন সঙ্গীর ঝোলায়। ভূ-সমাধির মাটি ভালো করে পিটিয়ে বন্ধ করা ছিল বলেই আমি বায়ু-নলের উপস্থিতি অনুমান করতে পারি। যোগীবাবার সহকারী যেখানে বসে ছিল সেখানটা পরীক্ষা করতেই কৌশল বেরিয়ে পড়ে। উপস্থিত দর্শকদের প্রচণ্ড গালাগাল শুনতে শুনতে দু'জনেই দ্রুত তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

জাদু জগতের বিস্ময় জাদুকর হ্যারি হুডিনিকে (Harry Houdini) একবার কফিনে পুরে ৬ ফুট মাটির নীচে পুঁতে রাখা হয়েছিল। ৬০ মিনিট পরে কফিনটি উপরে তোলা হয় এবং দেখা যায় হুডিনি জীবিত।

রাস্তায় দেখান হচ্ছে টেলিপ্যাথির খেলা

১৯২৮ সালে এক ফরাসী সাংবাদিককে কফিনে পুরে জলের তলায় নামিয়ে দেওয়া হয়। ৮৫ মিনিট পরে কফিনটি উপরে তুলে দেখা যায় সাংবাদিক সুস্থ। দুটি ক্ষেত্রেই এই খেলা দেখানো হয়েছিল নেহাৎই খেলার মেজাজে, অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দাবী তুলে নয়।

জাতিস্মর

জাতিস্মরতাকে বিরাটভাবে আশ্রয় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে পরামনোবিদ্যা বা Parapsychology। পরামনোবিজ্ঞানীরা বরাবরই প্রমাণ করতে চেয়েছেন কোনো কোনো মানুষ তার পূর্বজন্মের স্মৃতিকে উদ্ধার করতে সক্ষম. কিছু কিছু পরামনোবিজ্ঞানী আরো এক ধাপ এগিয়ে এসে বলেছেন—কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহন করে তার পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধার করা সম্ভব।

জাতিস্মর নিয়ে আলোচনার আগে আত্মা নিয়ে আলোচনা সেরে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি, কারণ, পরামনোবিদ্যা আত্মার পুনর্জন্ম থেকেই জাতিস্মরকে আমদানি করেছে। আর, আত্মা অবিনশ্বর এই ধারণা থেকেই এসেছে আত্মার পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ।

প্রায় ধর্মেই আত্মার অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে। তবে, বিভিন্ন ধর্মে আত্মার সম্বন্ধে বিভিন্ন রকমের ধারণা ও বিশ্বাস রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের ধারণার মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও প্রত্যেক ধর্মই কিন্তু আত্মা বিষয়ে তাদের ধারণাকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করে। মানবের মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার কী পরিণতি হয়, তা নিয়েও বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস বিভিন্ন ধরনের।

হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা মনে করেন 'আত্মা' ও 'প্রাণ' এক নয়। 'আত্মা' হলো 'মন'। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু, আত্মা বা মন শেষ হয় না। আত্মা 'অজ' অর্থাৎ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত এবং বিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর ক্ষেত্রেই ধর্ম-মত নির্বিশেষে আত্মার এই ধর্ম চিরন্তন সত্য।

প্রাচীন আর্য বা হিন্দুরা একটি মাত্র স্বর্গে বিশ্বাসী ছিলেন। এই স্বর্গের নাম ছিল 'ব্রহ্মালোক' অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রাহ্মার রাজ্য। প্রাচীন হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পর আত্মা ব্রহ্মালোকে যায়। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মে এলো কর্মফল। বলা হলো, যারা ইহলোকে ভাল কাজ করবে, তারা তাদের ভালো কর্মফল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রহ্মালোকে থাকবে। তারপর আবার ফিরে এসে জন্ম নেবে পৃথিবীতে আপন কর্মফল অনুসারে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, চন্দ্রলোকেই পিতৃপুরুষদের আত্মারা থাকে। চাঁদ থেকেই প্রাণের বীজ ঝরে পড়ে পৃথিবীর বুকে। হিন্দুরা গোড়ার দিকে নরক বিশ্বাস করতেন না। পরে, ভয়ের দ্বারা মানুষকে ধর্ম মেনে চলাতে, ভালো কাজ করাতে গোষ্ঠীজীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু নীতি মেনে চলাতে বাধ্য করার জন্য সৃষ্টি হলো নরকের। প্রাচীন যুগের শোষক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ সমাজ অর্থাৎ শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায় শোষণ ও ঐশ্বর্যভোগের লালসায় জন্মান্তরবাদের সঙ্গে যুক্ত করলো কর্মফলকে। কৃষক ও দাস সম্প্রদায়কে জন্মান্তর ও কর্মফলের আফিং খাইয়ে প্রতিবাদহীন রাখা হলো। প্রতিটি অত্যাচার, অন্যায় ও দারিদ্রতাকে আগের জন্মের কর্মফল হিসেবে একবার বিশ্বাস করাতে পারলে আর পায় কে?

বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করে ধর্মের নামে বলা হলো, আপনি এই জন্মে সৎভাবে নিজস্ব কাজ করুন, মৃত্যুর পর এবং পরজন্মে এর ফল পাবেন। আপনি শূদ্র? আপনার নিজস্ব কাজ উচ্চ-সম্প্রদায়ের সেবা করা।

ভারতবর্ষে দাস প্রথা ছিল, কিন্তু কর্মফলের আফিং-এর নেশায় দাস বিদ্রোহ হয় নি।

ভারতের প্রাচীন আয়ুর্বেদে বলা আছে, মৃত্যুর পর মানুষ পঞ্চভূতে বিলীন হয়।

মানুষকে শোষণ করার সবচেয়ে বড় অহিংস হাতিয়ারকে অকেজো করে দেওয়ার এই চেষ্টাকে সেই সময়কার উচ্চবর্ণের মানুষ মেনে নিতে পারে নি, বৈদ্যদের তাই অচ্ছুত বলে ঘোষণা

করা হয়েছিল।

বেদান্তের অনুগামীরা মনে করেন, কোনও আত্মাই অনন্তকাল ধরে বা চিরকালের জন্য স্বর্গে বা নরকে বাস করে না। এক সময় তাদের স্বর্গ ও নরক ভোগের কাল ফুরোবে, তখন আবার জন্ম নিতে হবে পৃথিবীতে।

বেদান্তের মতে আত্মার জন্ম নেই, আত্মা শাশ্বত অমর। আত্মা তবে কোথা থেকে কীভাবে এলো? না, উত্তর নেই।

প্রাচীন মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের ভিতরেই হাত, পা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে আর একটি ছোট্ট মানুষ বাস করে। সেটিই হলো 'দ্বিতীয় সত্তা' বা আত্মা। তারা এও মনে করতেন যে শরীরের কোনও অঙ্গহানি হলে আত্মারও অঙ্গহানি হবে।

প্রাচীন যুগে পারসিকরা বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা স্বর্গে গিয়ে স্বর্গদূত হয়। তাঁরা এও বিশ্বাস করতেন যে বিদেহী আত্মাদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে।

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা আত্মার অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী। সৎ আত্মা অনন্তকাল বা চিরকালের জন্য ভোগ করে সুখ এবং অসৎ-আত্মা অনন্তকালের জন্য ভোগ করে দুঃখ। খ্রীষ্টধর্মীয়রা বিশ্বাস করেন যীশু আত্মাকে অমরত্ব দান করেছেন, যীশুর জন্মের আগে মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও মৃত্যু হতো।

মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করেন, যারা আল্লার আদেশ মেনে চলেন তাদের আত্মা স্থান পায় 'বেহেস্ত'-এ বা স্বর্গে। যারা আল্লার আদেশ মান্য করেন না তাদের আত্মার স্থান হয় 'দোজখ'-এ বা নরকে। বেহেস্তে আছে গাছের ছায়া, বয়ে চলেছে টলটলে জলের নদী, দুধের নদী, মধুর নদী, সুরার নদী। স্বর্গের সুন্দরী হুরী বা পরীরা পুণ্যাত্মাদের পেয়ালা পূর্ণ করে দেয় সুরায়।

আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে স্বর্গ সম্বন্ধে ধারণা, সেখানে রয়েছে শিকার করার মতো দারুণ সুন্দর জায়গা। মৃত্যুর পর আত্মারা মহানন্দে সেখানে শিকার করে।

ইহুদীরা বিশ্বাস করেন, জেহোবা থেকেই মানুষের আত্মা বা প্রাণবায়ু এসেছে, এবং মৃত্যুর পর এই প্রাণবায়ু ফিরে যায় জেহোবা'রই কাছে।

বৌদ্ধধর্ম প্রথমে আত্মার অস্তিত্ব ও পুনর্জন্মকে অস্বীকার করেছিলেন। বৌদ্ধ-দর্শনিকরা আত্মার নিত্যতাকে মেনে নেন নি। পরবর্তীকালে জাতক কাহিনী পুনর্জন্মবাদকে নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তার কারণ ছিল বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব।

আত্মা নিয়ে এমনি কত ধর্ম কত রকম অনুমানই না করে নিয়েছে, এমন কী এও দেখতে পাই একই ধর্মে বিভিন্ন সময়ে আত্মা ও স্বর্গ, নরক নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করেছে।

আর এই সব অনুমান ও ধারণাই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা অন্ধ-বিশ্বাসে 'নিজেদেরটাই একমাত্র ঠিক' বলে আঁকড়ে ধরে বসে রয়েছেন। আত্মা নিয়ে নিজের ছাড়া অন্য ধর্মের ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করতেও কিন্তু অনেকেই যথেষ্ট সচেষ্ট, এবং এই সব প্রমাণ করার জন্য অনেকে অনেক বই-পত্তরও লিখে ফেলেছেন। আত্মা নিয়ে নানা ধর্মমতের নানা রকমের ধারণার ঠেলায় ও নিজেদের ধর্মের ধারণাই সত্য বলে জাহির করার গুঁতোগুঁতিতে পরামনোবিজ্ঞানীরা বেশ কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছেন বই কী। কারণ, এই সব আধ্যাত্মিক ধর্মচেতনাকে পুঁজি করে পরাবিদ্যা বিদেহী আত্মাকে

নিয়ে আসতে না পারলে প্ল্যানচেটের কার্যকারিতা যে বিজ্ঞানের যুক্তির কাছে বানের জলে কুটোর মতোই ভেসে যায়, সেই সঙ্গে ভেসে যায় পুনর্জন্মের গোটা তত্ত্বটাই। ধর্মবিশ্বাসের মতো একটা প্রচণ্ড স্পর্শকাতর বিষয়কে কাজে লাগাতে পারলে যুক্তির ফাঁকগুলো ধর্মের দোহাই দিয়ে ভরাট করা যাবে, এই মানসিকতাতেই ধর্মের দোহাই পেড়েছেন পরামনোবিজ্ঞানীরা।

আমাদের ভারতের পরামনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম-ডাকই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "বিজ্ঞান সাধনা ও আধ্যাত্মিক ধর্মচেতনার যে সহজাত সংঘাত ধারাবাহিক কাল থেকে চলে আসছে তারই যোগসূত্র বা মিলনের সেতুবন্ধ সন্ধানে পরামনোবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণার উৎপত্তি। বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদের এই মৌলিক ব্যুৎপত্তিগত সংঘাতের ফলশ্রুতি হিসেবে কিছু চিন্তাশীল ব্যক্তি ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞানগ্রাহ্য ব্যাখ্যার খোঁজে অনুশীলন করছেন।" (যুগান্তর ১০·৩·১৯৫৮)

ওই একই প্রবন্ধে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেছেন "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে কি নেই এই মূল প্রশ্নের ওপরই ধর্মের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল।"

ঈশ্বরবিদ্যা বা Theosophy বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন প্রকারের অন্ধবিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধর্মের সঙ্গে অলৌকিক বিশ্বাস পুরোপুরি জড়িয়ে রয়েছে। ধর্মগ্রন্থগুলোর সত্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

ঈশ্বরবিদ্যা এক ধরনের সামাজিক চেতনা বা বিশ্বাস। এই চেতনা বা বিশ্বাসের স্রষ্টা মানুষ স্বয়ং। অর্থাৎ, সোজা কথায়—ঈশ্বর মানুষেরই সৃষ্টি। ঈশ্বর কোনও দিনই মানুষকে সৃষ্টি করে নি।

ডঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞানগ্রাহ্য ব্যাখ্যার খোঁজ কতখানি পেয়েছেন জানি না, তবে আজ পর্যন্ত তিনি যে সব ব্যাখ্যা হাজির করেছেন তার কোনটিই বিজ্ঞানগ্রাহ্য হয় নি।

আত্মার বাস্তব অস্তিত্ব থাকলে তার উৎপত্তি, উপাদান, গঠন বা চেহারা এবং মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মার কী হয় এই সব মূল বিষয়গুলো নিয়ে আত্মায় বিশ্বাসী ধর্মগুরুরা নিশ্চয়ই একই মত পোষণ করতেন, আত্মার ব্যাখ্যায় ধর্ম-ধর্মে এমন 'বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি'র হাল হতো না। কার বিশ্বাস ছেড়ে আপনি কার বিশ্বাস মানবেন? শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পবামনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য জাতিস্মর তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদে হিন্দু ধর্মতত্ত্বকেই মেনে নেবেন, কারণ, প্রধান ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র হিন্দু ধর্মই পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। অতএব অন্য সব ধর্ম-বিশ্বাসকে মিথ্যে বলে হিন্দু ধর্ম-বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলা ছাড়া পরামনোবিজ্ঞানীদের আর উপায় কী?

বিদেহী আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে ধর্মগুলোর মধ্যে বিরোধ আরো বেশি। বিশ্বে প্রধান ধর্মমত হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান। হিন্দু ধর্ম আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে। মুসলিম ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে না। আর, প্রত্যেকটি ধর্ম তাদের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে।

হিন্দুধর্মে বলা হয়েছে—যেমন দিন যায় রাত আসে, যেমন সুখ যায় ও দুঃখ আসে, তেমনি জন্ম হয় মৃত্যু আসে, আবার জন্ম হয় আবার আসে মৃত্যু। প্রতিটি মানুষের আত্মার ক্ষেত্রেই (তা সে যে ধর্মেই বিশ্বাসী হোক না কেন) এমনিভাবে অনন্তকাল ধরে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে আত্মার জন্ম-মৃত্যুর খেলা।

মুসলমান ধর্মে বলা হয়েছে—মৃত্যুর পর আত্মা বেহেস্ত-এ (স্বর্গে) বা দোজখ-এ (নরকে) সুখ বা দুঃখ ভোগ করবে আল্লার শেষ বিচারের দিন (কেয়ামত) পর্যন্ত। সহস্র বছর ধরে যত মানুষ মারা গেছে, সব ধর্মের সব মানুষের বিদেহী আত্মারই পুনরুত্থান হবে শেষ বিচারের দিনটিতে। হিন্দুদের বিশ্বাস মতো আত্মার পুনরুজ্জীবনে বা আত্মার জন্ম-মৃত্যুর চক্রাকারে আবর্তনের মতবাদকে ইসলাম ধর্মের কাছে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় নি।

খ্রীষ্টধর্মীয়েরা বিশ্বাস করেন—বিশ্বের যে কোনও ধর্মের প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পর বিদেহী আত্মা পাপ বা পুণ্য ফল হিসেবে ভোগ করে অনন্ত দুঃখ বা অনন্ত সুখ। এখানে অনন্ত মানে, সীমাহীন, যার শেষ নেই। খ্রীষ্টধর্মও হিন্দুদের আত্মার পুনর্জন্মের তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করেছে। এমন কী, অনেক প্রাচীনপন্থী গোঁড়া খ্রীষ্টান মনে করেন অমরত্ব ও নিত্যতা আত্মার স্বভাব ও ধর্ম নয়। তাঁরা মনে করেন, অমরতাকে লাভ করা যায় ভালো কাজ ও যীশুর প্রতি বিশ্বাসের পুরস্কার স্বরূপ। অর্থাৎ, মোদ্দা কথায় তাঁরা মনে করেন, বেশির ভাগ মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের আত্মারও মৃত্যু ঘটে।

আত্মা, পরলোক ও জন্মান্তর বিষয়ে, স্বামী অভেদানন্দ

আত্মা, পরলোক, প্ল্যানচেট, মিডিয়াম ও জন্মান্তর নিয়ে ভারতবর্ষের জনপ্রিয়তম বইটি নিঃসন্দেহে স্বামী অভেদানন্দের 'Life beyond Death' এবং এই বইটিরই বাংলা অনুবাদ 'মরণের পারে'। জন্মান্তরে বিশ্বাসীদের কাছে অভেদানন্দের বই দুটি গীতা, বাইবেল ও কোরাণের মতোই অভ্রান্ত। 'অলৌকিক বনাম বিজ্ঞান' জাতীয় বহু সেমিনার অথবা আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রশ্ন পেয়েছি—(১) স্বামী অভেদানন্দ তাঁর 'মরণের পারে'-তে আত্মার অস্তিত্বের কথা বলেছেন, তাঁর বক্তব্য কী তবে মিথ্যে? (২) 'মরণের পারে'-তে আত্মার যে ছবিগুলো প্রকাশিত হয়েছে তা কী তবে মিথ্যে? (৩) স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বইতে এক রকম যন্ত্রের কথা বলেছেন, যার সাহায্যে আত্মার ওজন নেওয়াও সম্ভব হয়েছে, এরপরও কী বিজ্ঞান আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারে? (৪) মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে আসা কুয়াশার মতো আত্মার অস্তিত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, তাঁরা এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন 'এক্টোপ্লাজম্' বা 'সূক্ষ্ম-বহিঃসত্তা'। বিজ্ঞান যেখানে আত্মার অস্তিত্বকে বা 'এক্টোপ্লাজম'কে স্বীকার করে নিচ্ছে, সেখানে আত্মাকে অবৈজ্ঞানিক চিন্তার ফসল বা অন্ধধারণা মাত্র বললে চলবে কী? এ তো তবে বিজ্ঞানের নামে অবিজ্ঞানকেই মেনে নেওয়া, যুক্তির নামে মেনে নেওয়া অযুক্তিকে!

অহরহ এই ধরনের বহু প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং হচ্ছে আমাকে। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর বইতে ঠিক কী বলেছেন, তাঁর মতামত কতখানি বিজ্ঞানগ্রাহ্য, এবং 'বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে' বলে স্বামী অভেদানন্দ যা দাবী করেছেন, তার কতখানি সত্যি—এ বিষয়ে আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন, কারণ, (১) দীর্ঘ বছর ধরে বই দুটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। (২) লক্ষ লক্ষ পাঠক পাঠিকা স্বামী অভেদানন্দের ধারণাকেই সত্যি ও বিজ্ঞানগ্রাহ্য বলে মনে করেছেন।

আসুন, আমরা খোলা মনে যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেখি 'মরণের পারে' বইটিতে আত্মার বিষয়ে কী কী বলা হয়েছে এবং সেগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত।

স্বামী অভেদানন্দের 'মরণের পারে' বইটির ত্রয়োদশ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে, বৈশাখ ১৩৯২

বঙ্গাব্দে। প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ। প্রথম পাতাতেই লেখা রয়েছে—

মরণের পারে (বৈজ্ঞানিক আলোচনা)

বৈজ্ঞানিক আলোচনামূলক এই অমূল্য গ্রন্থটির ২৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে—বিশেষ এক ধরনের সূক্ষ্ম যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যে যন্ত্রটির সাহায্যে মৃত্যুর পর দেহ থেকে বেরিয়ে যাওয়া বাষ্পতুল্য আত্মা বা মনকে ওজন করা সম্ভব। দেখা গেছে আত্মার "ওজন প্রায় আর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিনভাগ"।

আত্মার ওজন নেওয়ার যন্ত্র যদি আবিষ্কৃত হয়েই থাকে, তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যায়। এর পরেও আত্মার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করে কোন্ বিজ্ঞান-মনস্ক ? কোন্ যুক্তিবাদী ?

বিজ্ঞান কিন্তু এমন কোনও যন্ত্রের অস্তিত্বের কথা আজও জানে না। স্বামী অভেদানন্দও জানান নি যন্ত্রটির নাম। এই বিষয়ে পরামনোবিজ্ঞানীরাও রা কাড়েন নি। অথচ বাস্তবিকই এমন জব্বর আবিষ্কারের খবর শোনার পর আমার অন্তত জানতে ইচ্ছে করে আত্মা অর্থাৎ মনের ওজন মাপা সূক্ষ্ম যন্ত্রটির নাম, তার আবিষ্কারকের নাম; কত সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল, আবিষ্কারক কোন দেশের লোক ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু উত্তর কে দেবেন ? কোনও পরামনোবিজ্ঞানী না, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ?

স্বামী অভেদানন্দের ধারণায় আত্মার রূপ বায়বীয় বা কুয়াশার মতো বাষ্পীয়। তিনি বলেছেন, "মরণের সময় দেহ থেকে যে একপ্রকার সূক্ষ্ম-বাষ্পীয় পদার্থ নির্গত হয়ে যায় তা জ্যোতিষ্মান। ঐ জ্যোতিষ্মান পদার্থটির ফটোগ্রাফ বা ছবি তোলা হয়েছে এবং সূক্ষ্মদর্শীরা মরণের সময় দেহ থেকে ওটিকে বার হয়ে যেতেও দেখেছেন। তখন সারা দেহটি এক বিভাময় কুয়াশার পরিমণ্ডলে আচ্ছন্ন হয়।" (পৃষ্ঠা-২৮)

মরণের সময় প্রতিটি দেহ থেকেই যখন কুয়াশার মতো আত্মা বেরিয়ে এসে মৃতদেহটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তখন সকলেই কেন এই আত্মাকে দেখতে পায় না ? উত্তরে অবশ্য স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, সূক্ষ্মদর্শীরা দেখতে পান। অর্থাৎ আমরা সাধারণেরা সূক্ষ্মদর্শী নই, তাই দেখতেও পাই না।

স্বামী অভেদানন্দ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন, "আত্মা যখন মরণের পর দেহ ছেড়ে যায় তখন তার ফটোগ্রাফ বা আলোকচিত্র নেওয়া যায়।" (পৃষ্ঠা—২৮)

কুয়াশার মতো আত্মার ফটোগ্রাফ কী সাধারণ ক্যামেরাতেই নেওয়া যায় ? আর তা যদি না হয়, তবে অসাধারণ ক্যামেরাটার নাম কী ? অবশ্য বইটা আগাগোড়া পড়ে এবং বইয়ের রচনা কাল থেকে আমার মনে হয়েছে তিনি খুব বেশি হলে তখনকার দিনের একটু ভালো ধরনের ক্যামেরার কথা বলেছেন। আজ থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগেকার একটু ভালো ধরনের ক্যামেরার লেন্স এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না যার ফলে ক্যামেরার লেন্সে যে কুয়াশাময় আত্মা ধরা পড়ে, তা সাধারণের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না ?

ক্যামেরায় আত্মার ছবি তোলার গল্প আড্ডায় বা মজলিসে বলা চলে কিন্তু বিজ্ঞানের দরবারে প্রমাণ হিসেবে হাজির করা যায় না। আর, এই সত্যটা পরামনোবিজ্ঞানীরা বেশ ভালোই বোঝেন।

কুয়াশাময় আত্মার কথা বলতে গিয়ে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "একটি মেয়ের ঘটনা

আমার মনে আছে—কয়েক বছর আগে লস্ এঞ্জেল্স-এ তার ভাই মারা যায়। এ'কথাটি আমি অবশ্য শুনেছি তার মার কাছ থেকে। ভাই যখন মারা যাচ্ছে মেয়েটি তখন মৃত্যুশয্যায় বসে। সে বলে উঠলো তার মাকে : "মা, মা, দেখ—ভাইয়ের দেহটার চারদিকে কেমন একটি কুয়াশাময় জিনিস ? কি ওটা ?" মা কিন্তু তাব কিছুই দেখতে পেল না।"

ছোট মেয়েটি কুয়াশার মতো যে জিনিসটি দেখেছিল, সেটা যে আত্মা, তাই বা কী করে স্বামী অভেদানন্দ ধরে নিলেন ? স্বামীজি এও বলেছেন, মৃতের মা কিন্তু ওই কুয়াশা দেখে নি। মেয়েটি সত্যিই যদি ওই ধরনের কিছু দেখে থাকে তবে তা visual illusion (ভ্রান্ত দর্শনানুভূতি) বা visual hallucination (অলীক দর্শন) মাত্র।

স্বামীজি স্বয়ং নাকি প্ল্যানচেটেব আসরে এই ধরনের কুয়াশার মতো আত্মাকে দেখেছেন। এমন কী এই সব কুয়াশার মতো বিদেহী আত্মারা জড়দেহ ধাবণ করে নাকি তাঁকে স্পর্শও করেছে।

স্বামী অভেদানন্দেব এই কুয়াশার মতো আত্মা দর্শন ও আত্মাদের স্পর্শ পাওয়া মনোবিজ্ঞানেব ভাষায় visual illusion (ভ্রান্ত দর্শনানুভূতি) বা visual hallucination (অলীক দর্শন) এবং tactile illusuion (ভ্রান্ত স্পর্শানুভূতি) বা tactile hallucination (অলীক স্পর্শনাভূতি)। Illusion ও hallucination নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি বলে আবার দীর্ঘ আলোচনায় গেলাম না।

এর পরেও কেউ যদি বলেন, স্বামী অভেদানন্দের আত্মা দর্শন ও আত্মাব স্পর্শ পাওয়াব ব্যাপাবটা illusion বা hallicination ছিল না, তবে আমাকে একান্ত বাধ্য হয়ে অপ্রিয় সত্যি কথাটাই উচ্চাবণ করতে হবে —এই ধরনেব ঘটনার পিছনে আর দুটি মাত্র কাবণ থাকতে পারে. (১) কেউ স্বামীজিকে ঠকিয়ে কৌশলের সাহায্যে কুয়াশায় আত্মা দেখিয়েছে এবং আত্মাব ছোঁয়া অনুভব করিয়েছে। (২) স্বামীজি আমাদেব সঙ্গে রসিকতা করে গল্প লিখেছেন।

আত্মার কুয়াশাময় রূপের প্রমাণস্বরূপ স্বামী অভেদানন্দ এক্স-রে ছবির কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, "আমাদের দেহের কোন অংশ যদি এক্স-রে বা বঞ্জনরশ্মিব সাহায্যে পরীক্ষা কবে দেখি, দেখব—হাতের বা দেহের অংশটি কুয়াশাময় পদার্থকণায় পরিপূর্ণ চারিদিকে যেন তারা ঝুলছে। সুতরাং যে দেহকে আমরা জড পদার্থ বলি আসলে সেটা জড নয়, তা মেঘেব বা কুয়াশার মতো এক পদার্থ বিশেষ।" (পৃষ্ঠা—৩২)

এখানেও কিন্তু স্বামী অভেদানন্দ বিজ্ঞানেব সাধারণ নিয়মগুলোকে, কার্য-কাবণগুলোকে না জেনেই অনেক কিছু লিখে ফেলে গোল পাকিয়েছেন। শরীরের হাড, মাংস, পেশী ইত্যাদিব ঘনত্বের বিভিন্নতার জন্য এক্স-রে'র ছবিতে সাদা-কালো রঙের গভীরতারও বিভিন্নতা দেখা যায়। আর, এই রঙের গভীরতার বিভিন্নতাকেই 'মেঘের মতো কুয়াশাব মতো এক পদার্থবিশেষ' বলে ভুল করেছেন স্বামীজি।

স্বামী অভেদানন্দের সুরে সুর মিলিয়ে ভারতবর্ষের আত্মায় বিশ্বাসীরা আত্মাকে বায়বীয় বা কুয়াশার মতো কিছু ভাবলেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের আত্মায় বিশ্বাসীরা কিন্তু আত্মাকে বায়বীয় বলে মেনে নিতে রাজি নয়। মালয়ের বহু মানুষের বিশ্বাস আত্মার রঙ রক্তেব মতোই লাল, আয়তনে ভুট্টার দানার মতো। প্রশান্ত-মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা আত্মা তরল। অস্ট্রেলিয়ার অনেকেই মনে করেন আত্মা থাকেন বুকের ভিতর হৃদয়ের গভীরে, আয়তনে অবশ্যই খুব ছোট্ট। অনেক জাপানীর ধারণা—আত্মার রঙ কালো।

একবার ভাবুন তো, আত্মার চেহারাটা কেমন, তাই নিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন মত। অথচ স্বামী অভেদানন্দই এক জায়গায় বলেছেন, "আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু'রকম বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখণ্ড।" (পৃষ্ঠা—৩১)

তবে কেন আত্মার গঠন নিয়ে বিভিন্ন ধর্মের সত্য বিভিন্ন ধরনের ? কেন এক ও অখণ্ড নয় ? বুঝতে অসুবিধে হয় না, এই বিশ্বাসগুলো যার যার ধর্মের নিজস্ব বিশ্বাস। এই সব বিশ্বাস বা সত্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের কোনও সম্পর্ক নেই।

স্বামী অভেদানন্দ জানিয়েছেন—"বিজ্ঞানীরা এই কুয়াশার মতো আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন, এবং ঐ বস্তুটির নাম দিয়েছেন 'এক্টোপ্লাজম' বা সূক্ষ্ম-বহিঃসত্তা। এটি বাষ্পময় বস্তু এবং এর কোন একটা নির্দিষ্ট আকার নাই। একে দেখতে একখণ্ড ছোট মেঘের মতো, কিন্তু যে-কোন একটা মূর্তি বা আকার এ' নিতে পারে।" (পৃষ্ঠা—২৮-২৯)

দুটো কথা স্পষ্ট করে বলে নিই (১) বিজ্ঞান কুয়াশার মতো আত্মার অস্তিত্বকে আদৌ স্বীকার করে নি। (২) বিজ্ঞান এই অস্তিত্বহীন কুয়াশার মতো আত্মাকে 'এক্টোপ্লাজম' নামে অভিহিত করে নি। 'এক্টোপ্লাজম' (Ectoplasm) বলতে বিজ্ঞানীরা কোষ-এর (cell-এর) বাইরের দিকের অংশকে বোঝান। এমন করে 'উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপিয়ে নিজের মতকে বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করার অপচেষ্টায় দেশের জনসাধারণকে ভুল বুঝিয়ে কুসংস্কারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে মানুষের ক্ষতিই করা হয়, সেবা করা যায় না এবং নিশ্চয়ই একে সৎ প্রচেষ্টাও বলা চলে না। একদিকে জীবসেবার কথা বলে অন্যদিকে কুসংস্কার সৃষ্টি করে এবং 'পূর্বজন্মের কর্মফল'-এর নামে সমস্ত অন্যায়কে মেনে নেওয়ার মতো মানসিকতা তৈরি করে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে একান্তই স্ববিরোধিতা।

স্বামীজির কথা মতো আত্মা যদি কুয়াশার মতো বাষ্পময় বস্তুই হয়, তবে তো খাদ্যে বিষক্রিয়ায় একই বাড়িতে বা একই পাড়ার অনেকে মারা গেলে চারদিক কুয়াশাময় হয়ে যাওয়া উচিত, অথবা কোনও ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টের পর সেখানটায় মৃত শরীরগুলো ঘিরে থাকা উচিত ঘন কুয়াশা, যা মানুষের চোখেও ধরা পড়বে, ধরা পড়বে ক্যামেরার লেন্সে। কিন্তু, হায়, বাস্তবে এর কোনোটাই ঘটে না।

স্বামী অভেদানন্দ মত প্রকাশ করেছেন যে, এই কুয়াশার মতো বাষ্পময় আত্মাই আমাদের মন। তাঁর ভাষায়, "আত্মা বা মন মস্তিষ্কের বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়।" ((পৃষ্ঠা—৯৮)

তিনি আরও বলেছেন, "মন মস্তিষ্ক হতে ভিন্ন কোন বস্তু, মস্তিষ্ক একটি যন্ত্রবিশেষ—যাকে ব্যবহার্য করে তোলে বা কাজে লাগায় আত্মা, মন কিংবা অন্য কিছু বস্তু—যাই বল না কেন।"

(পৃষ্ঠা—৯৭)

তিনি এও বলেছেন—মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করে 'মন' বা 'আত্মা' নামের কোনও জিনিস খুঁজে না পেলেই তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যখন তুমি বলবে, "আত্মা বলে কোন জিনিসই নেই, আর এটি বলা মানেই তুমি আর একটা মন বা আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিলে ; কেননা তুমি যা জানছো 'মনের বা আত্মার সত্তা নেই'—তাও জানছো মন দিয়ে"..."যদি বলো যে, মনের বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই, তবে সেটা হবে কেমন—যেমন এখুনি যদি বলো যে, তোমার জিহ্বা নেই। আমি কথা কইছি জিহ্বা ব্যবহার ক'রে অথচ যদি বলো যে জিহ্বা নেই,

তাহলে সেটাতে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে। (পৃষ্ঠা—১০১)

'মরণের পারে' গ্রন্থটির ভূমিকায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দও মনকেই আত্মা বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ধারণায় "ইহলোক—স্থূল ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে, আর পরলোক— সূক্ষ্ম-মনের ও মানসিক সংস্কারের রাজ্যে।" (পৃষ্ঠা—এগার)

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ আরো বলেছেন, "'মরণের পারে' এক রহস্যময় দেশ—যে দেশে সূর্য নাই, চন্দ্র নাই, নক্ষত্র নাই, যে দেশে স্থূল নাই, কেবলই সূক্ষ্ম-ভাবনা ও সূক্ষ্মচিন্তার রাজ্য। এই চিন্তার রাজ্যকেই মনোরাজ্য বা স্বপ্নরাজ্য বলে।" ..."মনের সেখানে বিলাস—চলা, বসা, খাওয়া দেওয়া-নেওয়া, এই সমস্ত পরলোকবাসী জীবাত্মা ভোগ করে মনে তাই মনেরই সেটি রাজ্য, মনেরই সেটি লোক।" (পৃষ্ঠা—এগার)।

স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানন্দের এই কথাগুলো থেকে যে কটা জিনিস স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আসে, তা হলো—(১) আত্মাই মন, মনই আত্মা। (২) মন মস্তিষ্কের বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত নয়। (৩) মনের অস্তিত্বকে যারা অস্বীকার করতে চায় তারা চূড়ান্ত অজ্ঞ। আর, মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা মানেই আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করা। (৪) পরলোকবাসী আত্মাদের মস্তিষ্ক বলে কোনও পদার্থ না থাকলেও, তারা পরলোকরাজ্যে সূক্ষ্ম-ভাবনা ও সূক্ষ্ম-চিন্তা করে।

দুই স্বামীজির লেখা পড়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না 'মন' বিষয়ে তাঁদের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু নেই। সবার সব বিষয়ে জ্ঞান থাকা কখনই সম্ভব নয়, এই সত্যকে মেনে নিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি, 'বৈজ্ঞানিক আলোচনা'র লেবেল এঁটে সাধারণের সামনে যখন কোনও কিছু তত্ত্ব ও তথ্যকে তুলে ধরার জন্যেই এই গ্রন্থ রচনা, তখন যে-সব বিষয় নিয়ে 'বৈজ্ঞানিক-আলোচনা' করতে চান সেই সব বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলে একটু জেনে নেওয়া উচিত নয় কী ? নতুবা এ যে বিজ্ঞানের নামে নিজের ভ্রান্ত ধারণাকে চাপিয়ে দেওয়ার পাগলামোতে পরিণত হয়!

'মন' বিষয়ে আলোচনা করার আগে দুই স্বামীজি যে কোনও চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলেই বা মনোবিজ্ঞানের বই পড়লেই জানতে পারতেন—মন কোনও 'জিনিস' নয়, মন বা চিন্তা হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল। তাই মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করলেও মনকে দেখতে পাওয়া যায় না। তবে দেখতে পাওয়া যায় মস্তিষ্কের কোষগুলোকে, যাদের সংখ্যা ১৪০০০কোটি থেকে ১৫০০০ কোটি।

'মন' বা 'চিন্তা' যেহেতু মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফল, অতএব মনকে 'মস্তিষ্ক বহির্ভূত পদার্থ বা 'মস্তিষ্কজাত নয়' বললে তা হবে চূড়ান্ত মূর্খতা।

মনের অস্তিত্বকে বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীরা কখনই অস্বীকার করছেন না। কিন্তু মনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া মানেই অমর আত্মার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া বলে যদি স্বামীজি দু'জন মনে করে থাকেন, তবে তা হবে তাঁদেরই অজ্ঞতার পরিচয়। কারণ, বিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব বলতে একটা কুয়াশার মতো বাষ্পময় কোনও পদার্থকে বোঝে না।

স্বামীজিদের ধারণা মতো আত্মার চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা আছে। অথচ, বিজ্ঞানের সাহায্যে বা সাধারণ যুক্তিতে এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ছাড়া চিন্তা বা মনের অস্তিত্ব অসম্ভব এবং অবাস্তব, কারণ চিন্তা বা মনের উৎপত্তি মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষগুলোর ক্রিয়ারই ফল। এ-শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পোকা-মাকড়, পিঁপড়ে বা আরশোলা, সবার চিন্তা বা মনের ক্ষেত্রেই রয়েছে স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়া। প্রাণীদের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের কাজ সবচেয়ে উন্নত, তাই তার চিন্তা ক্ষমতাও সবচেয়ে বেশি। মস্তিষ্ক-স্নায়ুকোষহীন যে বাষ্পময় আত্মার ধারণা স্বামীজিরা করেছেন সেই আত্মা যুক্তিগতভাবে কখনই চিন্তা করতে সক্ষম হতে পারে না। এই ধরনের ধারণা একান্তই অবৈজ্ঞানিক, অলীক ও যুক্তিহীন।

বিদেহী আত্মা কী ভাবে আবার দেহ ধারণ করে সে বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দ যে 'বৈজ্ঞানিক আলোচনা' করেছেন তা আপনাদের অবগতির জন্য তুলে দিচ্ছি। 'মন' বা 'আত্মা' "আকাশের মধ্যে দিয়ে বায়ুতে প্রবেশ করে, বায়ু থেকে মেঘ, সেখান থেকে বৃষ্টি বিন্দুর সঙ্গে তারা পড়ে ধরণীতে, তারপর কোন খাদ্যের সঙ্গে মানবদেহে প্রবেশ করে আবার তারা জন্ম নেয়।"

(পৃষ্ঠা—৩৮)

তিনি স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন, "পিতামাতা এই দেহ গঠনের সহায়ক মাত্র, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের সাহায্যেই প্রাকৃতিক নিয়মকে রক্ষা করে দেহ গঠনে সমর্থ হয় সূক্ষ্মশরীর। পিতামাতা আত্মাকে সৃষ্টি করেন না। তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যতক্ষণ পর্যন্ত না আত্মা পিতামাতার অভ্যন্তরে আবির্ভূত হয় এবং প্রাণবীজটিকে লালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জন্ম অসম্ভাব্যই থাকে।" (পৃষ্ঠা—৬২)

স্বামী অভেদানন্দের মানুষের জন্ম সম্বন্ধে যে ধারণা তাঁর অন্ধ ভক্ত ও পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন, তা হলো, (১) বিদেহী আত্মা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে এবং খাদ্যের সঙ্গে মানব দেহে প্রবেশ করে (২) এক জোড়া সুস্থ-সবল ও জন্মদানে সক্ষম নারী-পুরুষও তাদের দেহ মিলনের সাহায্যে কখনই কোনও নতুন মানুষের জন্ম দিতে পারে না। নতুন মানুষটি জন্ম নেবে কিনা তা সম্পূর্ণই নির্ভর করে বিদেহী আত্মার ইচ্ছার উপর। বিদেহী আত্মা পুরুষের অভ্যন্তর থেকে নারীর অভ্যন্তরে আবির্ভূত হলে, তবেই সম্ভব এক নতুন মানুষের জন্ম।

ঠিক এই ধরনের বিশ্বাস নিয়েই এককালে ভারতের নারী পুরুষ পরিবার পরিকল্পনার চেষ্টা না করে গাদা গাদা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, এবং আর্থিক চিন্তায় ভাগ্যকে দোষ দিয়ে বলেছেন, "কী করবো, সবই ভগবানের হাত।"

আজকের অধিকাংশ ভারতবাসীই বুঝতে পেরেছেন, "সন্তানের জন্মের পিছনে ভগবানের হাত থাকে না, থাকে নিজেদের সক্ষম সঙ্গম।

বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে মানুষের জন্ম একটা জৈবিক ব্যাপার। একজন নারী ও একজন পুরুষের দৈহিক মিলনে পুরুষের শুক্রকীট নারীর ডিম্বাণুবাহী নালিকার মধ্যে প্রবেশ করে সাঁতার কেটে জরায়ুর মধ্যে ঢুকে ওভামের সঙ্গে মিলিত হলে গর্ভসঞ্চার হয়, অর্থাৎ সৃষ্টি হয় ভ্রূণের। জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণ ধীরে ধীরে লালিত-পালিত হয়ে অবশেষে পৃথিবীর আলো দেখে মানব শিশু রূপে।

ভ্রূণের মধ্যে স্বামীজি কথিত আত্মা কখন ঢোকে? কী ভাবে ঢোকে? আত্মা কী তবে শুক্রকীটের মধ্য দিয়ে নারীর জরায়ুতে সঞ্চারিত হয়? স্বামীজি আত্মার ওজন বলেছেন "প্রায় আর্ধেক আউন্স বা এক আউন্সের তিন ভাগ।

'এক আউন্সের তিনভাগ' কথাটা নিয়ে একটু গোলমালে পড়েছি, 'মরণের পারে' বইটির আগের মুদ্রণগুলোতে 'তিনভাগ' কথাটারই উল্লেখ দেখলাম। স্বামী অভেদানন্দ সম্ভবত এক আউন্সের চারভাগের তিনভাগ বলতে চেয়েছিলেন।

৩/৪ আউন্স বা ১/২ আউন্স ওজনের একটা আত্মা কী শুক্রকীট বা ডিম্বাণুতে থাকতে পারে? একজন সুস্থ সবল পুরুষ সঙ্গমের সময় ১০০ মিলিয়ন থেকে ৪০০ মিলিয়ন পর্যন্ত শুক্রকীট গর্ভস্থানে নিক্ষেপ করে। এক মিলিয়ন হলো দশ লক্ষ। অর্থাৎ, একজন পুরুষ প্রতিবার বীর্যপাতে ১০ কোটি থেকে ৪০ কোটি শুক্রকীট নারী গর্ভে নিক্ষেপ করে। সুতরাং, একটা শুক্রকীটের মধ্যে ৩/৪ আউন্স থেকে ১/২ আউন্স ওজনের আত্মার উপস্থিতি একটা সোনামুখি ছুঁচের ফুটোর মধ্যে দিয়ে একটা হাতি গলে যাওয়ার চেয়েও অবাস্তব কল্পনা।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, "আত্মাকে ঈশ্বর বা অপর কোন দেবতা সৃষ্টি করেন, হিন্দুরা একথা মানেন না। এই আত্মা অজ অর্থাৎ জন্মহীন, নিত্য, শাশ্বত।" (পৃষ্ঠা—১৮)

আমাদের বেদান্তেও আছে, আত্মার জন্ম নেই,' অর্থাৎ চিরকালই রয়েছে। চিরকাল বলতে বোঝানো হচ্ছে সীমাহীন কালকে। অর্থাৎ মানুষের মন বা আত্মা চিরকাল ধরেই বিশ্বে বিরাজ করছে।

৪৭০ কোটি বছর আগে জ্বলন্ত সূর্যের একটি অংশ যখন কোনও শক্তিশালী নক্ষত্রের আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হয় তখন এই সব মানুষের মনগুলো কোথায় ছিল? অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ থেকে প্রাথমিক এককোষী প্রাণী অ্যামিবা সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর জৈব বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এককোষী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র, যাকে স্বামী অভেদানন্দ বলতে চেয়েছেন মন বা আত্মা। ক্রমবিবর্তনের দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতম স্নায়ুবিশিষ্ট মানুষ।

প্রোকারিয়টস নামের জীবাণুবিশেষ প্রাণী সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে প্রাণেরই অস্তিত্ব ছিল না, তখন মন বা আত্মারা সব কোথায় ছিল?

বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে জড় থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়েছিল পৃথিবীর বিশেষ ভৌত অবস্থায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিল সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে। এই প্রাণের পিছনে কোনও মন বা আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাণী সৃষ্টির পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে, বিভিন্ন প্রাণীদের বিবর্তনের পথ ধরে মাত্র ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার বছর আগে মানুষ এলো পৃথিবীর বুকে।

চার্লস ডারউইন

এককোষী থেকে ক্রমবিকাশ
এককোষী প্রাণী বা অ্যামিবা
মাছের পূর্বপুরুষ
উভচর প্রাণী (ব্যাঙ ইত্যাদি)
সরীসৃপ
পাখির পূর্বপুরুষ
ডাইনোসর
স্তন্যপায়ী
জলচর
স্থলচর
খেচর
প্রাইমেট
বন-মানুষ
প্রাচীন-মানুষ
বানর
অস্ত্রালোপিতেক
(১০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছর আগে)
ড্রাইওপিতেক
(১ কোটি থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বছর আগে)
নিয়নডার্থাল
(১ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ বছর আগে)
পিতেকানত্রোপ
(৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ বছর আগে)
উন্নততর মানুষ
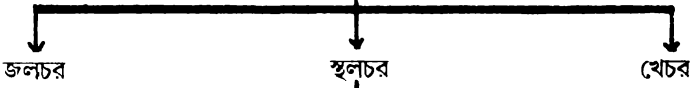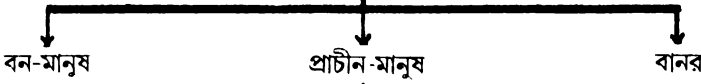
৩০ হাজার বছরেরও আগে মানুষেব আত্মারা কোথায় ছিল ? জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ হয়ে ? কেন আত্মারা কীটপতঙ্গ হলো ? পর্বজন্মেব কোন কর্মফলে এমন হলো ?

পূর্বজন্ম পূর্বজন্ম করে পিছোতে থাকলে যে প্রাণীতে আত্মার প্রথম জন্মটি হয়েছিল, সেটি কবে হয়েছিল ? হলে নিশ্চয়ই এককোষী রূপেই জন্ম হয়েছিল। এককোষী প্রাণীর জন্ম হয়েছিল কোন জন্মেব কর্মফলে ?

না, এব কোনটারই উত্তব পাবেন না, কারণ, উত্তর দেওযার কিছুই নেই।

বিজ্ঞান বলে, পৃথিবী হোক বা অন্য কোনও নক্ষত্রের গ্রহেই হোক, যেখানেই প্রাণী থাকবে সেখানেই এই প্রাণের পিছনে থাকবে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়া, কোনও আত্মা নয়।

স্বামী অভেদানন্দ বা বেদান্ত মানুষের আত্মাকে 'অজ' অর্থাৎ জন্মহীন বললেও আদি বাইবেলে বলা হয়েছে ঈশ্বর পৃথিবীরই উপকরণ দিয়ে তাঁর নিজের অনুকরণে মানুষকে সৃষ্টি করে নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণ সঞ্চার করেন, অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম আত্মার জন্ম নিয়েও বিভিন্ন ধারণা গড়ে তুলেছে।

আত্মা এবং পুনর্জন্ম বিষয়ে সব ধর্মমতই নিজের বিশ্বাসকেই 'একমাত্র সাচ্চা' বলে ছাপ মারতে চায়। আপনি এই বিষয়ে কোন্ ধর্মমতকে বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করবেন ? এবং কেন গ্রহণ করবেন ? আপনি একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী, একমাত্র এই যোগ্যতার গুণেই কী আপনার ধর্মের সব ধারণা আপনার কাছে অভ্রান্ত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে ?

মোট প্রাণী ও মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। হাজার হাজার বছরে এই যে বিশাল প্রাণী সংখ্যার বৃদ্ধি, এর অর্থ কী এই নয় যে আত্মারাও ভাগ হয়ে যাচ্ছে বা বৃদ্ধি পাচ্ছে ?

আত্মা কী নিজেদের ভাগ করতে পারে ? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী অভেদানন্দ বলছেন, "না, তা পারে না।"

(পৃষ্ঠা—১৭৯)

আত্মা না বাড়লে প্রাণী বাড়ছে কী করে ? উত্তর নেই।

স্বামী অভেদানন্দ একটি মারাত্মক বিপজ্জনক কথা বলেছেন, "আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করলে মানুষের শিক্ষাদীক্ষা চরিত্রগঠন প্রভৃতি আর দরকারী বলে অনুভূত হবে না।"

তিনি এমন অদ্ভুত তথ্যটি আবিষ্কার করলেন কীভাবে ? বিশ্বের প্রতিটি বিজ্ঞানমনস্ক বিজ্ঞানী, প্রতিটি যুক্তিবাদী মানুষ আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন। তাঁরা শিক্ষা দীক্ষায় বা চরিত্রগঠনে আত্মা বিশ্বাসীদের চেয়ে পিছিয়ে আছেন ?

ভেজালের কারবারি, চোর, ডাকাত, খুনে,ধর্ষণকারী—এদের উপর সমীক্ষা চালালেই দেখতে পাবেন এদের শতকরা প্রায় ১০০ ভাগই আত্মার অস্তিত্বে এবং হিন্দু হলে পরজন্মেও বিশ্বাস করে। কিন্তু এই ধর্মীয় ধারণা কী তাদের পাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পেরেছে ?

আত্মার অস্তিত্বের স্বীকার বা অস্বীকারের উপর শিক্ষাদীক্ষা বা চরিত্রগঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেই দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজিক কাঠামোর উপর।

স্বামী অভেদানন্দ আরো বলেছেন, "অজ্ঞ শ্রেণীর লোকেরা এখনো বিশ্বাস করে না যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং দেহ ব্যতীত তার অস্তিত্ব থাকতে পারে।" (পৃষ্ঠা—৮০)

স্বামী অভেদানন্দ কী বলতে চান যে, বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ও যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে তাঁর কথাকেই অন্ধ-বিশ্বাসে পরম সত্য বলে মেনে নেওয়াই বিজ্ঞতার লক্ষণ ?

ফিরে আসি পরামনোবিজ্ঞানীদের চোখে জাতিস্মরতায়

পরামনোবিজ্ঞানীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন। পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ দাঁড়িয়ে রয়েছে অন্ধ-বিশ্বাসের উপর। এই বিশ্বাসের সত্য বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন। তাদের এই পুনর্জন্মের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হাজির করা হয়েছে জাতিস্মরতাকে, কারণ, জাতিস্মর পুনর্জন্মের স্মৃতি উদ্ধার করে।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী দাবী করেন, তাঁরা সম্মোহন করে সম্মোহিত ব্যক্তির স্মৃতিকে পিছোতে পিছোতে শূন্য বয়স বা জন্মলগ্ন অতিক্রম করে তার পূর্বজন্মের দিনগুলোতেও নিয়ে যেতে পারেন।

মনোবিজ্ঞান মনে করে কোনও একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মোহন করে তার হারিয়ে যাওয়া শৈশবের কিছু স্মৃতিকে আবার উদ্ধার করা সম্ভব, কারণ, সম্মোহিত ব্যক্তির বেশ কিছু শৈশব স্মৃতি মস্তিষ্ক কোষে সঞ্চিত থাকে, যে-ভাবে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে কম্পিউটারে। কম্পিউটারকে ঠিক মতো চালিয়ে যেমন সঞ্চিত স্মৃতি উদ্ধার করা সম্ভব, ঠিক তেমনি করেই সম্মোহনের সাহায্যে মানুষের অতীতের কিছু সঞ্চিত অথচ চাপা পড়ে থাকা স্মৃতিকে উদ্ধার করা সম্ভব।

মনোবিজ্ঞান সম্মোহনের সাহায্যে অতীত স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিয়েছে বটে কিন্তু পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে কখনই মেনে নেয় নি। পরামনোবিজ্ঞানীদের কথা মতো আত্মার শরীরও নেই মস্তিষ্কও নেই। মস্তিষ্ক না থাকলে মস্তিষ্ক কোষও নেই। মস্তিষ্ক কোষ না থাকলে স্মৃতি জমা থাকবে কোথায় ? এই প্রশ্নের উত্তর পরামনোবিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নি, কারণ, দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। তাই মনোবিজ্ঞান বা বিজ্ঞান কখনই পূর্বজন্মের স্মৃতি উদ্ধারের তত্ত্বকে মেনে নিতে পারে নি।

আত্মার অস্তিত্ব শুধুই বিশ্বাসে, তাই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি, প্রমাণিত হবেও না। আত্মার অস্তিত্বই যখন নেই, তখন আত্মার পুনর্জন্ম আসছে কোথা থেকে ?

ধরা গেল, কোনও ব্যক্তিকে সম্মোহিত করে তার মধ্যে যদি এই ধারণা সঞ্চারিত করা যায় যে, তিনি গতজন্মে রামবাবু ছিলেন। একুশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলেন শ্যামাসুন্দরীকে, থাকতেন শ্যামপুকুরে। দুই ছেলে ও এক মেয়ের নাম ছিল যথাক্রমে হলধর, গুণধর ও লক্ষ্মী। চাকরি করতেন কলকাতা পুলিশে। একবার হাত ভেঙেছিল আর একবার নাক। লক্ষ্মীর জন্মের পর একটা প্রমোশন পেয়েছিলেন একান্ন বছর বয়সে, প্রাণ গিয়েছিল ডাকাতের গুলিতে।

এইবার কিছু সাক্ষী-সাবুদের সামনে লোকটিকে আবার সম্মোহিত করে তার গতজন্মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত রামবাবুর কথাই বলে যাবেন।

অতএব সম্মোহন করতে জানেন এমন কেউ যদি জাতিস্মরতা প্রমাণের জন্য কোনও মৃত ব্যক্তির বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে কোনও সম্মোহিত ব্যক্তির মস্তিষ্কে 'সাজেসন' পাঠিয়ে তথ্যগুলো সঞ্চারিত করেন, তবে পরবর্তীকালে লোকটিকে সম্মোহিত করে সঞ্চারিত তথ্যগুলোই আবার বলিয়ে নিতে পারেন। সুতরাং, এখানে একটা বিরাট ফাঁকির সুযোগ থেকেই যাচ্ছে।

ড়ঃ হেমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আয়ান স্টিভেন্সন জন্মান্তরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করেছেন। ভারতে ও শ্রীলঙ্কায় ১৫ জনের মতো জাতিস্মরের খবর আমরা এঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। এই ১৫ জনের মধ্যে যাকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জাতিস্মর বলে হাজির করা হয়েছিল সে হলো শ্রীলঙ্কার একটি ছ'বছরের মেয়ে—জ্ঞানতিলক। স্টিভেন্সন ও ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েটির জাতিস্মব ক্ষমতা পরীক্ষা কবে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মেয়েটির উপর পরীক্ষা চালানো হয়েছিল ১৯৬০ সালের নভেম্বরে।

পরামনোবিজ্ঞানী দু'জন জানান, জ্ঞানতিলক আগের জন্মে শ্রীলঙ্কাতেই তিলকরত্ন হিসেবে জন্মে ছিল। তিলকরত্ন মারা যায় ১৩ বছর ৯ মাস বযেসে।

তিলকরত্নের মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে তার আত্মা জ্ঞানতিলক নামে জন্মগ্রহণ করে বলে জন্মান্তরবাদীরা দাবী করেছেন।

৬ বছরের মেয়ে জ্ঞানতিলককে গত জন্মেব ৬১টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। ৪৬টি প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়েছিল বলে দাবী করা হয়। জ্ঞানতিলক যে সব প্রশ্নেব সঠিক উত্তব দিয়েছিল সেই সব সঠিক উত্তরের গুটিকয়েক নমুনা আপনাদের সামনে পেশ করছি।

(১) আমার বাবা ছিল।
(২) আমার মা ছিল।
(৩) সমুদ্র দেখেছি।
(৪) সমুদ্রের রঙ সবুজ ও নীল।
(৫) সমুদ্রের ধারে গাছ আছে।
(৬) গাছগুলো নারকেল গাছ।
(৭) সমুদ্রের পাড়ে বালি আছে।
(৮) আমার বোন ছিল।
(৯) ছোটবেলায় বোনকে মেবেছি।
(১০) স্কুলে যেতাম।
(১১) মা ছিলেন ফর্সা।
(১২) পোস্ট অফিসে গিয়েছি।

এমন সব উত্তর জানতে চাওয়ার সার্থকতা কী আমার ঠিক মাথায় ঢুকলো না।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্ঞানতিলক সমুদ্র দেখে নি, অথচ সমুদ্রেব জলের রঙের সঠিক বর্ণনা দিয়েছে, সমুদ্রের পাডে যে নারকোল গাছ থাকে, তাও ও বলতে পেরেছে। সমুদ্রকূলে বালির বর্ণনাও সঠিক দিয়েছে। এই সবই বলতে পেরেছে পূর্বজন্মের তিলকরত্নের সমুদ্র দেখার স্মৃতি উদ্ধার করে।

সমুদ্র না দেখলে কী সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়া যায় না? নিউ ইযর্ক না দেখলেও কী নিউ ইয়র্কের বিরাট উঁচু উঁচু বাড়ির বর্ণনা করা অসম্ভব? রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি না দেখলেও কী তাঁর চেহারা আমাদের অপরিচিত?

একটা চার-পাঁচ বছরের বাচ্চাকে হাতি, বাঘ, ভালুক, ঘোড়া, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, ট্রেন—এই সব নানা ধরনের জিনিসের ছবি দেখিয়ে দেখবেন আপনার বয়স্ক চোখের চেয়েও ওদের চোখ অনেক বেশি ডিটেল্স-এর দিকে নজর রাখে। ছোটদের ছবি আঁকতে তার পছন্দ মতো রঙের মাঝখানে বসিয়ে দিন, দেখবেন, অনেক সময় ওদের ডিটেলসের কাজ আপনাকে অবাক করে দেবে। একটা ছোট-শিশুকে নদী, পাহাড়, সমুদ্রের রঙচঙে ছবি দেখাবার পর তাকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, সে প্রত্যেকটারই সঠিক বর্ণনা দিয়ে দেবে। জ্ঞানতিলক কোনও দিনই কোনও

সমুদ্রের রঙিন ছবি দেখে নি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

জ্ঞানতিলককে যে অনেক কিছু আগে থেকেই শেখানো হয়েছিল এই ধরনের অনুমান করার মতো অনেক কারণ আছে।

পরামনোবিজ্ঞানীদ্বয়ের সেরা জাতিস্মর জ্ঞানতিলক কিন্তু তার জাতিস্মর ক্ষমতা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে পারে নি।

১৯৫৭-এর এপ্রিলে শ্রীলঙ্কার কিছু খবরের কাগজে একটি জাতিস্মরের খবর প্রকাশিত হয়ে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করে। খবরে বলা হয়—ম. তারা কাছেরীর মৃত কেরানী ফ্রান্সিস কোদিতুয়াক্কু তিন বছর আগে জন্ম নিয়েছে কান্দাগোদ.র এক পরিবারে। ফ্রান্সিস মারা যান ১৯৫৩-এর ১৬ এপ্রিল ৫২ বছর বয়সে।

কিছু পরামনোবিজ্ঞানী, গবেষক ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী শিশুটিকে পরীক্ষা করে জানান—ও সত্যিই জাতিস্মর। ফ্রান্সিসের জীবনের খুঁটিনাটি অনেক ঘটনা ও বর্ণনা করেছে, সেই সঙ্গে চিনিয়েও দিয়েছে পূর্বজন্মের স্ত্রী ও দুই ছেলেকে।

শ্রীলঙ্কার র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন শিশুটির জাতিস্মর ক্ষমতা পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলো। ফ্রান্সিসেব বাড়ির সঙ্গে শিশুটি আগেই পরিচিত ছিল। বেশ কয়েকবার ওই বাড়িতে গিয়েছে। ফ্রান্সিসের স্ত্রী ও দুই ছেলেকেও ভালোমত চেনে। অতএব, র‍্যাশন্যালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা একটু অন্যরকম ভাবে পরীক্ষা নিলেন। তাঁরা ফ্রান্সিসের অফিসের সহকর্মীদের একটি গ্রুপ ছবি সংগ্রহ করে হাজির করলেন ছোট ছেলেটির কাছে। ওই ছবির কোনও সহকর্মীকেই চিনতে পারলো না ছেলেটি। ফ্রান্সিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ধর্মদাস। ধর্মদাসের কাছে হাজিব করা হলো ছেলেটিকে। না, এবারও চিনতে পারলো না। ফ্রান্সিসের জীবনের উপব ৭০টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, ৪টি মাত্র প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পেরেছিল ছেলেটি। গোটাটাই যে একটা সাজানো ব্যাপার তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। কাউকে ঠকাবার ইচ্ছা থাকলে একজন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে খুঁটি-নাটি খবর জেনে নিয়ে সেগুলো একটি বালক বা বালিকাকে ভালোমতো শিখিয়ে-পড়িয়ে তার অতীত জীবনের স্মৃতি বলে চালানো মোটেই কঠিন কাজ নয়। আদিম মানুষেব অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল আত্মার, আর শাসক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের শোষণের সুবিধেব জন্য সৃষ্টি হয়েছিল পূর্বজন্মের কর্মফল ও জন্মান্তরবাদ।

আত্মার বস্তুগত অস্তিত্ব থাকলে অবশ্যই তা পর্যবেক্ষণ করা যেত। এর পরেও যুক্তিকে এবং বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে কেউ যদি বলেন, "আমি আত্মার অস্তিত্বে এবং পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি"—তবে বিজ্ঞান বা যুক্তিবাদীদের কিছুই বলার থাকে না, কারণ বিষয়টা যখন একটা অন্ধ-বিশ্বাসেব তখন আব যুক্তি চলে না।

আত্মার শান্তিতে শ্রাদ্ধ

প্রাণীর জীবন্ত শরীরে অসংখ্য জটিল রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে শক্তির সৃষ্টি হয় সেই শক্তিই শরীরের প্রাণ-শক্তি, শরীরকে কর্মচঞ্চল রাখার শক্তি।

মৃত্যু ঘটলে শরীরের বাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়াগুলো বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয় শক্তির সরবরাহ। মৃত্যু পুরোপুরি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। মৃত্যুর পর আত্মাকে ধরে নিয়ে যেতে যমদূতেরা হাজির হয় না। যদিও অনেকের মধ্যেই এই ধারণা রয়েছে যে, যম আত্মার পূর্বজন্মের কর্মফল বিচার করে স্বর্গে বা নরকে পাঠায়। বহু প্রাচীন যুগ থেকে এক ধরনের সুবিধাভোগীরা তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রচার করেছিল—তুমি এই জন্মে ত্যাগ স্বীকার কর, রাজাকে মান্য কর,

পুরোহিতকে শ্রদ্ধা কর—মৃত্যুর পরে তোমার আত্মার স্থান হবে স্বর্গে। এর অন্যথায় পতিত হবে নরকে। নরক ভোগের পরে তোমার আত্মা পৃথিবীতে ফিরে এসে আবার জন্ম নেবে, ভোগ করবে পূর্বজন্মের কর্মফল। কিন্তু, আজ পর্যন্ত কেউই স্বর্গে মৃতের আত্মাকে সুখ ভোগ করতে দেখে নি, দেখে নি আত্মাকে নরকের যন্ত্রণা ভোগ করতে। হাজার হাজার বছর ধরে আত্মা, পূর্বজন্মের কর্মফল,স্বর্গ, নরক এই সব নিয়ে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তা একান্তভাবেই বিশ্বাসের ব্যাপার মাত্র। বাস্তবে স্বর্গ, নরক এবং আত্মা কোনটারই অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি কারণ অস্তিত্ব নেই।

বিভিন্ন ধর্মে মানুষের মৃত্যুর পর তার অস্তিত্বহীন আত্মার তৃপ্তি, মুক্তি, পরলোকযাত্রার পাথেয় দেওয়ার জন্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন ও সংস্কার। বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মৃতদেহকে জ্বালানো হয়, কফিনে শুইয়ে কবর দেওয়া হয়, মৃতদেহকে বসিয়ে কবর দেওয়া হয়, খাল, নদী বা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে সলিল সমাধি দেওয়া হয়, এমন কী মৃতদেহকে গাছে ঝুলিয়েও রাখা হয়।

পরলোকের পাথেয় হিসেবে অনেক সময় মৃতের সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কবর বা সমাধিতে দিয়ে দেওয়া হয়। মিশর, চীন, গ্রীস ও ভারতে কবরের সঙ্গে পাথেয় হিসেবে বহু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও মূল্যবান অলংকার রত্ন প্রভৃতি দেওয়ার প্রচলন বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এবং আছে, মিশরের ফারাও পরিবারের মৃতের সঙ্গে কবর দেওয়া হতো জীবন্ত দাস-দাসীদের। বৈষ্ণবরা মৃতের সমাধির সঙ্গে ভিক্ষের ঝুলিও দিয়ে দেন।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রয়েছে অশৌচ পালনের আচরণবিধি। হিন্দু পরিবারে কেউ মারা গেলে জ্ঞাতি-আত্মীয়দের অশৌচ পালন করার বিধি রয়েছে, এই সময় নিরামিষ খেতে হয়, বাড়িতে পুজো, বিয়ে বা ওই জাতীয় কোনও শুভকাজ করা যায় না, চামড়ার জুতো পরা, চুল-দাড়ি-গোঁফ কাটাও নিষিদ্ধ বলে মানা হয়। এই নিয়ম মানা হয় শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত। ব্রাহ্মণ. ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের বর্ণাশ্রম অনুযায়ী মৃত্যর কতদিন পর শ্রাদ্ধের কাজ কর্ম, আত্মাকে পিণ্ডিদান ইত্যাদি হবে, তা ঠিক করা আছে। মৃতের শ্রাদ্ধের কাজ যে করবে (ছেলে থাকলে অবশ্যই ছেলে) তাকে আরও অনেক নিয়ম-কানুন মানতে হয়। অশৌচ চলাকালীন সেলাইহীন এককাপড়ে থাকতে হয়। নিজে হাতে মাটির মালসায় ভাতে-ভাত রান্না করে খেতে হয়, যাকে বলা হয় হবিষ্যান্ন। জুতো পরা চলবে না। রোদ-বৃষ্টি যাই হোক ছাতা নেওয়া চলবে না। চুল-দাড়ি-গোঁফ ছাঁটা চলবে না। গায়ে মাথায় তেল-দেওয়া বা সাবান দেওয়া অবশ্যই চলবে না। যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ। তারপর তো রয়েছে আত্মার শ্রাদ্ধ-শান্তির নাম করে পুরোহিতকে মৃতব্যক্তির প্রিয় জিনিসপত্র দান, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়-বন্ধুদের ভুরিভোজে আপ্যায়ন ইত্যাদি।

শ্রাদ্ধের কাজ যিনি করবেন তিনি বেচারা তেল, সাবানহীন রুক্ষ চুল ও এক মুখ অপরিচ্ছন্ন গোঁফ-দাড়ি নিয়ে, খালি গায়ে একটা নোংরা কাপড় পরে, খালি পায়ে এবং নিজের রান্না নিজে করে প্রায়শই অফিসের কাজে যোগ দিতে পারেন না। ফলে নষ্ট হয় বেশ কিছু প্রয়োজনীয় শ্রমদিবস। গরীবদের অনেক সময় ভিটে-মাটি বেচে শ্রাদ্ধ-শান্তির খরচ যোগাতে হয়। অস্তিত্বহীন আত্মার নামে এই যে জঘন্য কুসংস্কার ও অর্থহীন খরচ যুগ যুগ ধরে চলে আসছে আজও আমাদের সমাজ কিন্তু তার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না। 'পাছে লোকে কিছু বলে' এই তাড়নায় আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী অনেকেও এই কুসংস্কারের কাছে মাথা নোয়াচ্ছেন। যাঁরা এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়ান তাঁদের বিরুদ্ধে একদল লোক-কুবাক্য প্রয়োগ করতে পারেন বটে, কিন্তু, একই সঙ্গে আর একদল লোকের চোখে শ্রদ্ধার আসনও পাতা হয়ে যায়—কারণ, কথায় ও কাজে যাঁরা এক, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার মতো লোক আজও

বিশ্বের প্রতিটি দেশেই আছেন।

আমার বাবা মারা যান ১৯৫৫-র ২৬ মে। আমিই বাবার একমাত্র ছেলে। আমার বোন—চার। একমাত্র ছেলে হওয়ার সুবাদে হিন্দুধর্মের বিধি মতো বাবার পরলোকগত আত্মার (?) সদগতি ও শান্তির জন্য পারলৌকিক কাজকর্মের পূর্ণ দায়িত্ব আমারই ওপর বর্তানোর কথা।

যেহেতু আত্মার কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই, আত্মা শুধুই অবাস্তব কল্পনা মাত্র, তাই লোকাচার, প্রচলিত সংস্কার ও চক্ষুলজ্জার কাছে নতজানু হবার কোনও ইচ্ছেই আমার ছিল না। বিনিময়ে মর্মান্তিক মূল্য দিতে হবে জেনেও মনে মনে উচ্চারণ করেছিলাম বীরসিংহের দুঃসাহসী বীর সন্তান বিদ্যাসাগরের কথা, "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব , লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

মা, বোন, কিছু আত্মীয় ও কিছু প্রতিবেশীর মতামতকে, কুসংস্কারকে মূল্য না দেওয়ায়, দেখেছি তাঁরা কেমনভাবে আমাকে ত্যাগ করেছেন, দেখেছি কুসংস্কারগ্রস্তদের শত্রুতা কত মিথ্যাচারে নামতে পারে, সেই সঙ্গে দেখেছি সমাজের বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে কেমন ভাবে বর্ষিত হয় সমর্থন, অভিনন্দন ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার অজস্র কুসুম। এতগুলো মানুষের ভালোবাসা, এই তো আমার জীবনের পাথেয়।

প্ল্যানচেট (Planchette) বা প্রেত বৈঠক

যে পদ্ধতির সাহায্যে আত্মাকে আহ্বান করে আনা যায় বলে পরামনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন সেই পদ্ধতিকেই ওঁরা এবং বিদেহী আত্মায় বিশ্বাসীরা বলেন 'প্ল্যানচেট' (Planchette)। আত্মার সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যক্তিকে বলা হয় 'মিডিয়াম' (medium)।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-মনস্ক যুক্তিবাদীরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তাই অস্তিত্বহীন আত্মাকে আনার ব্যাপারে অর্থাৎ প্ল্যানচেটের কার্যকারিতায়ও আদৌ বিশ্বাসী নন।

যে ধর্মবিশ্বাসকে পরামনোবিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন, সেই অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তির বিরোধ কিন্তু যুগে যুগেই আমরা দেখেছি। খ্রীষ্ট-পূর্ব ৩৯৯ অব্দে এথেন্সবাসীরা সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, অপরাধ—ধর্ম-বিরুদ্ধ বৈজ্ঞানিক মতবাদ পোষণ। বাইবেলের কথা যাঁরা অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করেন, তাঁরা কী আজও বিশ্বাস করেন যে সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে? বিজ্ঞান কুসংস্কারকে যতই ভেঙেছে ততই মানুষ একটু একটু করে যুক্তিবাদী হতে শিখেছে। অথচ এক সময় খ্রীষ্ট ধর্মের অন্ধ বিশ্বাসীদের হাতে নির্যাতনের ভয়ে কোপার্নিকস সূর্য ঘিরে গ্রহগুলোর আবর্তনের পক্ষে যুক্তি ও তথ্যে ভরা তাঁর পুস্তক দীর্ঘ বছর প্রকাশ করতে সাহসী হননি। চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে ধর্মবিশ্বাস ভুল এবং চন্দ্রের নিজস্ব কোনও আলো নেই, এই কথা বলাতে অ্যানাক্সোগোরাস'কে নিষ্ঠুর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল ধর্মান্ধদের হাতে। অথচ যত দিন গেছে, যত বিজ্ঞানের আলোতে মানুষ শিক্ষিত হয়েছে, যুক্তিবাদী হয়েছে, ততই পিছু হঠেছে ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাস, আজ বোধহয় খুব অল্প সংখ্যাক মানুষই বিশ্বাস করেন বাসুকি সাপের মাথার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী, অথবা চন্দ্র, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলো বসানো রয়েছে এক একটি স্ফটিকের গোলকের উপর। অথচ এগুলোই বিভিন্ন ধর্মের মত বা বিশ্বাস।

সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা ও যুক্তিবাদের আরো উন্মেষ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কুসংস্কারগুলোর অসারতাও আরও বেশি মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে, যেদিন সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রতিটি ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার প্রবণতা দেখা দেবে ; সেদিন ধর্মমতের চেয়েও বিজ্ঞানের মতই গুরুত্ব পাবে বেশি।

অতি দুঃখের হলেও এটা বাস্তব সত্য যে আজও বহু মানুষ বিদেহী আত্মার অস্তিত্বে, আত্মার অমরত্বে এমন.কী আত্মার পুনর্জন্মেও বিশ্বাস করেন। তাঁরা কিন্তু প্রায় কেউই এই বিষয় যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখেননি, দীর্ঘ যুগ ধরে বহু জনে মেনে নিচ্ছেন, অতএব আমিও মেনে নিচ্ছি, এই মানসিকতায় আত্মার অস্তিত্বকে মেনে নিয়েছেন। 'সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে', অথবা 'সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ', আজকাল শৈশব থেকেই মানুষ ছাপার অক্ষরে পড়ছে, ফলে তার মনে এই বিষয়ে প্রভাব পড়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে। এমনি ভাবে কিন্তু অলৌকিকত্বের অস্তিত্বহীনতার বিরুদ্ধে বা বিদেহী আত্মার ভ্রান্ত-ধারণার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাগুলো প্রায় দেশেই দেওয়া হয় না। বরং অনেক দেশে মনীষীদের জীবনী পড়াবার নামে বা ধর্মীয় গল্প পড়াবার নামে অঙ্কুরেই শিক্ষার বদলে অশিক্ষার বীজ বোনা হয়। শৈশবেই যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক মনের কবর দেওয়া হয়।

অ-বৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন মানসিকতা সৃষ্টির ধারক এই শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের কথা না বলে যখন কোনও রাজনৈতিক নেতা শুধুমাত্র 'বাতকে বাত' কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান জানান তখন তাকেও একজন বুজরুক বলেই আমার মনে হয়।

প্রায় সব রাজনৈতিক নেতারই একই সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কারকে শ্রদ্ধা জানান এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ধর্মীয় অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দেন। যেদিন রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা ও রাজনৈতিক নেতারা কথায় ও কাজে এক হবেন, আন্তরিকতার সঙ্গে দেশ থেকে কুসংস্কার দূর করতে চাইবেন সেদিনই শুরু হবে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রকৃত ব্যাপক সংগ্রাম।

প্ল্যানচেট আর মিডিয়ামের কথায় আবার ফিরে আসি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং প্রধানত ইউরোপ ও আমেরিকায় বিদেহী আত্মা আনার জন্য সাধারণত মিডিয়ামের সাহায্য নেওয়া হয়। এদের অনেকেই পেশাদার মিডিয়াম। মিডিয়ামের উপর বিদেহী আত্মা ভর করে বলে এঁরা দাবী করেন।

মিডিয়াম বনাম জাদুকর

উনিশ শতকের শেষ দিকে প্ল্যানচেট নিয়ে নিউ ইয়র্ক শহর উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্ল্যানচেটের ঢেউ শেষ পর্যন্ত আছড়ে পড়েছিল আদালত কক্ষে।

কাহিনীর নায়িকা সম্ভ্রান্ত শ্রীমতী ডিস-ডেবার একজন অসাধারণ মিডিয়াম, বহু বিখ্যাত আত্মার যোগাযোগ মাধ্যম। প্ল্যানচেটের আসরে রাফায়েল, লিওনার্দো-দ্য -ভিঞ্চি প্রমুখ অনেক বিখ্যাত শিল্পীর আত্মাকেই তিনি শুধু নিয়ে আসেননি, তাঁদের আত্মাকে দিয়ে ছবিও আঁকিয়ে নিয়েছেন। শেক্সপিয়ারের আত্মা তাঁর প্রকাশিত রচনার অংশবিশেষ আবৃত্তি করেছেন। শুনিয়েছেন আত্মার রচিত নতুন কবিতা। নিয়ে এসেছেন অষ্টম-নবম শতাব্দীর দিগ্বিজয়ী সম্রাট শলেমন বা শার্লমেন-এর আত্মাকে। সাদা এক টুকরো কাগজকে চার ভাঁজ করে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের কপালে ছোঁয়াতেই ঘটে গেছে অলৌকিক ঘটনা। সাদা কাগজ খুলতেই দেখা গেছে, আত্মা এসে লিখে রেখে গেছে।সাদা-পাতার রাইটিং-প্যাড প্ল্যানচেট চক্রে রেখে দেখা গেছে পাতার পর পাতা লেখায় ভর্তি করে গেছে আত্মারা।

নিউ ইয়র্কের ধনকুবের আইন-ব্যবসায়ী লুথার মার্শ তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ-এর সমস্ত

সম্পত্তি তাঁর কন্যার বিদেহী আত্মার অনুরোধে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে দানপত্রের দলিল করে অর্পণ করতেই মার্শের নিকট আত্মীয়রা ডিস-ডেবারের বিরুদ্ধে মার্শকে প্রতারণার অভিযোগ আনলেন আদালতে।

ডিস-ডেবার এতে সামান্যতম বিচলিত তো হলেনই না, বরং, এই ঘটনাটিকে প্রচারের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করলেন; স্থানীয় সমস্ত পত্রিকা যখন এমন একটা অসাধারণ পরলোকের সঙ্গে যোগাযোগকারী মিডিয়ামের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ নিয়ে নানা খবরে পাতা ভরিয়ে পাঠক-পাঠিকাদের গোগ্রাসে গেলাতে ব্যস্ত, তখন সাংবাদিকদের কাছে ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন, তিনি এই মামলায় লৌকিক উকিল ছাড়াও দশজন বিখ্যাত আইনজ্ঞ ও রাজনীতিবিশারদের আত্মার পরামর্শ নিচ্ছেন। ডিস-ডেবার ঘোষণা করলেন—তিনি আজ পর্যন্ত আত্মাদের এনে যতগুলো ঘটনা ঘটিয়েছেন, তার প্রতিটিই ঘটিয়েছেন নিজের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দ্বারা। এগুলোর পিছনে কোনও ফাঁকি ছিল না।

আদালতে আরো অনেক ঘটনাই জানা গেল। জানা গেল শ্রীমতী ডিস-ডেবারের প্রথম জীবনে নাম ছিল এডিথা শলেমন। জন্মেছিলেন উনিশ শতকের মাঝামাঝি মার্কিন দেশের কেন্টাকি প্রদেশে। বাবা ছিলেন বেপরোয়া ও ছন্নছাড়া। জীবন যাপনের তাগিদে অনেককে নির্বিবাদে ঠকিয়েছেন।

কুড়ি বছর বয়েসে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কার্লিমোর শহরে এডিথা নিজেকে হাজির করলেন এক লাস্যময়ী রমণী হিসেবে। প্রচার করলেন, তিনি হলেন ব্যাভেরিয়ার রাজা প্রথম লুই-এর অবৈধ কন্যা, তাঁর মা ছিলেন বহুবল্লভা নর্তকী লোলা। অমনি হৈ-হৈ পড়ে গেল, স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে এডিথার সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হলো ফলাও করে।

এডিথা বিয়ে করলেন তরুণ যুবক ডাঃ মেসাণ্টকে। বছর ঘুরলো না, এডিথা বিধবা হলেন। সেই সময় আমেরিকা ও ইউরোপ জুড়ে সম্মোহন বিদ্যার বেশ রমরমা। এডিথা সম্মোহন বিদ্যা শিখে তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন একটু লাস্য ও একটু কূটবুদ্ধি। পসার জমে উঠতে দেরি হলো না। এমনি সময় অভিজাত বংশের শ্রীডিস-ডেবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ডিস-ডেবারকে বিয়ে করে নিজেকেও অভিজাত মহিলা করে তুললেন এডিথা।

এমনি সম্মোহন করতে করতেই একদিন সম্মোহনের আসবে শ্রীমতী ডিস-ডেবারের শরীরে বিদেহী আত্মার আবির্ভাব ঘটলো। সেদিনের আসরে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্কের সেরা ধনী আইনব্যবসায়ী লুথার মার্শ। বিদেহী আত্মা হিসেবে সেদিন হাজির হয়েছিলেন মার্শেরই মৃত পত্নী। কণ্ঠস্বর না মিললেও, বাচনভঙ্গী যথেষ্ট মিলে গেল, সেই সঙ্গে মিলে গেল কথা বলার সময়কার কয়েকটি মুদ্রাদোষ। শ্রীমতী ডিস-ডেবারের 'মিডিয়াম'-খ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো অভিজাত মহলে। নিত্য বসতে লাগলো প্ল্যানচেটের আসর। মোটা অর্থের বিনিময়ে প্রিয়জনদের বিদেহী আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে লাগলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার।

একসময় শ্রীমতী ডিস-ডেবারের আমন্ত্রণে বিখ্যাত শিল্পীদের আত্মারাও হাজির হতে লাগলেন। বিশাল অর্থের বিনিময়ে অতীত দিনের শিল্পীদের বিদেহী আত্মা কয়েক দিনের মধ্যেই এঁকে দিতে লাগলেন ছবি। আরও যে সব বিখ্যাত বিদেহী আত্মারা প্ল্যানচেট-চক্রে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা তো আগেই বলেছি।

গণ্ডগোল পাকালো মার্শের মৃত মেয়ের আত্মা এসে বাবাকে তাঁর ম্যাডিসন অ্যাভেনিউ-এর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে বলায়। মার্শও দানপত্র করে দিলেন, আদালতেও শ্রীমতী ডিস-ডেবারের নামে প্রতারণার অভিযোগ এলো। অভিযোগ যাঁরা আনলেন, তাঁরা বলতে চাইলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবারের গোটা প্ল্যানচেটের ব্যাপারটার মধ্যেই রয়েছে একটা ফাঁকি।

আর, এই ফাঁকি প্রমাণ করতে আদালতে হাজির করা হলো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজকে (Carl Hertz)।

আদালতে একদিকে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী মিডিয়াম ডিস-ডেবার অন্য দিকে বিখ্যাত জাদুকর কার্ল হার্টজ,. সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক ও দর্শকদের ভীড়ে ঠাসা আদালত কক্ষে কার্ল এক টুকরো সাদা কাগজ নিয়ে দেখালেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীমতী ডিস-ডেবার এবং মাননীয় জুরিদের। কাগজটি এবার ডিস-ডেবারের হাতে দিয়ে বললেন ওটা চার ভাঁজ করতে। ডিস-ডেবার আর একবার কাগজটি পরীক্ষা করে চার ভাঁজ করলেন। জাদুকর কার্ল এবার কাগজটি নিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারেরই কায়দায় নিজের কপালে বসিয়ে শ্রীমতী ডিস-ডেবারকে বললেন, "কাগজটা এবার আমার কপালে চেপে ধরে থাকুন।" শ্রীমতী ডিস-ডেবার কপালে কাগজটা চেপে ধরলেও কাগজের একটা কোণ ছিড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলেন ; একসময় জাদুকর কার্ল বললেন, "এবার কাগজটা কপাল থেকে তুলে ভাঁজ খুলুন।"

ভাঁজ খুলতেই চমকে গেলেন শ্রীমতী ডিস-ডেবার, ভিতরে অনেক কিছু লেখা রয়েছে, অবাক হলেন জুরিরা এবং সেই সঙ্গে অবাক হলেন শ্রীমতীর এই খেলা দেখেই এতদিন যাঁরা বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁরাও।

জাদুকর কার্ল এবার একটা রাইটিং-প্যাড দেখালেন, প্যাডের সব পাতাই সাদা। প্যাডটি খবরের কাগজে জড়িয়ে একদিক ধরতে দিলেন এক সাংবাদিককে, আর একদিক ধরলেন নিজে। একটু পরেই খস্‌খস্ করে লেখার আওয়াজ পেলেন সাংবাদিক। আওয়াজ থামতে খবরের কাগজ থেকে প্যাডটা বের করতেই দেখা গেল প্যাডের সবগুলো পৃষ্ঠা লেখায় ভরে গেছে।

বিস্মিত জুরিদের ও দর্শকদের যখন কার্ল বললেন—এই দুটো খেলার কোনটাই আত্মার সাহায্যে ঘটানো হয় নি, ঘটানো হয়েছে কৌশলের সাহায্যে—তখন আদালত কক্ষ বিস্ময়ে হতবাক্।

জাদুকর কার্ল দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে নিজের গোপন কৌশলগুলো ফাঁস না করলেও আপনাদের কৌতূহল মেটাতে আমিই ফাঁস করছি—শ্রীমতী চার ভাঁজ করা সাদা কাগজটা কার্লের হাতে দিতেই কপালে ঠেকাবার মুহূর্তে কার্ল তাঁর হাতে লুকিয়ে রাখা লেখায় ভরা চার ভাঁজ করা একটা কাগজের সঙ্গে পাল্টে নিয়েছিলেন।

রাইটিং-প্যাডও বদলে নিয়েছিলেন ঠিক সময় ও সুযোগ মতো। প্যাডে লেখার খস্‌খস্ আওয়াজ তুলেছিলেন নিজের আঙুলের একটা নখকে ছুঁচলো করে মাঝামাঝি ফেড়ে রেখে।

শ্রীমতী ডিস-ডেবারের জেল হয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল বিখ্যাত আত্মাদের আঁকা ছবিগুলো ছিল জাল।

উনিশ শতকের সেরা মিডিয়ামদ্বয় ও দুই শৌখিন জাদুকর

উনিশ শতকে আত্মার মিডিয়াম হিসেবে যাঁরা সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁরা হলেন আইরা ইরাস্‌টাস ড্যাভেনপোর্ট (Ira Erastus Davenport) এবং উইলিয়াম হেনরি ড্যাভেনপোর্ট (William Henry Davenport)। এঁরা দুই ভাই জন্মেছিলেন যথাক্রমে ১৮৩৯ এবং ১৮৪১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাফেলো শহরে। ১৮৫৫ সালে জন কোল্‌স্ (John Coles) নামে এক প্যারাসাইকোলজিস্ট ও প্ল্যানচেট বিশেষজ্ঞ এই দুই ভাইকে

নিউইয়র্কে নিয়ে আসেন। অতি দ্রুত জন কোলস্-এর সহায়তায় নিউইয়র্ক জয় করলেন ওরা। প্ল্যানচেটের বিভিন্ন আসরে দু-ভাই এমন ভয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করলেন যা সত্যিই অভূতপূর্ব। প্ল্যানচেটের আসরগুলোতে দু-ভাইকে দু-পাশে দুটো চেয়ারের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রাখতেন দর্শকরা। একটা টেবিলের উপর রাখা থাকতো গীটার, ড্রাম, বিউগল, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি। দর্শকরা আত্মাকে আসার সহায়তা করতে আলো নিভিয়ে দিতেই ঘটে যেত অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্যাপার। টেবিলের বাজনাগুলো আপনা থেকেই একে-একে বেজে উঠত। আলো জ্বালতেই দেখা যেত শক্ত করে বাঁধা দু-ভাই বসে রয়েছেন দু-দিকের দুই চেয়ারে। অতএব অসম্ভব এই ঘটনার পিছনে যে ওদের কোনও চতুরতা নেই, সেই বিষয়ে কারোই কোনও সন্দেহ থাকত না। কখনো কখনো অদৃশ্য আত্মারা নেমে এসে টেবিলে টোকা মেরে আওয়াজ করে বিভিন্ন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এই সময়ও দু-ভাই টেবিল থেকে দূরে দুটো চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা থাকতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দু-ভাইয়ের প্ল্যানচেট আরও আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রপূর্ণ হলো। নিউ ইয়র্কের গণ্ডি ছাড়িয়ে ঘুরে বেড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বড় বড় প্রতিটি শহরে। প্রতি শহরেই ওরা হাজির হতেন খাঁটি প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেবে। শহরে পৌঁছেই স্থানীয় সংবাদপত্রগুলো মারফৎ শহরবাসীদের কাছে আবেদন রাখতেন—আপনারা শহরবাসীদের মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি কমিটি করুন, যে কমিটির সদস্যরা আমাদের কাছে থেকে লক্ষ্য রাখবেন যাতে আমরা কোনও কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করতে না পারি।

প্রতিটি শহরেই তৈরি হয়েছে কমিটি এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কমিটিই ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের সত্যিকারের প্ল্যানচেট মিডিয়াম হিসেব স্বীকার করে নিয়েছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিজয় শেষ করে দু-ভাই গেলেন কানাডায়। কানাডার প্রতিটি বড় শহরকেই একই ভাবে মজালেন, তারপর পাড়ি দিলেন ইংলণ্ডে। ১৮৬৪ তে এলেন ইংলণ্ডে। ২২ সেপ্টেম্বর বসলো এক অভূতপূর্ব প্ল্যানচেটের আসর। প্রধান বক্তা হিসেবে হাজির হলেন প্রখ্যাত ধর্মযাজক ডাঃ জে· বি· ফার্গুসন। সেদিনের আসরে আত্মারা এসে অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়ে গেল। ইংলণ্ডের কাগজগুলোতে প্রকাশিত হলো রোমাঞ্চকর ভৌতিক ঘটনার পূর্ণ বিবরণ এবং সেই সঙ্গে ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসনের মতামত—এরা দুজনে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাসম্পন্ন খাঁটি মিডিয়াম, পরলোকগত আত্মাদের নিয়ে আসার ক্ষমতা এদের ঈশ্বরদত্ত।

এমন একটা জব্বর খবরে ইংলণ্ডে হৈ-চৈ পড়ে গেল। এ শহর ও শহর ঘুরে ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা এলেন চেলটেনহ্যাম শহরে। সেখানেও দুই ভাই একই ঘোষণা রাখলেন, শহরবাসীদের মধ্য থেকে একটা কমিটি তৈরি করে তাদের মিডিয়াম ক্ষমতার পরীক্ষা নিতে অনুরোধ করলেন।

শহরবাসীরা যে কমিটি গড়লেন তাতে রাখলেন শহরের দুই শখের জাদুকর জন নেভিল ম্যাস্কেলিন (John Nevil Maskelyne) এবং জর্জ কুক'কে (George Cooke)। দু'জনেই তখন বয়সে যুবক।

শহরের টাউন হলে প্ল্যানচেটের আসর বসলো। হল ভর্তি! মঞ্চের পর্দা উঠতে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন ডাঃ ফার্গুসন। আবেগপ্রবণ গলায় ঘোষণা করলেন, তাঁর ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন উইলিয়াম হেনরি ও আইরা ইর‍্যাস্টাস-এর রয়েছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, যার দ্বারা তারা দু-ভাই মুহূর্তে নিয়ে আসতে পারেন পরলোকের আত্মাদের।

দু'ভাই মঞ্চে আসার আগে হলের প্রতিটি দরজা ও জানালার পর্দা টেনে দেওয়া হলো, যেন বাইরের আলো না আসে। আহ্বান করা হলো শহরবাসীদের পরীক্ষা-কমিটিকে। কয়েকজন পরীক্ষকের সঙ্গে মঞ্চে উঠলেন ম্যাস্কেলিন ও কুক।

মঞ্চে এলেন দু'ভাই। দুজনের পরনেই কালো পোশাক, মঞ্চে নিয়ে আসা হলো আলমারি বা ওয়ার্ডরোবের মতো একটা কাঠের ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ভিতরটায় আলমারির মতো কোনও তাক নেই। তবে দরজা রয়েছে। ক্যাবিনেটের ভিতরে পাতা হলো একটা লম্বা বেঞ্চ। বেঞ্চের দু-প্রান্তে দু'ভাইকে বসিয়ে পরীক্ষকরা তাদের শক্ত করে বেঁধে ফেললেন। বেঞ্চের মাঝখানে, দু-ভাইয়ের থেকে যথেষ্ট দূরে রাখা হলো শিঙা, ঘণ্টা, বেহালা, গীটার ইত্যাদি। ক্যাবিনেটের দরজা ভেজিয়ে দেওয়া হলো। নিভিয়ে দেওয়া হলো স্টেজের আলো, সারা হল জুড়ে অন্ধকার নেমে আসতেই বেজে উঠলো ঘণ্টা, শিঙা, বেহালা ও গীটার। তারপর আওয়াজ পাওয়া গেল ক্যাবিনেটের দরজা খোলার। বাদ্যযন্ত্রগুলো এক এক করে ছিটকে এসে পড়লো স্টেজের ওপরে।

আলো জ্বালতেই দেখা গেল দু-ভাই একইভাবে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় বেঞ্চের দু-কোণে বসে রয়েছেন। ওরা এমনভাবে বাঁধা যে, সামান্য নড়াচড়ারও উপায় নেই। হাতের নাগালের বাইরে রাখা বাদ্যযন্ত্রগুলো তবে বাজালো কে? কেই বা দরজা খুলে ওগুলোকে ছুঁড়ে ফেললো? হলের প্রতিটি দর্শক মুগ্ধ, বিস্মিত, শিহরিত। এমন অসাধারণ খাঁটি আত্মার খেলা অচিন্ত্যনীয়। দুই ভাই সত্যিই অনবদ্য 'মিডিয়াম'।

একটু ভুল বলেছি, বিস্মিত ও শিহরিত হয়েছিলেন দুজন দর্শক ছাড়া আর সব দর্শকই। এই দুজন হলেন শহরের শখের জাদুকর ম্যাস্‌কেলিন ও কুক। ম্যাস্‌কেলিন স্টেজে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, "গোটা ব্যাপারটাই বুজরুকি। দু-ভাই এতক্ষণ আপনাদের যা দেখালেন সেটা কিছু কৌশল ও অভ্যাসের ফল, এর সঙ্গে বিদেহী আত্মার কোনও সম্পর্ক নেই।"

ম্যাস্‌কেলিন-এর ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করলেন শ্রদ্ধেয় ধর্মযাজক ডাঃ ফার্গুসন ও দুই মিডিয়ামের ম্যানেজার। তাঁরা বললেন, "যদি কৌশলেরই ব্যাপার হয়ে থাকে, আপনিও এমনি ঘটিয়ে দেখান না।"

ঠিক কথা। অনেক দর্শকই সমর্থন করলেন কথাগুলোকে।

ম্যাসকেলিন একটুও ঘাবড়ে তো গেলেনই না, বরং দীপ্ত কণ্ঠে আবারও ঘোষণা করলেন, "দেখুন, এই খেলা দেখাতে গেলে কৌশল ছাড়া অনুশীলনেরও প্রয়োজন। আপনাদের কথা দিচ্ছি আজ থেকে তিন মাসের মধ্যে এদের সবগুলো ভৌতিক খেলাই ভূত ছাড়া করে দেখাব।"

ম্যাস্‌কেলিন যদিও তিন মাস সময় নিয়েছিলেন, কিন্তু দু'মাসের ভেতরই চেলটেনহ্যাম শহরবাসীদের সামনে হাজির হলেন ভূতহীন ভূতড়ে খেলা দেখাতে। গোটা শহর প্ল্যাকার্ডে ছেয়ে গেল—ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের চেয়েও অদ্ভুত কাণ্ড অন্ধকারের বদলে আলোতে ঘটিয়ে দেখাবেন এই শহরেরই দুই জাদুকর ম্যাস্‌কেলিন ও কুক।

ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের খেলাগুলো আরও সুন্দর করে পরিবেশন করলেন এই দুই তরুণ জাদুকর। এমন কী দর্শকদের মধ্যে থেকে একজনকে ডেকে এনে ক্যাবিনেটের মধ্যে বসালেন। দর্শকটির চোখ বেঁধে দেওয়া হলো কাপড় দিয়ে আর হাত দুটি বেঁধে দেওয়া হলো দু'পাশে বসে থাকা ম্যাস্‌কেলিন ও কুকের উরুর সঙ্গে। জাদুকর দুজন অবশ্য আগের মতোই আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা ছিলেন। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই শুরু হয়ে গেল বাজনা বাজা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা আপনা থেকেই গেল খুলে। দেখা গেল উৎসাহী দর্শকটি ও জাদুকর দুজন আগের মতোই বাঁধা রয়েছেন।

এই অদ্ভুত খেলা দেখিয়েই তাদের খেলা শেষ করলেন না দুই জাদুকর। আগের বাঁধনের উপর আবার নতুন করে দড়ি বেঁধে গালা দিয়ে শীলমোহর করে দিলেন দর্শকরা। দুই জাদুকরের

চার হাতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো শুকনো ময়দা। এবার আপাতগ্রাহ্য কোনও কৌশল করার সুযোগ রইল না দু'জনের। কিন্তু কী আশ্চর্য! ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ হতেই ক্যাবিনেটে রাখা বাজনাগুলো বাজতে শুরু করলো। বাজনা থামতেই দরজা খুলে দেখা গেল দুই জাদুকর আগের মতোই বসে আছেন। বাঁধনের শীলমোহর অটুট। চার হাতে চাপানো ময়দার একটুও তলায় পড়ে নেই।

ঐ অবস্থাতেই জাদুকরদের কথা মতো ক্যাবিনটের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটু পরেই জাদুকর দু'জন বন্ধনমুক্ত অবস্থায় ক্যাবিনেটের বাইরে বেরিয়ে এলেন। চার হাতের ময়দা ঠিক তেমনই হাতেই রয়েছে।

সম্পূর্ণ হতভম্ব দর্শকদের সামনে আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। এবার স্টেজে আনা হলো একটা কাঠের বাক্স। স্টেজে এসে দর্শকরা বাক্সটাকে ভালো মতো পরীক্ষা করলেন। বাক্সটার ভিতরে ঢুকে কোনোমতে হাত-পা গুটিয়ে বসলেন ম্যাস্‌কেলিন। ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে দেওয়া হলো। তালাবন্ধ বাক্সটি দড়ি দিয়ে বেঁধে শীলমোহর করে দেওয়া হলো। শীলমোহর করা বাক্সটি ঢুকিয়ে দেওয়া হলো ক্যাবিনেটের মধ্যে। ক্যাবিনেটের দরজা বন্ধ করতেই বেজে উঠলো ভিতরে রাখা ঘণ্টা। এক সময় ক্যাবিনেটের দরজা গেল খুলে। দেখা গেল, ম্যাসকেলিন বসে রয়েছেন বাক্সের বাইরে। ম্যাস্‌কেলিনের অনুরোধে দর্শকরা এসে বাক্সটা পরীক্ষা করলেন। ডালার তালা তেমনই বন্ধ রয়েছে, অটুট রয়েছে বাঁধন আর শীলমোহর।

রাতের আঁধারে যে খেলা দেখিয়ে ছিলেন ড্যাভেনপোর্ট ভাইয়েরা, তার চেয়েও অনেক বেশি গা-ছম-ছম, লোম খাড়া করা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটিয়ে একদিনে শহরবাসীদের বিস্ময়-পাগল করে ফেললেন দুই শৌখিন জাদুকর।

পরবর্তীকালে এই দুই জাদুকর বিভিন্ন শহরে ঘুরে তাঁদের অদ্ভুত জাদুর খেলাগুলো দেখিয়েছেন। তবে প্রতিটি প্রদর্শনীর আগেই দর্শকদের সামনে বিনীতভাবে নিবেদন করেছেন—বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আত্মার মিডিয়াম সেজে ঠক্‌বাজেরা যে সব বুজরুকির আশ্রয় নিচ্ছেন ও লোক ঠকাবার খেলা দেখাচ্ছেন, সেগুলোই এখন আপনাদের সামনে কোনও ভূতের সাহায্য ছাড়াই করে দেখাচ্ছি।

অলৌকিক বিশ্বাসে কোনও কিছু দেখার যে রোমাঞ্চ ড্যাভেনপোর্ট ভাইদের 'অলৌকিক' প্রদর্শনীতে ছিল, ম্যাস্‌কেলিন ও কুকদের খেলায় তা ছিল না। এই দুজন তো বলেই দিচ্ছেন, তাঁরা মিডিয়াম নন, লৌকিক কৌশলের সাহায্যে খেলাগুলো দেখাচ্ছেন। কৌশলগুলো ধরতে না পারলেও পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা, অতএব অলৌকিক মিডিয়ামদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দুই জাদুকরকে বছর দুয়েকের মধ্যেই পিছু হঠতে হলো। মিডিয়ামদের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা দেখতে ভীড় বাড়তে লাগলেও দুই জাদুকরের ভূতহীন ভূতুড়ে খেলায় দর্শক কমতে লাগলো।

বুজরুকির বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম তাদের প্রচণ্ড বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ছিল। একটুর জন্য বেঁচে গিয়েছিলেন এই দুই জাদুকর ও ম্যাস্‌কেলিনের নবপরিণীতা বধূ।

লণ্ডনের বিখ্যাত 'কৃষ্টাল প্যালেস' থিয়েটারে কয়েক সপ্তাহব্যাপী জাদুর খেলা দেখাবার চুক্তিতে সই করলেন ম্যাস্‌কেলিন। কৃষ্টাল প্যালেসে প্রদর্শনীর আগে একটা মফঃস্বল শহরে জাদু প্রদর্শনী চলছিল। সেই শহরের গীর্জার পাদ্রী ওদের জাদুর খেলা দেখে ঘোষণা করলেন—ওরা শয়তান। মানুষ কখনও এমন অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে না।

খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। দু'দিন পরেই জাদু প্রদর্শনী শুরু হবার মুখে আক্রান্ত হলো থিয়েটার হল। বিশাল ক্ষিপ্ত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে ওই পাদ্রী সাহেবও হাজির ছিলেন দুই শয়তান নিধন করতে। সেদিন থিয়েটার হলের ম্যানেজার দুই জাদুকর ও নববধূকে ছদ্মবেশে পিছনের

দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন বলেই বিশ্ব পেয়েছিল দুই মহান জাদুকরকে, বিশেষত : ম্যাস্কেলিনকে, পৃথিবীর জাদুচর্চার ইতিহাসে যার অসামান্য অবদান আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

প্ল্যানচেটের উপর আঘাত হেনেছিল যে বই

ভৌতিক-চক্রের পেশাদার মিডিয়ামরা সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল ১৮৫১ সালে মিডিয়ামদের তাবৎ কৌশলের উপর একটি বই প্রকাশিত হওয়ায়। বিশ্বের ভৌতিক-চক্রের মিডিয়ামদের ইতিহাসে এত বড় আঘাত আর সম্ভবত হয় নি। লেখক হিসেবে কোনও নামের পরিবর্তে ছদ্মনাম ব্যবহৃত হয়েছিল—'জনৈক মিডিয়াম প্রণীত'। বইটির নাম—Revelations of a Spirit Medium, or Spiritualistic Mysteries Exposed—A Detailed Explanation of the Methods used by Fraudulent Mediums—by a Medium।

বইটির নাম বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়াবে—"এক ভৌতিক মিডিয়ামের গোপন রহস্য উদঘাটন, অথবা ভৌতিক রহস্য ফাঁস—প্রতারক মিডিয়ামদের ব্যবহৃত কৌশলগুলোর বিস্তৃত ব্যাখ্যা।—জনৈক মিডিয়ামের লেখা।"

বইটিতে ভৌতিক মিডিয়ামদের সমস্ত রকম আত্মা আনার কৌশল নিয়েই আলোচনা করা হয়েছিল এবং অবশ্যই তার সঙ্গে ছিল প্রতিটি কৌশলেরই ব্যাখ্যা। বিদেহী আত্মা নামিয়ে বোর্ডে, স্লেটে বা কাগজে লেখানো, বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর পাওয়া, টেবিলের উপর টোকা মেরে আওয়াজ করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, টেবিল, চেয়ার বা অন্য কোনও কিছুকে শূন্যে তুলে দেওয়া, দূর থেকে ভেসে আসা আত্মার কণ্ঠস্বর ইত্যাদি মিডিয়ামদের ভৌতিক (?) কাণ্ড-কারখানা গুপ্ত কৌশলের সঙ্গে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল কী করে যে কোনও রকম বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নানা রকম বাজনা বাজিয়ে আবার বাঁধনের ভিতর ফিরে যেতে হয়।

বইটি প্রকাশিত হতেই পেশাদার লোক-ঠকানো মিডিয়ামদের মাথায় বাজ ভেঙে পড়লো। তারা উদ্ধারের উপায় হিসেবে বিভিন্ন বইয়ের দোকান থেকে ও প্রকাশকের কাছ থেকে যতগুলো বই পেল সব কিনে পুড়িয়ে ফেললো। তবে, এই বই যেমন একদিকে পেশাদার মিডিয়ামদের আঘাত হেনেছিল, তেমনি, অন্যদিকে বইটি পড়ে কিছু কিছু লোক নিজেরাই মিডিয়াম বনে লোক ঠকানোর ব্যবসায় নেমে গিয়েছিল।

মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মনীষা হ্যারি হুডিনি এককালে সফল মিডিয়াম ছিলেন

ধোঁকাবাজ মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী এক চরিত্র বিশ্বের সর্বকালের এক সেরা জাদুকর হ্যারি হুডিনিও (Harry Houdini) কিন্তু এক সময় ওই বইটি পড়ে বন্ধনমুক্তি এবং আত্মা আনার নানারকম কৌশল রপ্ত করে তাঁর স্ত্রী বিয়াত্রিস-এর সহযোগিতায় দারুণ মিডিয়ামের ব্যবসা ফেঁদেছিলেন। পরবর্তী জীবনে হুডিনি অবশ্য মৃতের আত্মীয়দের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে মৃত আত্মার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার নাম করে অর্থ লুটবার এই চেষ্টাকে অতি ঘৃণ্য বলে মনে করেন এবং অতি লাভজনক এই খেলা তিনি যে শুধু দেখানোই বন্ধ রেখেছিলেন তাই নয়, মিডিয়ামদের বুজরুকির বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণাই করেছিলেন, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি জয়যুক্ত হয়েছিলেন।

আঠারো বছর বয়েসে হুডিনির বাবা মারা গেলেন। সংসারের দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁরই ঘাড়ে। হুডিনি তখন সদ্য মিডিয়াম রহস্যের বইটি পড়েছেন। ছোট ভাই থিয়োডোরকে নিয়ে

জাদু দেখিয়ে রোজগারে নেমে পড়লেন। জাদু কোম্পানির নাম দিলেন 'হুডিনি ব্রাদার্স'। জাদুর খেলা হিসেবে হাজির করতে লাগলেন বন্ধনমুক্তির খেলা। ছোট ভাইয়ের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা বাক্সের ভিতর ঢুকিয়ে বাক্সটা তালা বন্ধ করে দেওয়া হতো। হ্যারি হুডিনি বাক্সটার সামনে একটা পর্দা টেনে দিয়ে মুখটুকু শুধু পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে রেখে গুনতেন "এক—দুই—তিন—" মুহূর্তের জন্যে মুখটাকে নিয়ে যেতেন পর্দার আড়ালে, পরমুহূর্তে পর্দার ফাঁক দিয়ে যে মাথাটা বেরিয়ে আসতো সেটা থিয়োডোরের মাথা। থিয়োডোর ঝটতি পর্দা সরিয়ে ফেলতেন। কিন্তু হ্যারি হুডিনি তো কোথাও নেই! দর্শকরা এসে বাক্সের তালা খুলতেই দেখতে পেতেন বাক্সের ভিতর দড়ি বাঁধা জোড়া হাতদুটি নিয়ে শুয়ে রয়েছেন হ্যারি।

উনিশ বছর বয়েসে হ্যারি বিয়ে করলেন বিয়াট্রিস রাহণার'কে। বিয়াট্রিসদের স্কুলে ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে দু'জনের আলাপ। সেই আলাপই গাঢ়তর হয়ে বিয়েতে পরিণত হলো। বিয়াট্রিস রাহনার হলেন 'বেসি হুডিনি'।

এবার নতুন জুটি তৈরি হলো—হ্যারি ও বেসি। পেট-চালাবার তাগিদে হ্যারি ও বেসি পানশালাগুলোতে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জাদুর খেলা দেখিয়ে খদ্দেবদের মনোরঞ্জন করতেন। পরে হুডিনি দম্পতি সার্কাসে যোগ দিলেন। সার্কাসে খেলা দেখাতে বেশি দিন ভালো লাগলো না। এই সময় মাথায় এলো নতুন ফন্দি, বিদেহী আত্মার ভর হওয়া মিডিয়াম হলে কেমন হয়? হ্যারি ও বেসি দুজনেরই স্মরণশক্তি ও বুদ্ধি ছিল প্রখর, অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ছোট ছোট শহর ও শহরতলিতে এবার হুডিনি দম্পতি হাজির হলেন 'সাইকিক' বা অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী এবং আত্মার মিডিয়াম হিসেবে।

হ্যারি আগে থেকেই সেই সেই শহরের সমাধিক্ষেত্র ঘুরে সমাধিস্তম্ভের লেখাগুলো পড়ে শহরের মৃত লোকদের সম্বন্ধে খবর যোগাড় করতেন. সেই সঙ্গে ক্যানভাসার সেজে পানশালা, বিভিন্ন আড্ডা ও বাড়ি বাড়ি ঘুরে সংগ্রহ করতেন আরও নানা রকমের খবর। অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে স্থানীয় লোকদেরও নিয়োগ করতেন। এরা বিভিন্ন পরিবারের নানা খবর যোগাড় করে দিত,সেই সঙ্গে প্রচার করে বেড়াত, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে হুডিনি দম্পতির কী কী অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আবার বাঁধনের মধ্যে ফিরে যাওয়ার নানা পদ্ধতির প্রয়োগে হ্যারি ও বেসি আগেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অতএব আত্মায় ভর হওয়া মিডিয়াম হিসেবে বেসি যখন শহরে আগন্তুক হয়েও বিভিন্ন পরিবারের অনেক গোপন খবর বলে যেতেন, অথবা শহরের বিভিন্ন মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা রকম তথ্য হাজির করতেন তখন প্রত্যেকেই এগুলোকে বিদেহী আত্মার কাজ বলেই বিশ্বাস করতেন। এরই সঙ্গে হ্যারি যখন চেয়ারের সঙ্গে হাত পা বাঁধা অবস্থাতেও নানা রকম ভৌতিক কাণ্ড ঘটিয়ে দেখাতেন তখন বিস্মিত, শিহরিত ও ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো তাঁদের লোকান্তরিত প্রিয়জনদের আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এঁদের কৃপাপ্রার্থী হতেন। অর্থের বিনিময়ে কৃপা করতেন হুডিনি দম্পতি। পরবর্তীকালে হুডিনি দম্পতি এই লোক-ঠকানো মিডিয়ামের অভিনয় ছেড়ে দিয়ে পেশাদার মিডিয়ামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছিলেন, তা তো আগেই বলেছি।

বন্ধনমুক্তির খেলায় নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করে হ্যারি হুডিনি এমন সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছেন যে, ঘটনাগুলোর পিছনে লৌকিক কৌশল আছে জানা সত্ত্বেও দর্শকদের বিস্ময়ের সীমা থাকত না।

দুটি ঘটনার উল্লেখ করে হ্যারি হুডিনির বন্ধনমুক্তির কৌশলগত ক্ষমতার পরিচয় রাখছি। সেই সঙ্গে এও বলে রাখি, হ্যারি কিন্তু তাঁর জীবনে এই ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলা দু-বার মাত্র

দেখাননি, দেখিয়েছেন বহুবার, বহু বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে।

১৯০০ সালের কথা। সে-সময় লণ্ডনের 'আলহামরা' থিয়েটার হল যে কোনও শিল্পীর কাছেই মক্কা-মদিনা-কাশী-জেরুজালেম। আলহামরা থিয়েটার হলের কর্মকর্তা ডাণ্ডাস স্লেটার-এর সঙ্গে দেখা করলেন হ্যারি, দু-সপ্তাহের জন্য ওই হলে জাদু দেখাবার সুযোগ চাইলেন। স্লেটার বললেন, "তোমার ওই বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসার খেলাগুলোর যা বর্ণনা দিলে, তার ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। তুমি যদি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়া থেকে নিজের হাত-দুটো মুক্ত করতে পারো, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে দু-সপ্তাহের জন্য হল ছেড়ে দেব।"

স্লেটারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন হ্যারি। দু-জনে গেলেন স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মেলভিন-এর কাছে। স্লেটারের মতো নামী-দামী লোককে আসতে দেখে এবং আসার কারণ শুনে মেলভিন হ্যারি হুডিনিকে বললেন, "আমার হাতকড়ার মুখোমুখি হয়ে তুমি বড়ই ভুল করেছ, এ তোমার জাদু দেখাবার হাতকড়া নয়, তাছাড়া চাবিটা থাকবে আমার কাছে।"

হ্যারি হাসলেন। বললেন, "দেখাই যাক না, এতেও জাদু দেখাতে পারি কিনা!"

মেলভিন এবার হ্যারির দুটো হাত একটা থামের দুপাশ দিয়ে নিয়ে এসে হাতকড়া আটকে দিয়ে স্লেটারকে বললেন, "ও এখানে থাক, চলুন আমরা বরং একটু ঘুরে আসি। ফিরে এসে ওকে মুক্ত করা যাবে।"

মেলভিন ও স্লেটার কয়েক পা এগুতেই দেখলেন তাঁদের পাশে এসে হাজির হয়েছেন হ্যারি হুডিনি।

এর পরে কী হয়েছিল নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে? ফল হয়েছিল এই, হ্যারি একদিকে যেমন 'আলহামরা' হলে দু-সপ্তাহের জন্য জাদু দেখাবার সুযোগ পেলেন আর একদিকে তেমনি পেলেন অসামান্য প্রচার—স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের হাতকড়াও হার মেনেছে মার্কিন মুলুকের তরুণ জাদুকর হ্যারি হুডিনির কাছে। ঘটনাটা আরও একটু গড়িয়ে ছিল। দু-সপ্তাহের বদলে জনতার দাবীতে একনাগাড়ে ছ'মাস আলহামরাতেই খেলা দেখাতে বাধ্য হলেন হুডিনি দম্পতি।

১৮৯৮ সালে শিকাগো শহরের পুলিশ বিভাগকে চ্যালেঞ্জ জানালেন হ্যারি হুডিনি—"আমাকে বন্ধ রাখার মতো কয়েদখানা শিকাগো শহরে তৈরি হয় নি।"

খবরটা পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হতেই শিকাগো পুলিশ গ্রহণ করলো সেই চ্যালেঞ্জ। একগাদা সাংবাদিকের সামনে হ্যারি হুডিনির শরীর পোশাক তন্ন-তন্ন করে খানাতল্লাসি করে হাত-পা বেঁধে পুরে দেওয়া হলো জেলের সেরা সেলটিতে।

ওই অবস্থাতেই জেলের সেল ভেদ করে বেরিয়ে এলেন হুডিনি।

পেশাদার মিডিয়ামদের লোক ঠকানোর মূল কৌশল হলো অন্ধকার বা চোখের আড়ালের সুযোগ নিয়ে দর্শকদের বাঁধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে দ্রুত কিছু ভৌতিক ঘটনা ঘটানো ও আবার আগের বাঁধনের মধ্যে ফিরে আসা।

স্বামী অভেদানন্দ ও প্রেত-বৈঠক

একটা প্ল্যানচেটের আসরে বা প্রেত-বৈঠকের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। প্রেত-বৈঠকটি বসেছিল 'পাশ্চাত্যে'র একটি দেশে, দেশটির নাম উল্লেখ করেন নি স্বামী অভেদানন্দ। সেখানে তিনি অনুভব করেছেন, "অন্তত প্রেতাত্মাদের কুড়িটা হাত আমার পিঠের ওপর, অর্থাৎ কুড়িটা বিদেহীর হাত আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করছে। কেউ কেউ আমার জামার কলার কিম্বা পকেট ধরে টানছে, অথবা একই সঙ্গে অনেকগুলো হাত আমার পিঠে দিয়েছে। এ'সব আমি স্পষ্টভাবে অনুভব করেছি। তারপর একজন আত্মা হয়তো আমায়

জিজ্ঞাসা করলো : 'আপনি কি মনে করেন যে মিডিয়ামই এই সব ব্যাপার করছে ? প্রেত-বৈঠকের ঘরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা ছিল, যদিও ঘরের কোণে কাঠের বাক্সে ঢাকা একটা আলো মিটমিট ক'রে জ্বলছিল। আবার সেই একই গলার শব্দ এলো : 'আপনি মিডিয়ামের গায়ে হাত দিন তো।' আমি হাত দেবার আগেই দেখি প্রেতাত্মা আমার হাতটা ধরে মিডিয়ামের গায়ে স্পর্শ করালো। আমি স্পর্শ করে দেখলাম মিডিয়ামের সমস্ত দেহটা একেবারে শক্ত মড়ার মতো অর্ধশায়িত অবস্থায় রয়েছে। তার হাত দুটো শক্ত করে ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল।" ('মরণের পারে' পৃষ্ঠা—১৩৯-১৪০)

'ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা' একটা ঘরে একগাদা প্রেত-বিশ্বাসী মানুষ নিজেরাই প্রেতের অভিনয় করলে স্বামী অভেদানন্দের মতো প্রেতলোকে বিশ্বাসী যে এগুলোকে প্রেতদেরই কাজ বলে ধরে নেবেন এতে আর আশ্চর্য কী?

একজন হাত বেঁধে রাখা লোকই যখন বহু নিরপেক্ষ লোককে কৌশলের সাহায্যে ধোঁকা দিতে পারেন, তখন, বহুজনে মিলে একজনকে ধোঁকা দেওয়াটা কোনও সমস্যাই নয়।

বন্ধনমুক্তির খেলায় ভারতীয় জাদুকর

ভারতের দুই বিখ্যাত জাদুকর গণপতি (চক্রবর্তী) এবং রাজা বোসও বিভিন্ন ধরনের বন্ধনমুক্তির খেলায় ছিলেন প্রবাদপুরুষ। ১৯৩১ সালে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত এক জাদু-সম্মেলনে বন্ধনমুক্তির খেলা দেখিয়ে এই দুই জাদুকর দর্শকদের বিস্মিত, বিমূঢ় করেছিলেন।

অনুষ্ঠানে গণপতি হাজির করলেন একটি কাঠের বাক্স ও একটি তালা। বাক্স ও তালাটি পরীক্ষা করে যখন দর্শকরা নিশ্চিত হলেন যে এই দুটির কোনটিতেই কোনও কৌশল নেই, তখন গণপতিকে বাক্সে ঢুকিয়ে ডালায় তালা বন্ধ করে বাক্সটাকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তারপর বাক্সটা ঢেকে দেওয়া হয়েছিল একটা চাদর দিয়ে, অথচ গণপতি অতি দ্রুত বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে চাদর ঠেলে, দর্শকদের সামনে হাজির হয়ে আবার ঢুকে গিয়েছিলেন বাক্সে। দড়ি-দড়া আর তালা খুলতে দেখা গেল গণপতি রয়েছেন বাক্সেরই ভিতরে।

সেদিন রাজা বোস যা দেখিয়েছিলেন তা আরও বিস্ময়কর। স্টেজে হাজির করা হলো একটা পিপে। পিপের উপরে ছিল একটা ডালা। সঙ্গে হাজির করা হয়েছিল একটা তালাও। পিপে আর তালা পরীক্ষা করতে অনুরোধ করা হলো দর্শকদের। দর্শকরা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর জাদুকর রাজা বোস তাঁর এক সহকারীকে পিপেতে ঢুকিয়ে দিলেন। দর্শকরা ডালা বন্ধ করে তালা এঁটে চাবি-নিজেদের কাছেই রাখলেন। রাজা বোস এবার ডালার উপর উঠে বসে একটা চাদর দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিয়েই মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে চাদরটা ফেলে দিলেন। কী আশ্চর্য ? এ তো রাজা বোস নন, এ যে পিপের ভিতরে বন্ধ করে রাখা সেই লোকটি ! রাজা বোস তবে কোথায় ? পিপের তালা খুললেন দর্শকরা। সেখানে অপেক্ষা করছিল আরো কিছু বিস্ময়। রাজা বোস বসে রয়েছেন পিপের মধ্যে !

বিশ্বখ্যাত জাদুকর পি·সি· সরকারের হাত-পা রেললাইনের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছিল। ট্রেন তাঁর শরীরের উপর দিয়ে চলে যাওয়ার মুহূর্তে তিনি নিজেকে লোহার শিকলের বাঁধন থেকে মুক্ত করেছিলেন। ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৩১-৩২ সালে চীনে, ট্রেনটা ছিল সাংহাই এক্সপ্রেস।

এ-যুগের অনেক জাদুকরই এখন নানা ধরনের বন্ধনমুক্তি বা 'escape' এর খেলা দেখিয়ে থাকেন। এই আনন্দ দেওয়ার কৌশলগুলোই অসৎ লোকদের হাতে যুগ যুগ ধরে লোক ঠকাবার

হ্যারি হুডিনি

কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং যতদিন মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত-বিশ্বাস ও অন্ধ-বিশ্বাস থাকবে, ততদিন এই লোক-ঠকানোর ব্যবসাও চলতেই থাকবে।

হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে বস্তা-বন্দী ও তারপর বাক্স-বন্দী করার পর মুহূর্তে নিজেকে মুক্ত করার খেলা অনেক জাদুকরই অতীতে দেখিয়েছেন এবং বর্তমানেও দেখিয়ে থাকেন। হাতে হাতকড়ি পরিয়ে বস্তা-বন্দী করে বস্তার মুখ বেঁধে তারপর বাক্সে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দিতে দর্শকদের লাগে সাধারণত পাঁচ থেকে দশ মিনিট। অথচ ব'ক্সটা তিরিশ সেকেণ্ডের মতন অস্বচ্ছ মশারিতে বা চাদরে আড়াল করলেই জাদুকর সমস্ত বাঁধন থেকে মুক্ত হয়ে মশারি বা চাদর ঠেলে মুখ বের করেন। বিস্ময়কর এই ঘটনা দেখার পর দর্শকরা অনেক সময় জাদুকরকে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বা পিশাচ-সিদ্ধ বলে মনে করেন। এমনই এক ধারণা প্রবলতর হয়েছিল জাদুকর গণপতি চক্রবর্তীকে ঘিরে। এই ধরণের বন্ধন মুক্তির খেলা অসাধারণ নৈপুণ্যে দেখিয়ে বহু জাদুকরই দর্শকদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অদ্ভুত সব যুক্তিহীন ধারনা। কেউবা মনে করেন—ব্যাপারটা পুরোপুরি গণ-সম্মোহন, আবার কেউবা ভাবেন—ওদের একটা অলৌকিক ক্ষমতা নিশ্চয়ই আছে।

বাস্তবে এই ধরণের প্রতিটি বন্ধন মুক্তিই ঘটান হয়ে থাকে নেহাৎই লৌকিক কৌশলের সাহায্যে।

দর্শকদের একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে হাতকড়ি বা পায়ের বেড়ি খোলার চাবি ব্যাঙ্ক-লকারের মতনই আর দ্বিতীয় হয় না। না, তা নয়। সব হাতকড়ি আর পায়ের বেড়ির চাবি একই। দু'জোড়া কিনলেই হাতে চলে আসে একটা অতিরিক্ত চাবি। এই অতিরিক্ত চাবিই জাদুকর নিজের হাতকড়ি খুলতে কাজে লাগান।

যে বস্তায় বন্ধ করা হয়, সেই বস্তার তলায় এমন ধরনের সেলাই দেওয়া থাকে যাতে বস্তা-বন্দী জাদুকর বস্তার ভিতরে হাত বুলালেই সেলাই শেষের বাড়তি একটা গ্রন্থি তাড়াতাড়ি খুঁজে পান। গ্রন্থির সুতোটা টানলে বস্তার তলার সেলাই চট্‌পট্‌ খুলে যায়।

জাদুকরের পোশাকের আড়ালে থাকে একটি মুখ বাঁধা বস্তা। সেলাই খোলা বস্তাটি পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে নিয়ে বাক্সে ফেলে রাখেন মুখ বাঁধা বস্তাটা।

এবার বাকী শুধু কাঠের সিন্ধুক থেকে বেরিয়ে আসা। এতটা শোনার পর বুদ্ধিমান পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বাক্সে কোনও একটা গোপন দরজা থাকে, তবে সাধারণ চোখে এই দরজার অস্তিত্ব বোঝা বা খোলা সম্ভব হয় না।

দেখলেন তো, এতক্ষণ বিখ্যাত সব জাদুকরদের যে সব খেলাগুলোর কথা শুনে বিস্মিত হয়ে ভাবছিলেন, সত্যিই কী এগুলো লৌকিক কৌশলে করা সম্ভব ? সেগুলোরই মূল কৌশলটা কত সোজা। এই কৌশলই একটু অদল-বদল করে বিভিন্ন জাদুকররা বন্ধন মুক্তির খেলা দেখান, আর ঠকবাজেরা লোক ঠকায়।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চা

আমাকে মাঝে-মধ্যে বহু পরিচিতজনের কাছেই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন লেখায় উল্লেখ পাই, তিনি প্ল্যানচেটের সাহায্যে তাঁর প্রিয়জনের বিদেহী আত্মাদের নিয়ে এসেছিলেন, বিদেহী আত্মারা লিখিত উত্তরও রেখে গেছেন, এরপরও কী বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সব কথা মিথ্যে ?

যদিও রবীন্দ্রনাথ বাঙালি তথা ভারতীয়দের কাছে অতি স্পর্শকাতর বিষয়, তবু এই সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রায় ক্ষেত্রেই বাঙালিরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যতটা গর্ব করেন ততটা রবীন্দ্রনাথকে জানার, তাঁর রচনা পড়ার চেষ্টা করেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কাছে অনেকটাই গান, গীতি-নাট্য ও বইয়ের তাকের শোভা বর্ধনে আবদ্ধ। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা বিষয়ে এই ধরনের প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা নিজেরা যদি রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট করার বিষয়ে কিছুটা পড়াশুনো করে নিতেন বা জেনে নিতেন, তবে ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আদৌ করতেন না।

রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চার পিছনে ছিল অজানাকে জানার কৌতূহল। কিন্তু তিনি এই বিষয়ে অন্ধ-বিশ্বাসী ছিলেন না। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থ থেকে জানতে পারি—"রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং প্ল্যানচেট লইয়া বহুবার পরীক্ষা করিয়াছেন কখনও কৌতুকছলে, কখনও কৌতূহলবশে।"

১৯২৯ সালের (রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬৮ অতিক্রান্ত) পুজোর ছুটির শেষভাগে শান্তিনিকেতনে এলেন মোহিতচন্দ্র সেনের মেয়ে উমা সেন বা বুলা। পরে উমাদেবী শিশিরকুমার গুপ্তের সঙ্গে বিবাহসূত্রে গুপ্তা হন। উমাদেবী বা বুলা ছিলেন শিক্ষিতা ও সাহিত্যরসে আপ্লুতা। উমা গুপ্তার লেখা দুটি কবিতার বইও আছে 'ঘুমের আগে' ও 'বাতায়ন'।

রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন 'বুলা'র মধ্যে রয়েছে মিডিয়াম হওয়ার অতীন্দ্রিয় শক্তি। রবীন্দ্রনাথের অশেষ আগ্রহে বসলো প্ল্যানচেট-চক্র, নভেম্বর ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮ ও ২৯ এবং ১৬ ডিসেম্বর। প্ল্যানচেট-চক্রে মিডিয়াম বুলা ও রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, অলোকেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী এবং প্রশান্ত মহলানবিশ।

শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ উমাদেবী বা বুলাকে পেয়ে পরলোকের তথ্যানুসন্ধানে যথেষ্ট সচেষ্ট হয়েছিলেন। ৬, ২৮, ২৯ নভেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বর প্ল্যানচেটের পুরো বিবরণ লিপিবদ্ধ করা রয়েছে, ৪, ৫ ও ৮ নভেম্বরের প্ল্যানচেটের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখা বিভিন্ন চিঠি-পত্র থেকে।

প্ল্যানচেট-চক্রগুলোতে উমাদেবীর উপর বিদেহী আত্মার ভর হতেই উমাদেবী লিখতে শুরু করতেন। প্রায় সব সময়ই প্রশ্নকর্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

উমাদেবীর কাছ থেকে বিদেহী আত্মাদের লিখিত উত্তর (?) পেয়েও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বিদেহী আত্মার আবির্ভাব বিষয়ে নিঃসংশয় ছিলেন না। উমাদেবীকে মিডিয়াম করার পর ৬ নভেম্বর, ১৯২৯ রানী মহলানবিশকে একটি চিঠি লেখেন। যাতে লিখেছিলেন, "উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা) কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চর্চার মিডিয়াম উমা

পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ মন তো সম্পূর্ণ নির্বিকার নয়। তার যা ধারণা হয়, সে ধারণার হেতু সব সময় বাইরে থাকে না, তার নিজের প্রকৃতির মধ্যেই থাকে।"

প্ল্যানচেট প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়ী দেবীকে যা বলেছিলেন, তারই কিছু পাই 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এই তো (বুলা) কী রকম করে সব লিখত বল তো? আশ্চর্য নয় তার ব্যাপারটা?···· ও (বুলা) কেন মিছে কথা বলবে? কী লাভ ওর এ ছলনা করে?"

মনোবিজ্ঞান কিন্তু বলে—অপরের চোখে নিজেকে বিশিষ্ট করে তোলার তাগিদেও মানুষ ছলনার আশ্রয় নেয়, মিথ্যাচারী হয়, বড়দের, বিখ্যাতদের মিথ্যাচার কী আমরা কোনও দিন দেখিনি? উমাদেবীর ক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে, না-ও হতে পারে। উমাদেবী যদি ছলনার আশ্রয় না নিয়ে থাকেন, তবে মিডিয়াম হিসেবে তাঁর হাত দিয়ে লেখাগুলো কী করে এলো? এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেকের মনে জাগতে পারে। এই বিষয়ে উত্তরও খুবই স্বচ্ছ এবং সরল, সম্মোহন ও স্ব-সম্মোহন নিয়ে যে আলোচনা আগে করেছি সেটুকু থেকেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উমাদেবীর ক্ষেত্রে বিদেহী আত্মার প্রতি অন্ধ-বিশ্বাস ও তীব্র অনুভূতি প্রবণতা তাঁকে আংশিকভাবে সম্মোহিত করেছিল। বিদেহী আত্মা তাঁর উপরে ভর করেছে এই বিশ্বাসের দ্বারা নিজেকেই নিজে সম্মোহিত করে উত্তর লিখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "খুব শক্ত সবল জোরালো মানুষ বোধহয় ভাল মিডিয়াম হয় না।"

(মংপুতে রবীন্দ্রনাথ : মৈত্রেয়ী দেবী)

একজন ভালো মিডিয়াম হওয়া প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখছেন, "কোন লোক যদি তার নিজের কর্তৃত্ব মনের ওপর রেখে দেয় তবে ভালো একজন মিডিয়াম হওয়া তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।" (মরণেব পারে, পৃষ্ঠা—১৪২)

স্বামী অভেদানন্দ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, "মনে রাখা উচিত যে, মিডিয়াম হবার ভাবটি হল একজন মানুষের দেহ ও মনের স্থির তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থা।" (মরণের পারে, পৃষ্ঠা—১৩৬)

মিডিয়াম অবস্থায় উমাদেবী এমন কোনোও উত্তর লিখে রাখতে সক্ষম হন নি যার দ্বারা অভ্রান্তভাবে বিদেহী-আত্মার আগমন প্রমাণিত হয়। বরং দেখতে পাই বিভিন্ন আত্মা উমাদেবীকে দিয়ে লেখালেও সব আত্মারই হাতের লেখা ছিল একই রকম।

একবার সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের বিদেহী আত্মা এলেন উমাদেবীর পেনসিলে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বন্ধু শ্রীশচীন্দ্র মজুমদারের ছেলে সন্তোষচন্দ্র। আমেরিকায় গিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা পড়তে। ফিরে এসে শান্তিনিকেতনের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেন। মৃত্যুর সময় ছিলেন শ্রীনিকেতনের সচিব। মারা যান ১৯২৬ সালে।

সন্তোষচন্দ্রের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন :

রবীন্দ্রনাথ—তুমি ওখানে কোন্ কাজে প্রবৃত্ত আছ?

সন্তোষচন্দ্র—আমি একটা বাগান তদারকি করি। কিন্তু সে পৃথিবীর ফুলবাগান নয়।

রবীন্দ্রনাথ—এখানে যেমন গাছপালা থাকে, সে কি সেই রকম?

সন্তোষচন্দ্র—একটি গাছের আত্মার একটি বিশেষ ফুল ক্রমেই শুকিয়ে উঠছে। ঠিক বুঝতে পারছিনে।

২৮ নভেম্বর প্ল্যানচেটে এলেন মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মা। মণিলাল অবনীন্দ্রনাথের জামাতা। সহিত্যে, অভিনয়ে, সঙ্গীতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছিলেন। ১৯২৯ সালেই মারা যান।

মণিলালের বিদেহী আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন :

মিডিয়াম বুলার হাতের লেখায় আত্মার উত্তর

—আমি একটা কথা বুঝতে পারিনি সন্তোষের। সেখানে বাগান আবার কী ? বুঝতে পারছি না।

মণিলাল উত্তর দিয়েছিলেন—গাছের কী আত্মা নেই ? আছে।

রবীন্দ্রনাথের প্ল্যানচেট-চক্রে গাছ-পালা, শাক-শব্জি, ঘাস, খড় সবেরই বিদেহী আত্মার অস্তিত্বের খবর আমরা পাই, যে আশ্চর্য খবরটা স্বামী অভেদানন্দের আত্মারা একবারের জন্যেও উচ্চারণ করে নি।

বিদেহী আত্মা রবীন্দ্রনাথকে তাদের দেহের আকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে —"কারো বা ঝড়ের হাওয়ার মত কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।"

আত্মা বিষয়ে স্বামী অভেদানন্দের 'কুয়াশার মতো' বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'হাওয়ার মতো' বর্ণনা মেলে না। বিদেহী আত্মার অস্তিত্ব থাকলে দু'জনের বক্তব্যে মিলটুকু নিশ্চয়ই প্রথম সত্ব হতো।

আমার দেখা প্ল্যানচেট :

বছর কয়েক আগের কথা। কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের বিজ্ঞান বিষয়ের এক অধ্যাপক বন্ধু একদিন কথায় কথায় বললেন, তিনি নিজেই কয়েকবার প্ল্যানচেটের সাহায্যে বিদেহী আত্মাকে এনেছেন। তাঁর বাড়িতে এ-রকম একটি প্ল্যানচেট-চক্রে উপস্থিত থাকার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। বন্ধুর আমন্ত্রণ উপেক্ষা না করে তাঁর এক প্ল্যানচেট-চক্রে হাজির হলাম।

সেদিনের ওই চক্রে অধ্যাপক বন্ধু সমেত আমরা পাঁচজন হাজির ছিলাম। খাওয়ার টেবিল ঘিরে পাঁচটা চেয়ারে বসলাম আমরা পাঁচজন। টেবিলের মাঝখানে রাখা হলো একটা বড় সাদা কাগজ। কাগজটার উপর বসানো হলো ছোট্ট তিনকোণা প্ল্যানচেট-টেবিল, এক কোণা থেকে আর এক কোণার দূরত্ব হবে ৬ ইঞ্চির মতো। প্ল্যানচেট-টেবিলটার তিনটে পায়ার বদলে দু'দিকে লাগানো রয়েছে দু'টো লোহার গুলি বা বল-বেয়ারিং, একদিকে একটা বোর্ড-পিন, লোহার গুলি লাগানোর কারণ, টেবিলটা যাতে সামান্য ঠেলায় যে কোনও দিকে সাবলীল গতিতে যেতে পারে। সম্ভবত এককালে বোর্ড-পিনের জায়গাতেও একটা লোহার গুলিই ঢাকনা সমেত বসানো ছিল, গুলিটা কোনও কারণে খসে পড়ায় বোর্ড-পিনটা তার প্রক্সি দিচ্ছে। যেদিকে বোর্ড-পিনের পায়া, সেদিকের টেবিলের কোণে রয়েছে একটা ছোট ফুটো। ওই ফুটোর ভিতরে গুঁজে দেওয়া হলো একটা পেন্‌সিল। পেন্‌সিলের ডগাটা রইলো কাগজ স্পর্শ করে।

ঘরে ধূপ জ্বালা হলো। আমাকে দর্শক হিসেবে রেখে চারজনে বসলেন বিদেহী আত্মার আহ্বানে। আমি আবেগপ্রবণ নই বলেই আমাকে মিডিয়ামের অনুপযুক্ত বলে রাখা হয়েছিল দর্শক হিসেবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটা ছবি এনে রাখা হলো মিডিয়ামদের সামনে। মিডিয়ামরা ছবিটার দিকে তাকিয়ে একমনে চিন্তা করতে লাগলেন, সেই সঙ্গে প্রত্যেকের ডান হাতের তর্জনি ছুঁয়ে রইল প্ল্যানচেটের টেবিল।

কিছুক্ষণ পরে প্ল্যানচেটের টেবিল নড়ে-চড়ে উঠলো। অধ্যাপক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কে ?"

উত্তরে বাংলায় লেখা হলো—জগদীশচন্দ্র বসু।
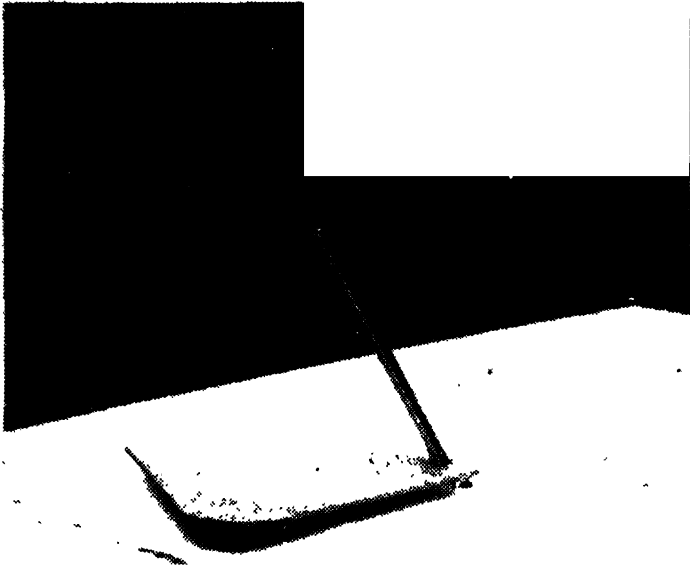
প্ল্যানচেটের তিনকোণা টেবিল

প্রশ্ন—পরলোকে উদ্ভিদদের আত্মা আছে কী ?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—আপনি অন্য কোনও গ্রহে গিয়েছেন ?

উত্তর—না।

প্রশ্ন—কেন যান নি ? উৎসাহ নেই ?

উত্তর—আমি চলি।

এবার যে ছবিটা হাজির করলাম, সেটা আমার মায়ের। ছবিটা টেবিলে রাখতে আমার অধ্যাপক বন্ধু বললেন, "ইনি কে ?"

—"আমার মা।"

—"নাম ?"

—"সুহাসিনী ঘোষ।"

আবার প্ল্যানচেট চক্র বসলো। কিছুক্ষণ কেটে যেতেই পেন্‌সিলটা গতি পেল। আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কে ?"

—"তোর মা।"

—নাম ?"

—"সুহাসিনী ঘোষ।"

—"এখন কেমন আছো ? ওখানে কষ্ট হয় ?"

—"না.। এ দুঃখ-কষ্টের উর্দ্ধে এক জগৎ।"

—"আমি দেহাতীত আত্মার অস্তিত্বে এতদিন অবিশ্বাস করে এসেছি। তুমি যে সত্যিই আমার মা, তার প্রমাণ কী ?"

—"এখনি প্রমাণ করতে পারিস, তুই আমার ছেলে ? আমি যাই।"

চক্র ভাঙতেই অধ্যাপক বন্ধুটি বললেন, "আমরা কোনও চাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিলাম বলে কী তোমার ধারণা ?

"না, লোক ঠকানোর কোনও চেষ্টা তোমরা কর নি ঠিক, কিন্তু, তোমাদের মধ্যে কারো একজনের চিন্তাশক্তির তীব্রতা তারই অজ্ঞাতে পেনসিলটাকে ঠেলে লেখাচ্ছিল ," বললাম আমি।

বন্ধুটি কিছুটা উত্তেজিত হলেন, বললেন, "তুমি তো নিজেকে একজন র‍্যাশানালিস্ট বলো। কোন্ যুক্তিতে এই লেখাগুলোকে আমাদেরই কারো অবচেতন মনের প্রতিফলন বলে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাও তা একটু বলবে ?"

আমি এবার মিহি সুরে আসল সত্যটি প্রকাশ করলাম, "ওই যে ছবিটি দেখছো, ওটি আমার মায়ের, নাম সুহাসিনী। কিন্তু তাঁর বিদেহী আত্মাকে টেনে আনতেই আমি নিশ্চিত হলাম, এই প্ল্যানচেটের পিছনে লোক ঠকানোর কোনও ব্যাপার না থাকলে, গোটাটাই ঘটছে অবচেতন মন থেকে, কারণ, আমার মা জীবিত।"

আপনাদের অবগতির জন্য জানাই সেদিনের প্রেত-চক্রে উপস্থিত সকলেই প্ল্যানচেটের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারিয়েছেন।

কয়েক মাস আগে আমার পরিচিত মিস্টার সিন্‌হার (নামটা ঠিক মনে নেই) আহ্বানে তাঁরই এক বন্ধুর ভবানীপুরের বাড়িতে প্ল্যানচেটের আসরে গিয়েছিলাম। বরেণ্য সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের একটি ছবি মিডিয়ামদের সামনে রেখেছিলাম। আমি ছিলাম দর্শক। মিডিয়াম ছিলেন সিন্‌হা ও তাঁর দুই বন্ধু। এখানেও একটা তিনকোণা প্ল্যানচেট টেবিলকে একটা সাদা কাগজের উপর চাপানো হয়েছিল। টেবিলের ফুটোয় গুঁজে দেওয়া হয়েছিল পেন্‌সিল।

কিছুক্ষণের মধ্যে পেন্‌সিলটিকে চলতে দেখে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কে ?"

উত্তরে লেখা হলো, "সন্তোষ ঘোষ।"

আমি বললাম, "আপনি নিজের নাম ভুল লিখলেন কেন ? আপনি কী সন্তোষ ঘোষ লিখতেন ? যেমন ভাবে নিজের নামের বানান লিখতেন, তেমনভাবে লিখুন।

এবার লেখা হলো, "সন্তোষ কুমার ঘোষ।"

শ্রীসিন্‌হাকে বললাম, "এই লেখাটা কিন্তু সন্তোষকুমার ঘোষের নয়। আপনারা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে জোর দিয়ে যা ভাবছেন, সেই ভাবনাকে রূপ দিতেই আপনারা নিজেদের অজ্ঞাতে প্ল্যানচেট-টেবিলের পেন্‌সিলকে দিয়ে তা লিখিয়ে নিচ্ছেন। সন্তোষদা তাঁর নামের বানান লিখতেন সন্তোষকুমার ঘোষ, অর্থাৎ সন্তোষ ও কুমার থাকত একসঙ্গে। আপনারা কিন্তু লিখেছেন আলাদা আলাদাভাবে দুটি পৃথক শব্দ হিসেবে সন্তোষ, কুমার। ওঁর বানান লেখার পদ্ধতি জানতেন না বলেই আপনারা ভুল করেছেন।

আমার এক বন্ধু তপন চৌধুরী থাকেন যাদবপুরে। একদিন খবর দিলেন, তাঁর কয়েকজন বন্ধু

প্ল্যানচেট করে বিদেহী আত্মাদের নিয়ে আসছেন বলে দাবী করছেন। তপন তাঁর বন্ধুদের প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার অবিশ্বাসের কথা বলায় ওই বন্ধুরা নাকি আমার দিকে প্ল্যানচেটকে মিথ্যে বা জালিয়াতি প্রমাণ করার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন।

আমি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলাম। বলেছিলাম, আমার পকেটে একটি কাগুজে টাকা থাকবে। সর্বত্রগামী, সূক্ষ্মদেহী, বিদেহী আত্মাদের সহায়তায় মিডিয়ামরা যদি আমার নোটটির নম্বর লিখে দিতে পারেন, তবে পঁচিশ হাজার টাকা ওদের দেবো। হেরে গেলে পাঁচ হাজার টাকা ওদের দিতে হবে, রাজি আছেন কী?"

শেষ পর্যন্ত ওরা রাজি হন নি। জানি, রাজি না হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ, পাঁচ হাজার টাকা তো কম নয়।

এক মার্কসবাদী ক্ষুদে নেতা তাঁর বাড়িতে এক প্ল্যানচেট-চক্রে আমাকে ও আমার বন্ধু শম্ভু চক্রবর্তীকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। ক্ষুদে নেতাটির দাদা সেই সময় ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভাবশালী সচিব। ঠিক হলো চক্রে উপস্থিত থাকবো আমি, শম্ভু এবং নেতা ও তাঁর স্ত্রী। শম্ভু কলকাতা ইলেকট্রিক সাপলাই কর্পোরেশনে কাজ করে এবং একটি বামপন্থী ইউনিয়ানের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হলেও সাহিত্য ও সাহিত্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট আগ্রহী।

চক্রে বসার দিন সময়ও ঠিক করে ফেললাম নেতা, আমি ও শম্ভু। শম্ভু সর্বজনশ্রদ্ধেয় এক সাহিত্যিকের নাম করে বললেন, "ওঁর আত্মাকে সেদিন নিয়ে আসতে হবে।"

নেতাটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটি মুখের চারিপাশে ছড়িয়ে বললেন, "ওঁকে অনেকবার আমরা এনেছি। কোনও প্রবলেম নেই।"

শম্ভু এবার বললেন, "ওঁর এক অবৈধ সন্তান ছিল। সন্তানটির নাম গবেষক ছাড়া কারোরই খুব একটা জানার কথা নয়। লেখকের আত্মা নিজের অবৈধ সন্তানটির নাম লিখে দিলেই আমি চূড়াতভাবে প্ল্যানচেটকে স্বীকার করে নেবো।"

আমাদের সেই প্ল্যানচেটের আসর আজ পর্যন্ত বসে নি। সম্ভবত নেতাটি এখনও সাহিত্যিকের অবৈধ সন্তানটির নাম জেনে উঠতে পারেন নি।

মাঝে মধ্যে প্ল্যানচেট-চক্র বসত প্রতিষ্ঠিত এক সঙ্গীত শিল্পীর বাড়িতে। শিল্পীর নামটি তাঁরই অনুরোধে এখানে উল্লেখ করলাম না। আমার বোঝাবার সুবিধের জন্যে ধরে নিলাম তাঁর নাম 'সত্যবাবু'। '৮৩-র মার্চের একদিন সত্যবাবুকে আমিই ফোন করে জানালাম তাঁদের পরবর্তী চক্রে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতে চাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই পরবর্তী চক্রের তারিখ ও সময় জানিয়ে দিলেন।

চক্র-বসলো রাত দশটা নাগাদ। উপস্থিত ছিলেন দু'জন মহিলা সমেত সাতজন, এঁদের মধ্যে চারজনেরই প্ল্যানচেটে মিডিয়াম হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে।

কার্পেট গুটিয়ে মেঝেতে ঘড়ির বৃত্ত আঁকা হলো। বৃত্তের ভিতরে লেখা হলো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। বৃত্তের বাইরে লেখা A থেকে Z পর্যন্ত। নিয়ন নিভিয়ে জ্বেলে দেওয়া হলো একটা মোটা মোম। বৃত্তের মাঝখানে বসানো হলো একটা তিনপায়া ধূপদানি। ধূপদানিতে তিনটে চন্দনধূপ গুঁজে জ্বেলে দেওয়া হলো। তিনজন মিডিয়াম বৃত্তের বাইরে বসে ডানহাতের তর্জনি দিয়ে ছুঁয়ে রইলেন ধূপদানিটা। একজন বসলেন একটা খাতা ও কলম নিয়ে, ধূপদানি যেই যেই অক্ষরে বা সংখ্যায় যাবে সেগুলো লিখে রাখবেন।

প্রথমেই ওঁরা যাঁর ছবি সামনে রেখে আত্মাকে আহ্বান করেছিলেন, তিনি একজন সঙ্গীতজগতেরই খ্যাতিমান পুরুষ। আত্মা এলো, তিনপায়া ধূপদানিটাও তৎপরতার সঙ্গে এক একটি অক্ষরে ঘুরতে লাগলো। এক সময় আমাকে প্রশ্ন করতে অনুরোধ করলেন

প্ল্যানচেট করার বৃত্ত ও ধূপসহ ধূপদানি

সঙ্গীতশিল্পী। বিদেহী আত্মাকে আমার পরিচয় দিলেন, আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হিসেবে।

বিদেহী আত্মা বললেন, "YOUR QU"

অর্থাৎ, আমার প্রশ্ন কী?

বললাম, "আমার বুকপকেটে একটা এক টাকার নোট আছে, নোটটার নম্বর কতো?"

ধূপদানিটা বার কয়েক এদিক ওদিক ঘুরে লিখল "NONSENCE"।

পরবর্তী বিদেহী আত্মা হিসেবে আমি আমার মায়ের ছবি পেশ করেছিলাম, সঙ্গে নাম। মায়ের বিদেহী আত্মাও কিন্তু উত্তর দিয়েছিলেন। মা জীবিত শোনার পর সেদিনের মতো প্ল্যানচেট-চক্রের বৈঠক ভেঙে গিয়েছিল। আমি যতদূর জানি সঙ্গীতশিল্পীর ঘরে আর কোনও দিন প্ল্যানচেট-চক্র বসেনি। ভুল করাটা বড় কথা নয়। ভুলটা বুঝতে পেরে নিজেকে সংশোধন করে নেওয়াটাই বড় কথা।

যুগে যুগে ধাপ্পাবাজেরা তাদের প্রচারের ও সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিখ্যাত ব্যক্তিদেরই বেছে নিয়েছে। ওরা জানে মওকা বুঝে ঠিক মতো কৌশল অবলম্বন করতে পারলে মোটাবুদ্ধির চেয়ে সূক্ষ্মবুদ্ধির লোকেদের কব্জা করা অনেক বেশি সহজ।

প্রতিটি পাঠক-পাঠিকার কাছে একটি বিনীত অনুরোধ—যে-ঘটনা আপনার অলৌকিক বলে মনে হচ্ছে, তার পিছনে রয়েছে আপনার অজানা কোনও কারণ, এই বিশ্বাস নিয়ে অনুসন্ধান করুন, প্রয়োজনে অপরের সাহায্য নিন, নিশ্চয়ই আপনার নেতৃত্বেই অলৌকিকের রহস্য উন্মোচিত হবে।

আপনার অনুসন্ধানে আমার কোনও সহযোগিতার প্রয়োজন হলে নির্দ্বিধায় এই বইটির প্রকাশকের কলকাতার ঠিকানায় আমাকে জবাবী খামসহ চিঠি দিন বা যোগাযোগ করুন। নিশ্চয়ই সাধ্য মতো সব রকম সহযোগিতা করবো।

অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তিধরদের ক্ষমতার প্রতি আমার চ্যালেঞ্জ

আজ এই বইটি প্রকাশের দিন থেকে আমি প্রবীর ঘোষ, এই বইটির লেখক, ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের যে কোনও প্রান্তের যে কোনও ব্যক্তি কোনও কৌশলের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা যদি আমার নির্দেশিত স্থানে ও পরিবেশে নিম্নলিখিত যে কোনও একটি ঘটনা ঘটিয়ে দেখাতে পারেন তবে তাঁকে ৫০ হাজার ভারতীয় টাকা দিতে বাধ্য থাকবো।

আমার এই চ্যালেঞ্জ আমার মৃত্যু পর্যন্ত অথবা প্রথম অলৌকিক ক্ষমতাবানকে খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

যে ঘটনাগুলোর যে কোনও একটি অলৌকিক ক্ষমতায় দেখাতে হবে :

১। যোগবলে শূন্যে ভাসা।

২। যোগবলে ১০ মিনিট হৃদস্পন্দন বন্ধ রাখা।

৩। একই সঙ্গে একাধিক জায়গায় আবির্ভূত হওয়া।

৪। টেলিপ্যাথির সাহায্যে অন্যের মনের খবর জানা।

৫। জলের উপর হাঁটা।

৬। এমন একটি বিদেহী আত্মাকে হাজির করতে হবে, যার ছবি তোলা যায়।

৭। প্ল্যানচেটে বিদেহী আত্মা এনে, তার সাহায্যে পকেটে বা খামে বন্ধ নোটের নম্বর বলে দেওয়া।

৮। যা চাইবো, শূন্য থেকে তা-সৃষ্টি করতে হবে।

৯। একটা নোট দেখাব, সেই নোটের হুবহু প্রতিলিপি করে দিতে হবে।

১০। মানসিক শক্তির সাহায্যে কঠিন কোনও বস্তুকে বাঁকাতে হবে বা সরাতে হবে।

১১। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় আমার বা আমার মনোনীত কোনও ব্যক্তির চালানো গাড়ি থামাতে হবে।

১২। জলকে পেট্রলে বা ডিজেলে পরিণত করতে হবে।

১৩। অলৌকিক ক্ষমতাবলে বা জ্যোতিষশাস্ত্রের সাহায্যে আমার দেওয়া দশটি ছক বা হাতের ছাপ দেখে প্রত্যেক ছক বা হাতের ছাপের অধিকারীর অতীত সম্বন্ধে পাঁচটি করে প্রশ্নের মধ্যে অন্ততঃ চারটি করে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হবে।

১৪। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির সাহায্যে একটি খামে বা বাক্সে রাখা জিনিসের সঠিক বর্ণনা দিতে হবে।

চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে নিম্নলিখিত সর্তগুলো মানতে হবে :

১· আমার চ্যালেঞ্জের অর্থ গ্রহণ করুন বা না করুন, আমার চ্যালেঞ্জ যিনি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁকে আমার কাছে, বা আমার মনোনীত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জামানত হিসেবে পাঁচ হাজার টাকা জমা দিতে হবে। তিনি জিতলে আমার চ্যালেঞ্জের টাকাসহ তাঁর জামানতের টাকাও ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

জামানতের ব্যবস্থা রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার সময় ও অকারণ শ্রম বাঁচানো, সেই সঙ্গে যারা শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের মোহে অথবা আমাকে অস্বস্তিকর ব্যস্ততার মধ্যে ফেলার জন্য এগুতে চান, তাঁদের প্রতিহত করা।

২· যাঁর নামে জামানতের অর্থ জমা হবে, একমাত্র তিনিই চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

৩· চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ছাড়া আর কারোও সঙ্গেই চ্যালেঞ্জ বিষয়ে কোনও রকম আলোচনা চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী চ্যালেঞ্জ বিষয়ে পরবর্তী আলোচনায় আমার সঙ্গে অথবা আমার মনোনীত ব্যক্তির সঙ্গে বসতে পারবেন বা যোগাযোগ করতে পারবেন।

৪· চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারীকে আমার মনোনীত ব্যক্তিদের সামনে দাবীর প্রাথমিক পরীক্ষা দিতে হবে।

৫· চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী দাবীর প্রাথমিক পরীক্ষায় কোনও কারণে হাজির না হলে, অথবা দাবী প্রমাণ করতে না পারলে তাঁর জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

৬· চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আমি সর্বসমক্ষে চূড়ান্ত ও শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করব।

পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার প্রমাণ রাখলে আমি পরাজয় স্বীকার করে নেব।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, আমি সেই অলৌকিক ক্ষমতাগুলোই দেখাতে বলেছি যেগুলোকে নিয়ে বিভিন্ন অবতারদের বহু অলৌকিক গল্প প্রচলিত এবং এখনও বিভিন্ন ব্যক্তি বা অবতার এই সব অলৌকিক ক্ষমতা তাঁদের আছে বলে দাবী করে থাকেন।

আমি চাই, আমার এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আরও কিছু মানুষ বুঝতে শিখুন, বিশ্বাস করতে শিখুন, অলৌকিক ক্ষমতাবান কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব বিশ্বে নেই। অলৌকিকতা যা আছে, তা শুধুই পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থ ও বইয়ের পাতায়। বাস্তবে অলৌকিক কোনও কিছুর অস্তিত্ব অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই।

যদি আমার এই লেখা পড়ে কিছু লোকও অন্ধ-বিশ্বাস, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে ওঠেন তবে আমার এই শ্রম, সাধনা ও চ্যালেঞ্জ অবশ্যই তার সার্থকতা খুঁজে পাবে।

গ্রন্থটির সাহায্যকারী সূত্র :

১ । যাদু কাহিনী ; অজিতকৃষ্ণ বসু

২ । Illustrated History of Magic: Mailbourne Christopher.

৩ । The Great Book of Magic: George Gilbert

৪ । D. H Rawcliffe. Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult. Dover 1959

৫ । Gods, Demons and Spirits: Dr A. T. Kavur

৬ । Begone Godmen: Dr A. T. Kavur

৭ । পাভলভ পরিচিতি : ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৮ । The Lancit; R. L. Moody.

৯ । The World as a Physiological & Therapeutic Factor; Platanov.

১০ । কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র : অনুবাদ—ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ।

১১ । ভারতবর্ষের ইতিহাস : রোমিলা থাপার ; অনুবাদ—কৃষ্ণা গুপ্ত ।

১২ । Physics for Entertainment; Ya. Perelman.

১৩ । Handbook of Parapsychology—Edited by Wolman.

১৪ । Truth about E.S.P; Hans Holzer.

১৫ । New Scientist

১৬ । Nature

১৭ । Science Digest

১৮ । আনন্দবাজার

১৯ । যুগান্তর

২০ । আজকাল

২১ । পরিবর্তন

২২ Statesman

২৩ । নবভারত

২৪ । মানব মন

২৫ । উৎস মানুষ

২৬ । Bermuda Triangle Mystery Solved; Lawrence D. Kusche.

২৭ । মরণের পারে : স্বামী অভেদানন্দ

২৮ । রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা : অমিতাভ চৌধুরী

২৯ । My Story: Uri Geller

৩০ । সত্যযুগ

৩১ । প্রসাদ

৩২ । মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ; মৈত্রেয়ী দেবী,